বৈশাখ ৭০৫ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ৭০৬ সংখ্যা।

আষাঢ় ৭০৭ সংখ্যা।

শ্রাবণ ৭০৮ সংখ্যা।

ভাদ্র ৭০৯ সংখ্যা।

আশ্বিন ৭১০ সংখ্যা।

কার্ত্তিক ৭১১ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ৭১২ সংখ্যা।

পৌষ ৭১৩ সংখ্যা।

মাঘ ৭১৪ সংখ্যা।

ফাল্গুন ৭১৫ সংখ্যা।

চৈত্র ৭১৬ সংখ্যা।

অকারাদি বর্ণক্রমে পঞ্চদশ কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র.

পঞ্চদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

১০৭ সংখ্যা — ১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বিবেক ও বৈরাগ্য।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা এবং কূটস্থ যিনি তিনি আনন্দ-স্বরূপ। তিনি আনন্দময় কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট জগৎ কি নিরানন্দপূর্ণ? না, কখনই নহে। যিনি স্বয়ং আনন্দময় তাঁহার সৃষ্ট জগতও আনন্দে পূর্ণ। কিন্তু যখন আমরা কেবল ক্ষুদ্র আত্ম-প্রভাবে বলীয়ান্ হইয়া আমাদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা চারিদিকে শোক তাপ মৃত্যু; দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যাধি দেখিয়া ম্রিয়মাণ হই। আনন্দময় ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা। যখন আমরা নিজেকে ছাড়িয়া, নিজেকে ভুলিয়া সেই কর্ত্তার কর্তৃত্বে জগৎ পূর্ণ দেখি, তখন দেখি যে, এ সকলই আনন্দময়। তখন তাঁহাকে দেখিয়া শোক সন্তাপে শান্তি, দুঃখ দারিদ্র্যে সুখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুতে অমৃত লাভ করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন—

"স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা"

ব্রহ্ম-প্রাণ সাধক সেই মোদনীয় পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া আনন্দিত হন। তখন তিনি

"তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতি।

শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং হৃদয়গ্রন্থি যে মায়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃত হয়েন।

কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়া প্রবেশ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল জ্ঞানের দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা সেই মোদনীয় পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিব না—আমাদের মনের মলিনতা দূর হইবে না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।" সেই পরমেশ্বরকে প্রবচন দ্বারা লাভ করা যায় না। "ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ত্বমানশুঃ।" ধনের দ্বারা কিম্বা পুত্রের দ্বারা কিম্বা কর্ম্মের দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, কিন্তু কেবল একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই আমরা সেই অমৃতত্বের অধিকারী হইতে পারি। ত্যাগ অর্থে যদিও সাধারণতঃ সংসারত্যাগই বুঝায় কিন্তু

ইহার প্রকৃত ভাব হইতেছে বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ। যাঁহারা যথার্থ ত্যাগী পুরুষ তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, যাঁহারা "ধন্বৎ গভীরা"—নির্জ্জনে একান্তে বসিয়া ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা, তাঁহাদের এই সংসারের তামাসায় কি প্রয়োজন?—যাঁহারা শান্ত, দান্ত, সমাহিত হইয়া সেই মোদনীয় পরমাত্মাতে আনন্দ ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে অরণ্যই বা কি আর গৃহই বা কি। ব্রহ্মধামে যাইবার পথে দুই সহায়—দুই পথপ্রদর্শক আছেন, তাঁহাদের সহায়তা গ্রহণ কর—তাঁহারা যে দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন সেই দিকে চলিয়া যাও, অনায়াসে ব্রহ্মধামে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সেই দুই সহায় বিবেক ও বৈরাগ্য। মানবহৃদয়ে বিবেক ও বৈরাগ্যের ভাব উদ্দীপন করিবার জন্য—প্রেয়ের মোহ-যবনিকা ছিন্ন করিয়া শ্রেয়ঃপথে পদার্পণ করিবার জন্য, দাদু-শিষ্য মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত বিরক্ত ব্রাহ্মণ সুন্দর দাস যে সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন তাহা আমি এখন আবৃত্তি করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন, তাহাতে অমৃত ফল লাভ হইবে—

"আপু নিরঞ্জন হ্যায় অবিনাশী।
যিনি যহ বহু বিধি সৃষ্টি প্রকাশী॥
অব তুঁ পকরি উসীকা সরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥" ১

নিরঞ্জন পরমেশ্বর স্বয়ং অবিনাশী হয়েন, যিনি বহুবিধ সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। এখন তুমি তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

"জোতুঁ জন্ম জগতমেঁ আয়া।
তো তুঁ করি লে ইহ উপায়া॥
নিশদিন (ব্রহ্মনাম) উচ্চরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ২

যদি তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতে আসিয়াছ, তবে তুমি এই উপায় করিয়া লও যে, নিশিদিন ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

মায়া মোহ মাঁহি জিনি ভূলে।
লোক কুটুম্ব দেখি মত ফুলে॥
ইন্‌কে সংগিলাগি ক্যা জরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চয় করি মরনা॥ ৩

এই মায়া মোহের মধ্যে পড়িয়া ভ্রান্ত হইও না এবং তোমার চারিদিকে স্বজন কুটুম্বদিগকে দেখিয়াও ফুলিয়া উঠিও না। ইহাদের সঙ্গে পড়িয়া জ্বলিবার প্রয়োজন কি? বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

মাত পিতা বংধব কিস কেরে।
সুত দারা কোউ নহীং তেরে॥
ছিনক মাংহি সবসো বীছুরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৪

মাতা পিতা বান্ধব কে কার? সুত দারা কেহই তোমার নহে। এক পলকের মধ্যে সকলকে ফেলিয়া পলাইতে হইবে। "নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতঃ। ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতিঃ।" পরলোকে সাহায্যের জন্য পিতা মাতা কেহ থাকেন না। পুত্র থাকেন না, স্ত্রী থাকেন না, জ্ঞাতি থাকেন না। তবে কে থাকেন? "ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ" কেবল ধর্ম্মই থাকেন—ধর্ম্মই সেখানে সহায়। অতএব—

সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা।

... ...

জিনকা হেত দসোদিসি ধাবে।
কোউ তেরে সংগ-ন আবে॥

ধামঁ ধূম ধংধা পরিহরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥৬

যাহার জন্য তুমি দশদিকে পাগলের ন্যায় ধাবিত হইতেছ, অন্তে সে কেহ তোমার সঙ্গে যাইবে না। অতএব এই সকল সাংসারিক ধুমধাম পরিত্যাগ কর। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

গৃহকো দুঃখ ন বরন্যো জাঈ।
মানহু অগ্নি চহুংদিশি লাঈ॥
তামেকহু কৈসী বিধি ঠরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥৭

গৃহের যে দুঃখ তাহা বর্ণনা করা যায় না। ভাবিয়া দেখ যে, তাহার চর্তুর্দ্দিকে যেন অগ্নি জ্বলিতেছে। তাহার ভিতরে কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারা যায়। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

করণা হ্যায় সো করি কি ন লেহু।
পীছে হম্‌কো দোষ ন দেহু॥
ইক দিন পাউঁ পসারি ভুলরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥৮

যাহা কর্ত্তব্য তাহা এখনই করিয়া লও। শেষে আমাকে দোষ দিও না। একদিন তোমাকে পদ প্রসারিত করিয়া শুইতে হইবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

যা শরীর সোঁ মমতা কৈসী।
যা কী তো গতি দীসত ঐসী॥
জ্যূঁ পালাকা পিণ্ড পঘরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥৯

এই শরীরের সঙ্গে আর মমতা করিয়া কি হইবে। ইহার গতি ত এইরূপ দেখা যাইতেছে। তুষাররাশি অবলম্বন করিয়া উঠিতে যাওয়া যেরূপ, ইহাও সেইরূপ। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয়ই মৃত্যু রহিয়াছে।

মৃত্যু পকরিকেঁ সবনি হলাবে।
তেরা বারি নীয়রী আবে॥
যৈসেঁ পাত বৃচ্ছসেঁ ঝরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ১০

মৃত্যু সকলকে আক্রমণ করিয়া কম্পিত করিতেছে, তোমার পর্য্যায় এই নিকটে। বৃক্ষ হইতে শুষ্কপত্র যেমন ঝরিয়া পড়ে সেইরূপ তোমাকে এবং আমাকে এবং তাহাকে এই সংসার-বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়িতে হইবে।—সিরাজের উদ্যানের সেই সাধু, সেই সংসারত্যাগী ব্রহ্মপ্রেমোন্মত্ত দেওয়ান-হাফেজ বলিয়াছেন যে, তোমার জীবনপথে এক রাহাজান—সেই জীবনহন্তা মৃত্যু—দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা হইতে নিজে অসাবধান থাকিও না। সে আজ যদি তোমাকে গ্রহণ না করে, কল্য লইয়া যাইবে—বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

দিন দিন ছীন হোত হ্যায় কায়া।
অঞ্জুরিমেঁ জল কিন ঠহরায়া॥
ঐসে জানি বেগি নিস্তরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ১১

দিন দিন তোমার শরীর ক্ষীণ হইতেছে। অঞ্জলির মধ্যে জল কতক্ষণ থাকিতে পারে, ইহা জানিয়া সংসার হইতে মুক্ত হও। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

দেহ খেহ মাঁহে মিলী যাঈ।
কাক স্বানকে জন্তুক খাঈ॥
তেল ফুলেল কহা চোপরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ১২

দেহ মাটিতে মিলিয়া যাইবে। কাক

এবং কুক্কুরাদি জন্তুগণ তাহা ভক্ষণ করিবে। অতএব ফুলেল তৈল মর্দ্দন করিয়া সে শরীরকে সিক্ত করিবার প্রয়োজন কি। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

খণ্ড বিহণ্ড কাল তন করি হ্যায়।
শংকট মহা একদিন পরি হ্যায়॥
চাকী মাঁহিঁ মুঁগ জ্যোঁ দরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥১৩।

কাল শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে। এ এক মহা সঙ্কটের দিন উপস্থিত। চক্র মধ্যে পতিত মুদ্গের ন্যায় অবস্থা। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

কাহেকোঁ কছু মনমেঁ ধারে।
মোতসেঁ তেরী বোরি নিহারে॥
বালা গিনে ন বূঢ়া তরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥১৪

মনের মধ্যে কেন কিছু গর্হিত বাসনা পোষণ করিতেছ? তোমার যে মৃত্যুর সহিত শত্রুতা লক্ষিত হইতেছে। এই আশ্চর্য্য সংসারে বালক মনে করে, সে কখন বার্দ্ধক্যকে অতিক্রম করিবে না। কিন্তু, বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

সাপ গহে মূসাকো জৈসে।
মংজারী সুবাকো তৈসে॥
জুঁ্য তীতরকোঁ বাজ বিথরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥১৫

বাজ যেমন পক্ষীকে নখে বিদ্ধ করিয়া লইয়া পলায়ন করে, এই সংসারে সেইরূপ সর্প অহরহ মূষিককে গ্রাস করিতেছে, মার্জ্জার শুককে হনন করিতেছে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

বোক নিলজ্জ চরত নিত ডোলে।
বকরী সংগ কামরত গোলে॥
পকরি কসাই পটকি পিছরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥১৬

নির্লজ্জ ছাগ ছাগী সহ কামরত হইয়া ব্যা ব্যা শব্দে গাত্র দোলাইয়া বেড়াইয়া বেড়ায়, কিন্তু নির্দ্দয় কসাই তাহাকে আচম্বিতে ধরিয়াই তাহার কণ্ঠদেশে ছুরিকা আঘাত করে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

কাল খরা সির উপর তেরে।
তূঁ ক্যুঁ গাফিল উত ইত হেরে॥
জৈসে বধিক হতে তকি হরনা।
সমুঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥১৭

তোমার মস্তকের উপরে কাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তুমি কেন অসাবধানে এ দিক্ ও দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছ? ব্যাধ যেমন হরিণের প্রতি তাহার লক্ষ্য স্থির রাখে, বুঝিয়া দেখ যে, সেইরূপ তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

ক্ষণভংগুর যহ তন হ্যায় ঐসা।
কাচা কুম্ভ ভর্যা জল জৈসা॥
পলকমাঁহি বৈঠেহি ঠরনা।
সমুঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥১৮

জলপূর্ণ আমকুম্ভের ন্যায় এই শরীর ক্ষণভঙ্গুর ইহা স্থির হইয়া ক্ষণেক চিন্তা কর। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

জোরি জোরি ধন ভরে ভণ্ডারা।
অর্ব খর্ব কছু অন্ত ন পারা॥
খোখী হাঁড়ী হাত পকরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥১৯

কত অর্ব্বুদ খর্ব্ব ধন গণিয়া গণিয়া তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছ যে, তাহার অন্ত নাই, কিন্তু শেষে শূন্য পাত্রে

হস্ত পড়িবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

হীরা লাল জবাহির জেতে।
মানক মোতী ধরুমেঁ কেতে॥
ধর্‍্যা রহে রূপা সোবরণা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ২০

কত কত হীরা, লাল, জহরৎ; কত কত মতি মাণিক্য; কত কত রৌপ্য স্বর্ণ ঘরে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

রীতা আয়া রীতা জাঈ।
উহে ভলী জো খরচী পাঈ॥
মায়া সংচি সংচি ক্যা করনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ২১

শূন্য হাতে আসিয়াছ, শূন্য হাতে চলিয়া যাইবে। তাহাই কল্যাণ যাহা এখানে দানে ব্যয় করিতে পার। মায়া সঞ্চয় করিয়া করিয়া কি করিবে? বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলেন

"একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোহনুভুংক্তে সুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতং।"

মনুষ্য একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়; একাকী আপনার সুকৃতি এবং দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে।

দেশ বিলাইত ঘোরা হাথী।
ইনমেঁ কোউ ন তেরে সাথী॥
পীছে হৈ হ্যায় হাথ মসরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ২২

দেশ বিলাত বা ঘোড়া বা হস্তী, ইহারা কেহ তোমার সঙ্গের সাথী হবে না। অন্তে কেবল হস্ত মর্দ্দনই সার হইবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

মন্দির মাল ছোড়ি সব জানা।
হোই বসেরা বীচ মসানা॥
অংবরঁ বোঢন ভূমি পথরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ২৩

মন্দির এবং ঐশ্বর্য্য সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে। শ্মশানের মধ্যে তোমার বাস হইবে। তখন অম্বর তোমার বস্ত্র এবং ভূমি শয্যা হইবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

বহু বিধি সন্ত কহত হৈ টেরে।
জমকী মার পরে সির তেরে॥
ধর্ম্মরায়কো লেখা ভরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ২৪

অনেক সাধু ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন যে, তোমার মস্তকের উপরে যমের দণ্ড রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজের লেখা তোমাকে অবশ্য পূর্ণ করিতে হইবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

* * * *

কণ্টক উপর চলি হৈ ভাঈ।
তাতে থংভংসোঁ লপটাই॥
ঐসী ত্রাস জানি অতি করনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ২৬

হে ভাই! কণ্টকের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহা আবার স্তম্ভে নিহিত। অতএব মনে নিতান্ত ভীত হইয়া শুভ কর্ম্ম করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

কহুঁ কাহু দুঃখ ন দীজে।
অপনী ঘাত আপ ক্যুঁ কীজে॥
বার বার (সংসার) ফিরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥২৭

কখন কাহাকেও দুঃখ দিও না। এইরূপ করিয়া আপনার পায়ে আপনি কেন কুঠার মারিবে? এইরূপ করিয়া মনুষ্য বারম্বার সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হয়। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

জো বোহে লুনিয়েগা সোঈ।
অমৃত খাই কি বিষফল হোঈ॥
ইহে বিচারি অসুভসোঁ টরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ২৮

যাহা বপন করিবে তাহাই কাটিতে হইবে। রোপণ অনুসারে অমৃত আস্বাদন করিবে কিম্বা বিষফল প্রাপ্ত হইবে। এই বিষয় বিচার করিয়া অশুভ কর্ম্ম হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

বেদ পুরাণ কহে সমুঝাবে।
জৈসা করে সো তৈসা পাবে॥
তাতেঁ দেখি দেখি পগ ধরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ২৯

বেদ এবং পুরাণ ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে, "যে ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করিবে সে তদনুরূপ তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে।" অতএব দেখিয়া দেখিয়া সাবধানে পদ নিক্ষেপ করিবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

* * * *

কাম ক্রোধ বৈরী ঘটমাঁহীং।
ঔর কোঁউ কহাঁ বৈরী নাহীং॥
রাত দিবস ইসহীসোঁ লরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৩১

কাম ক্রোধরূপ বৈরী হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছে। আর কোথাও কোন শত্রু নাই। রাত্র দিন ইহারই সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

মনকোঁ দণ্ড বহুত বিধি দীজে।
যাহী দাগাবাজ বশ কীজে॥
ঔর কিসিসেঁতী নহিঁ অরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৩২

নানা প্রকারে মনকে দণ্ড প্রদান কর। এই বিশ্বাসঘাতককে বিশেষ রূপে বশে আনয়ন কর। আর কাহারও সহিত বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

জিনকে রাগ দ্বেষ কহুঁ নাহীঁ।
ব্রহ্মবিচার সদা উরমাহীঁ॥
উন সংতনিকে গহিয়ে চরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৩৩

যাঁহার কখন কোন অবস্থায় রাগ নাই, দ্বেষ নাই, কিন্তু হৃদয়ে সর্ব্বদা ব্রহ্মবিচার রহিয়াছে, সেই সাধু পুরুষের চরণে গিয়া পতিত হও। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

কাচা পিংড রহত নহীঁ দীসে।
যহ হম জানী বিসবাবীসে॥
হরি সমরন কবহু ন বিসরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৩৪

আমি উত্তম রূপে জানি যে, কাচা পিণ্ড অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না। অতএব কখন হরি-স্মৃতি বিস্মৃত হইও না। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

জো তূঁ স্বর্গলোক চলি জাবে।
ইন্দ্রলোক পুনি রহন না পাবে॥
ব্রহ্মাহুকে ঘরতেঁ গিরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৩৫

যদি তুমি কর্ম্মগুণে স্বর্গলোক লাভ

কর কিম্বা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হও, কিন্তু সেখানে চিরদিন থাকিতে পারিবে না। ব্রহ্মার গৃহ হইতেও পতন নিশ্চয়? বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

গর্ব্ব ন করিয়ে রাজা রাণা।
গয়ে বিলায়ী দেব অরুদানা॥
তিতকে কহু খোজহু খুরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৩৬

আমি রাজা আমি রাণা, ইহা বলিয়া গর্ব্ব করিও না। জান যে, কত দেব দানব কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কোন খোজ বা কোন চিহ্ন নাই। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

ধরতী মাপী এক ডগরতেঁ।
হাথো উপর পরবত ধরতেঁ॥
কেতে গয়ে জাহি নহিঁ বরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৩৭

এক পদক্ষেপে পৃথিবী মাপিতে গিয়া এবং হস্তের উপর পর্ব্বত ধরিতে গিয়া কত গর্ব্বিত মনুষ্য বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহার বর্ণনা করা যায় না। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

আসন সাধি পবন পুনি পীবে।
কোটি বরষ লাগি কাহে ন জীবে॥
অন্তে ত্যজ তিনকা ঘট পরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৩৮

আসন সাধন করিয়া এবং বায়ু ভক্ষণ করিয়া কোটি বৎসর পর্য্যন্ত মানুষ জীবিত থাকুক না কেন, কিন্তু অন্তে তাহাকে তৃণের ন্যায় শরীর পরিত্যাগ করিতে হইবে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

কংপে ধর জল অগ্নি সমংদা।
বায়ু ব্যোম তারাগণ চংদা॥
কংপে সূর গগন আভরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৩৯

বেদে আছে—"যং ক্রন্দসী অবসা তস্থভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে" যাঁহার শাসনে স্তম্ভিত হইয়া দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইয়া যাঁহাকে দেখিতেছে—যিনি ভয়ের ভয় এবং ভীষণের ভীষণ—তাঁহার ভয়ে ধরা, জল, অগ্নি, সমুদ্র, বায়ু, আকাশ, চন্দ্র এবং তারাগণ কম্পিত হইতেছে এবং গগনের ভূষণ স্বরূপ সুরগণও তাঁহার ভয়ে কম্পিত হইতেছে। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয়-মৃত্যু রহিয়াছে।

জুদা ন কোয়ী রহনে পাবে।
হোয়ী অমর জো ব্রহ্ম সমাবে।
সুন্দর ঔর কহুঁ ন উবরনা।
সমঝি দেখি নিশ্চৈকরি মরনা॥ ৪০

ঈশ্বর হইতে কেহ পৃথক হইয়া থাকিতে পারিবে না। তিনিই অমর হয়েন যিনি ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। হে সুন্দর, ভব-সমুদ্র পারের আর অন্য উপায় নাই। বুঝিয়া দেখ যে, তোমার সম্মুখে নিশ্চয় মৃত্যু রহিয়াছে।

হে বন্ধুগণ, ভক্ত সুন্দর দাস যে অমৃতময় উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে সংসার-সঙ্কটে সাবধান থাকিয়া প্রেমময় পরব্রহ্মের ক্রোড়ে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন, আমরা যেন সাবধান হইয়া তাঁহার সেই আদেশ পালন করিতে সক্ষম হই। বেদের অনুশাসন এই যে "ন হি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে" ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা নিমেষ মাত্রও জীবিত থাকিতে পারি না। অন্য অন্য সাধুরাও বলিয়াছেন, 'পরমায়ুর যে গ্রন্থি তাহা একটি চুলের অগ্রভাগে আবদ্ধ। অতএব পরমেশ্বরেরই চিন্তা কর, সংসারের চিন্তায় তোমার কি

প্রয়োজন'। 'তুমি ত বড় হুঁসিয়ার ব্যক্তি কিন্তু আমি বলি, তুমি এই একটি বিষয়ে হুঁস রাখিও যে সংসারের সকল বিষয়ে বেহুঁস থাকিয়া সেই স্বর্গীয় বন্ধু তোমার চিরকালের সখা পরমেশ্বরের প্রতি তোমার হৃদয়ের মনোযোগ রক্ষা করিও'। ব্রাহ্মধর্ম্ম পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন "ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পরব্রহ্মকে জানিয়াই মনুষ্য মৃত্যুমুখ হইতে উত্তীর্ণ হয়—ভবসাগর পারের আর অন্য পন্থা নাই।

হে পরমাত্মন্ আমরা তোমার অতি দীন, দুর্ব্বল সন্তান। আমাদের নিজের নিজের এমন শক্তি নাই যে আপন বলে এই সঙ্কটপূর্ণ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার চিরজ্যোৎস্নাপূর্ণ অমৃতময় ক্রোড়ে প্রবেশ করি—তোমার আনন্দময় ধামে উপস্থিত হইয়া তোমার অমৃত প্রসাদ সম্ভোগ করি। এই সংসারের যে দিকে তাকাই সেই দিকেই ভীষণ মৃত্যুর বিভীষিকা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে। নাথ, তুমি আমাদের একমাত্র আশ্রয়, পিতা ও পরিত্রাতা। আমরা এই সংসার যন্ত্রণায় ভীত হইয়া কাতর প্রাণে তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদিগের হৃদয়ে বল দাও, মনে জ্ঞান দাও, আত্মাতে পবিত্রতা দাও যাহাতে আমরা তোমার সহবাসের যোগ্য হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রসোবৈ সঃ।

যাঁহার অনন্ত প্রেম অশেষ করুণা অসীম বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতির মূলে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড ভাবে মঙ্গলের প্রতি ধাবিত হইতেছে; যাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় কল্যাণ নিয়মে বিশ্বরাজ্য ঘাত-প্রতিঘাত-সঙ্ঘাতে চূর্ণ না হইয়া পূর্ণতার প্রতি অগ্রসর হইতেছে; যিনি জল স্থল সাগর নগর জনপদ অরণ্য সমস্তই আপনার বিশ্ববিরাট সত্তায় সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন; যাঁহার অনন্ত অস্তিত্বে বিশ্বপ্রকৃতি বিচিত্র মঙ্গল শোভন শ্রীতে আমাদের হৃদয়ে মাধুরীধারা ঢালিয়া দিতেছে; ভারতের মহর্ষিগণ কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতের সমক্ষে সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছেন 'রসোবৈ সঃ'। তিনি রসস্বরূপ। জিহ্বা রসনেন্দ্রিয় নামে পরিচিত, কিন্তু সঙ্গীতের রসধারা কর্ণকুহরকেই চরিতার্থ করে। রূপ-সুধা পান করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ই বিভোর হইয়া যায়। চন্দনের গন্ধমাধুর্য্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়কেই পরিতর্পণ করে। কর্ণ শোনে, জিহ্বা আস্বাদন করে, চক্ষু দেখে ইহা সকলেই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন; কিন্তু আমরা যখন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই, তখন চক্ষু দেখিতেছে বলিয়া আমরা তৃপ্তি পাই না, ভাবও প্রকাশ পায় না। তখন আমরা বলি চক্ষু প্রাণ ভরিয়া পান করিতেছে, 'দেখিতেছে' বলিলে কেবল নয়নের প্রীতি আমাদের বোধগম্য হয়, কিন্তু পান করিতেছে বলিলে মনে হয় সমস্ত চিত্তকেও তাহা মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু নয়নের মোহ বলিয়া যেখানে শেষ করা যায় না, সেখানেই দর্শনেন্দ্রিয় পান করে, যেখানেই চক্ষু পান করে, সেখানেই রূপে সুধা, মধু প্রভৃতি একধা আস্বাদন-যোগ্য সামগ্রীর আরোপ করা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। জ্যোৎস্নালোকিত বসন্ত রজনীতে বিকসিত কুসুমের সুগন্ধ লইয়া যখন স্নিগ্ধ মধুর মলয়সমীরণ উন্মুক্ত প্রান্তর বা আমাদের

উদ্ঘাটিত বাতায়ন পথে প্রবাহিত হয়, তখন আমরা সমস্ত অঙ্গের দ্বারা তাহা সেবন করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকি। কিন্তু দিব্য রসাল সামগ্রীর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বা তাহা নয়নগোচর মাত্র করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করা আমাদের পক্ষে একান্তই কঠিন, তাহার গন্ধেও ব্যগ্রতাই বৃদ্ধি করে; সুতরাং আস্বাদযোগ্য স্বাদু সামগ্রী আমরা আস্বাদন করিয়াই পরিতোষ প্রাপ্ত হই। সুশীতল পানীয় কর্ণকুহরের স্নায়ুজালকে তরঙ্গিত করিয়া তুলে না, এবং রসনেন্দ্রিয় কখনো দিব্য পায়সান্ন দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। খুব কবিতার ভাষাতেও রসনায় দর্শনেন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতির ধর্ম্ম আরোপ করা অস্বাভাবিক এবং হাস্যকর; অপর দিকে দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে রসনার ধর্ম্ম অকবি-লোকেও অনেক সময় স্বভাবতই আরোপ করিয়া থাকেন; তজ্জন্যই সকল ইন্দ্রিয়ের—সকল চিত্তের—সমস্ত জীবনের যাহাতে পূর্ণ পরিতর্পণ হয়, তাঁহাকে মনুষ্য ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে 'রসোবৈ সঃ' এই মহাবাক্যের মত সঙ্গত সর্ব্বাঙ্গীন দ্বিতীয় আর একটি বাক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহার মহিমা—যাঁহার নাম কর্ণযুগল সুশীতল করিয়া দেয়, যাঁহার বিশ্বভুবনমোহন সচ্চিদানন্দরূপ হৃদয়কে পরমানন্দের অনন্ত ধারায় সিক্ত করিতে থাকে, যাঁহার মধুর প্রসঙ্গ সুধামাখা নাম রসনাকে কৃতকৃত্য করে, যাঁহার নামে গুণে মহিমায় প্রেমে শক্তিতে করুণায় সমস্ত মনঃপ্রাণ অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া যায়, তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ স্বভাবতই 'রসোবৈ সঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের শব্দ-সামর্থ্য অসীম নহে। অসীমের অনন্ত লীলা—অনন্ত শক্তি—সীমাহীন ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে আমাদের শব্দশক্তি নিতান্তই পরাহত হইয়া পড়ে; সেজন্যই শান্ত তপোবনের গম্ভীর নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সমাধিমগ্ন ঋষির মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে

> 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,
> আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।'

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। জগতের যাবতীয় সাধক এবং সিদ্ধ এই ঋষিবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। 'অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর? এই সবে জিজ্ঞাসে'হে!' কিন্তু বাস্তবিক যাহা অনন্ত, তাঁহার অন্ত কেহ কোন কালে পাইতে পারে না। অনন্ত রহস্যের মধ্যে ডুবিয়া তাহার কুল কিনারা না পাইয়া রহস্য পরম্পরায় যখন একই মঙ্গল মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে দেখা যায়, যখন বুঝা যায় এ রহস্যের সীমা নাই—সমাপ্তি নাই, কিন্তু সমস্তই এক অখণ্ড আনন্দ-রসে পরিপূর্ণ; যখন সুবিমল ব্যগ্র চিত্তে অসীমের প্রেম-রস সঞ্চারিত হইয়া অনন্তের ভাব জাগ্রত করিয়া তোলে, তখনি জ্ঞানীর—সাধকের—সিদ্ধ ভক্তের কণ্ঠে বিচিত্র ভাষায় এই একই তত্ত্ব ধ্বনিত হইয়া উঠে—

> 'যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,
> আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।'

যখন সেই পরব্রহ্মের আনন্দই যথার্থ রূপে সাধকের উপজীব্য হইয়া উঠে, তখন তিনি সেই অনন্ত আনন্দধারায় নিত্যকাল অভিষিক্ত হইতে থাকেন, আর সকলকে ডাকিয়া প্রেমকণ্ঠে বলেন—'রসো বৈ সঃ'। জড়ভাষা ইহার অধিক প্রকাশ করিতে পারে না, যিনি যথার্থ ঈশ্বরা-

ভিলাষী, যাঁহাদের হৃদয়ে সত্য সত্য ভগবৎপ্রেমপিপাসা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; তিনি এই 'রসোবৈ সঃ' বাক্যের অভ্যন্তরে অসীম ব্রহ্মাণ্ডরহস্য নিহিত বুঝিয়া এবং ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতররূপে আর কিছু বলিতে না পারিয়া তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন 'রসোবৈ সঃ'।

সংসারের কোন রসই নিত্যকাল চিত্তে তৃপ্তিদান করিতে সমর্থ হয় না, যে কোন রসই উপভোগে—অতি পরিচয়ে নীরস হইয়া যায়; কিন্তু রসস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রেমরস যথার্থরূপে যাঁহার চিত্তে সঞ্চারিত হইয়াছে, তিনি ধর্ম্মে কর্ম্মে জীবনে মরণে সে রসকে মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পৃথিবীর রস পৃথিবীর ভোগ্য বিষয়রাশি একই সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়—সমস্ত প্রবৃত্তি ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার অক্ষয় আনন্দ রস যুগপৎ সমস্ত অন্তঃকরণ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত আত্মাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যিনি তাঁহাকে রসস্বরূপে জীবনে লাভ করিতে পারেন, সংসারের সুখ সম্পৎ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, লোকসম্মান তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, দুঃখ দারিদ্র্য তাঁহাকে নিষ্পেষণ করিতে সমর্থ হয় না, লোক-নিন্দা তাঁহার পদধূলিও স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সেই অখণ্ড রসের আস্বাদনে যে অনির্ব্বচনীয় শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন; তাহা কখনও নিঃশেষ হইবার নহে, তাহা কখনও গ্লানি বা অবসাদ আনয়ন করে না; সে রস কখনও পুরাতন হইয়া যায় না। রসস্বরূপের সেই অনন্ত আনন্দরস নিত্য নব নব রূপে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে উপভোগ করিয়া সাধক সংসারের যাবতীয় সুখ সম্মান দুঃখ অপমান স্তুতি নিন্দা সম্পৎ বিপদের ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া অপর সকলকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া বলেন—'রসোবৈ সঃ'।—সাধুবাক্যে শাস্ত্রসিদ্ধান্তে এই এক অখণ্ডনীয় মহাসত্যের সংবাদ পাওয়া যায়, 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধা নন্দী ভবতি' এই রসস্বরূপকে লাভ করিয়াই জীব যথার্থ আনন্দবান হয়। যখন 'রসোবৈ সঃ' মহাবাক্যের অভিধানকৃত ক্ষুদ্র অর্থে পরিতুষ্ট না হইয়া তাহার অনন্ত ভাব-প্রবাহে আত্মা ডুবিয়া যায়, তখন—চন্দ্রের অমল ধবল শীতল কিরণ এবং সূর্য্যের প্রখর রশ্মিজাল একই আনন্দ রস বিকীরণ করিতে থাকে, তখন মন্দ মলয়-মারুতে এবং উদ্ধত ঝঞ্ঝাতরঙ্গের অভ্যন্তরে সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় 'রসোবৈ সঃ'। তখন স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধবের মুখে এক দিব্য লাবণ্য বিকসিত হইয়া উঠে, শত্রুর কর্ম্মে শত বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহাতে চিত্তে গ্লানি আনয়ন করে না এবং শত্রুর প্রতি বৈরভাব বিদূরিত হইয়া যায় ও তাহাকে দয়া করা—ক্ষমা করা সহজ হইয়া উঠে। ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যরাশিও ভগবৎপ্রেম-রস-পান-রত মহাপুরুষের হৃদয়ে প্রলোভনের রেখাপাত করিতে পারে না। তিনি তখন স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, রসস্বরূপকে অন্তরে বাহিরে অনুভব না করিলে ইন্দ্রত্বও গভীর নরকযন্ত্রণা এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে তাঁহার প্রেমরসের মধুর লীলা দর্শন করিলে দারিদ্র্যও দুঃখের লেশমাত্র সঞ্চার করিতে পারে না! তিনি তখন তাঁহার ইচ্ছায় যখন যে অবস্থায় পতিত হন, তাহাতেই সন্তোষ লাভ করেন। হিংস্র-জন্তু-সমাকুল অরণ্যের পর্ণকুটীরে বা নর-নারী-পরিব্যাপ্ত নগরের সুরম্য হর্ম্ম্যে, সম্পদের উচ্চ

শিখরে বা বিপদের নিষ্ঠুর তরঙ্গে সর্ব্বত্রই তিনি অনুদ্বিগ্ন অব্যাকুল এবং সন্তুষ্ট চিত্ত। চিত্ত সরস থাকিলে ময়ূরের কেকাধ্বনি বা ভেকের কর্কশ কলরবেও একটা অব্যক্ত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নীরস প্রাণে মৃদু মধুর বীণাধ্বনি বা কোকিলের কুহুরবও বিরক্তির সঞ্চার করে; রসস্বরূপের প্রেম-পীযূষ-রস-ধারায় যাঁহার মনঃপ্রাণ সুরসাল হইয়াছে, তাঁহার নিকটে বিশ্বভুবনের প্রত্যেক অণু পরমাণু মধুময় হইয়া উঠে এবং উৎসবে ব্যসনে নিশিদিন সেই অনন্ত প্রেম-সুধা-সাগরে মগ্ন থাকিয়া তাঁহার আত্মা অমৃতময় হইতে থাকে ও অন্তরে বাহিরে সেই আনন্দরসসংস্পর্শে তাঁহার আত্মা মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয় হইতে প্রতি রোমকূপ পর্য্যন্ত সমস্তই উদ্ভাসিত—উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তখন তিনি প্রাণে উপলব্ধি করেন—'রসো বৈ সঃ' এবং তাঁহার বদন-কমল হইতেও স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—'রসো বৈ সঃ'।

হে রসস্বরূপ! তোমাকে অনুভব করিতে না পারিয়া আমরা দিন দিন সংসারের নীরস তিক্ততায় অধীর হইয়া উঠিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া রস-স্বরূপে আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। আমাদের মনঃপ্রাণ জীবন তোমার প্রেমরসে সিক্ত করিয়া দাও। সেই প্রেমরসে মধুময় হইয়া আমরা স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসারকে মধুময় দেখিয়াএবং সকলের আদ্যন্ত মধ্যে মধুময়—মঙ্গলময়—রসস্বরূপ তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া যাই এবং তোমার অসীম আনন্দরসের পথে তোমার আনন্দ লোকের প্রতি দিনে দিনে অগ্রসর হইতে থাকি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজ।

হিন্দু ভারতবর্ষ খ্রীষ্টীয়ান ইয়োরোপ অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের পক্ষে অনুকূল স্থান। ভারতবর্ষে পৌত্তলিকতার বহুল প্রচলন রহিয়াছে সত্য, কিন্তু পৌত্তলিকতা যে নিকৃষ্টাধিকারীর ধর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্রের এই সনাতন উপদেশ ধর্ম্মোন্নতির দিকে হিন্দুর মনকে আকর্ষণ করিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম নরপূজা-প্রধান ধর্ম্ম। খ্রীষ্টধর্ম্মের এমন কোন উপদেশ নাই যাহা ঐ ধর্ম্মাবলম্বীর মনকে ধর্ম্মোন্নতির জন্য প্রবুদ্ধ করিতে পারে, নরপূজা হইতে ব্রহ্মপূজায় উত্থিত করিতে পারে। সাকারকে ত্যাগ করিয়া নিরাকারকে অবলম্বন করা পৌত্তলিক হিন্দুর পক্ষে যেমন দুরূহ, নর-দেবতাকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে অবলম্বন করা, খ্রীষ্টীয়ানের পক্ষে তেমনি দুরূহ। কিন্তু হিন্দু যেমন সাকারকে ত্যাগ করিয়া নিরাকারকে অবলম্বন করিবার জন্য স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ ও উপদেশ পাইতেছেন, খ্রীষ্টীয়ান খ্রীষ্টপূজা বা নরপূজা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-পূজায় আরোহণ করিতে স্বীয় ধর্ম্মের তেমন কোন আদেশ ও উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন না, বরং তাহা যে ধর্ম্মাবনতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়া থাকেন। অপরন্তু ভারতবর্ষে মধ্যে মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচারের যেরূপ চেষ্টা হইয়াছে, ইয়োরোপখণ্ডে সেরূপ চেষ্টা হয় নাই। পুরাকালে ভারতে উপনিষৎ যে ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেন তাহা একেশ্বরবাদ, তৎপরে রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও একেশ্বরবাদমূলক। ভারতবর্ষে এইরূপে

একেশ্বরবাদের যে একটী প্রবাহ বহিয়া আসিতেছে, ইয়োরোপে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে ইহা কিছু মাত্র বিস্ময়কর নহে যে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবার চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল পরে লণ্ডন নগরে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের ইংলণ্ড ভ্রমণের এক বৎসর পরে শ্রীযুক্ত চার্লস বয়সী সাহেব কর্ত্তৃক লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হয়। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বিপুল আন্দোলন উত্থিত করেন। সে আন্দোলন শ্রীযুক্ত বয়সী সাহেবের মত ও বিশ্বাসের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল আমরা সম্যক অবগত নহি, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার মন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি যে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত বয়সী সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১৮৭১ সালের ১ অক্টোবর তারিখে একটী ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলী গঠন করিয়া প্রকাশ্যে ব্রহ্মোপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। এই উপাসকমণ্ডলী প্রথমে লণ্ডনের সেণ্ট জর্জ্জ হল নামক সাধারণ সভাগৃহে প্রতি রবিবারে উপাসনার জন্য একত্রিত হইতেন। উহাই লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। এই ত্রিশ বৎসর কাল নানা শুভ ও অশুভ ঘটনা, বিপদ সম্পদ, এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া শ্রীযুক্ত বয়সী সাহেব তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজকে কেবল সংরক্ষণ ও পালন করিয়াছেন এমন নহে, উহাকে সমুন্নত আকার প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে ঈশ্বরের সত্য প্রচারে ঈশ্বরের প্রসাদ তিনি অবশ্যই লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। গভীর ঈশ্বরানুরাগ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া তিনি এবং তাঁহার প্রধান অনুবর্ত্তীগণ এই সুমহৎ কার্য্যে প্রাণ মন সমর্পণ করেন। যে সকল কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস শত শত বৎসর সাধারণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণের হৃদয়ে আধিপত্য করিয়া আসিতেছিল, স্বদেশবাসীগণের পক্ষে তৎসমস্তের অপকারিত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়াই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক বিস্তারে বদ্ধপরিকর হয়েন। তাঁহার সাধু চেষ্টার সাধুত্ব ও মহত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হইয়া, স্বদেশবাসীগণ তাঁহাকে নাস্তিক ও দেশের ঘোর শত্রু বিবেচনা করিতে লাগিল। সঙ্কীর্ণমনা ও ধর্ম্মসংস্কারবিদ্বেষী লোকের বিপক্ষতাচরণ, মিথ্যা দোষারোপ, ঈর্ষা, ঘৃণা সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া বয়সী সাহেব স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অটল মনে নিযুক্ত রহিলেন। স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মিতা, তর্ক-শক্তি ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের বলে তিনি শনৈঃ শনৈঃ সুসিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে দেশের উচ্চ-শিক্ষিত, জ্ঞানী, স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ বয়সী সাহেবের একেশ্বরবাদসম্মত উপদেশ শ্রবণার্থ আগ্রহের পরিচয় দিতে লাগিলেন। একদিকে কুসংস্কার-নিমগ্ন বিশাল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়, অপর দিকে, বিজ্ঞান-ভক্ত সংশয়বাদীগণের প্রবল দল। খ্রীষ্টীয়ানদিগের অন্ধ ভক্তি ও বিজ্ঞানবাদীদিগের ভক্তিশূন্যতা এই উভয়েরই যুক্তি-বিরুদ্ধ প্রকৃতি সপ্রমাণ করিয়া বয়সী সাহেব বিলাতের ধর্ম্মপ্রাণ ও সদ্বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ

করিয়াছেন। এই উন্নত শ্রেণীর অনেকগুলি ইংরাজ তাঁহার প্রবর্ত্তিত জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-সাধক ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া তাঁহারা যে শান্তির অধিকারী হইয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিতেছেন।

বয়সী সাহেব ত্রিশ বৎসর কাল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া আজ কৃতজ্ঞ অন্তরে বলিতেছেন;—"Hitherto hath the Lord helped us" "এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আমাদিগের সহায়তা করিয়াছেন।" ধর্ম্ম প্রচারার্থ বয়সী সাহেব চারিটী বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ প্রতি রবিবারে সমাজগৃহে ব্রহ্মোপাসনা; দ্বিতীয়তঃ প্রতি রবিবারে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা মুদ্রিত করিয়া পৃথিবীর নানা দেশে, প্রধানতঃ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় তাহার প্রচার; তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ প্রচার; চতুর্থতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে পত্র দ্বারা নিয়মিত উপদেশ প্রদান। লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজ (Theistic Church) গৃহে প্রতি রবিবারে অনেকগুলি পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগ দেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সাপ্তাহিক উপাসনায় প্রথম হইতেই শ্রীযুক্ত চার্লস বয়সী আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন; এক্ষণে তাঁহার পুত্র এলিসন্ বয়সী এ বিষয়ে তাঁহার সহকারিতা করিতেছেন। উপাসনার পর প্রতি রবিবারেই দেখা যায় যে শ্রোতাদিগের মধ্যে দুই চারি জন অপরিচিত লোক আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া উপাসনা শ্রবণে তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রতি রবিবারেই ধর্ম্ম বা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটী অভিনব বিষয়ে সুযুক্তি ও সুভাব পূর্ণ উপদেশ প্রদত্ত হয়। ঐ উপদেশের এক হাজার দুই শত খণ্ড অবিলম্বে মুদ্রিত হইয়া বিভিন্ন দেশস্থ গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হয়। গ্রাহকগণ ঐ উপদেশ আগ্রহের সহিত যে পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহাদের লিখিত পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে এ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ লক্ষ খণ্ড ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে। মিষ্টার ইটন্ নামক একজন ধনী ইংরাজ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচার উদ্দেশে ৪৫ হাজার টাকা দান করেন। ঐ অর্থের সাহায্যে বয়সী সাহেব-প্রণীত কতকগুলি বৃহৎ ধর্ম্মগ্রন্থের ষোল হাজার এবং কয়েকখানি পুস্তিকার বহু সংখ্যক খণ্ড সাধারণ পুস্তকালয়, বিদ্যালয় এবং ধর্ম্মানুরাগী বহু লোকের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধায়ী বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের সহিত পত্রযোগে ধর্ম্মালোচনা করিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ও ব্রাহ্ম করিবার চেষ্টায় বয়সী সাহেব আশাতীত সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি আমাদিগকে সম্প্রতি যাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; "সহস্র সহস্র লোকের নিকট হইতে আমি যে রাশি রাশি পত্র পাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিলে জগৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমার প্রণীত গ্রন্থ এবং আমার লিখিত পত্র পাঠে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন, এই সকল পত্র তাঁহাদিগের

নিকট হইতেই আসিয়াছে। ইহাঁরা সকলেই আমার প্রতি প্রেমপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এ প্রকার পত্র প্রত্যহই পাইয়া থাকি। পূর্ব্বে এরূপ পত্র সপ্তাহে একখানি পাইলে যথেষ্ট হইয়াছে মনে করিতাম। কিন্তু এক্ষণে কোন কোন সময়ে প্রত্যহই দুই তিন খানি পাইয়া থাকি।"* শ্রীযুক্ত বয়সী সাহেবের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শিষ্যবর্গের ঐকান্তিকতার প্রধান প্রমাণ এই যে এ পর্য্যন্ত লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজের স্থিতি ও উন্নতি কল্পে এবং পাশ্চাত্য জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য তাঁহারা নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতি বৎসর তাঁহারা চব্বিশ হাজার টাকা দান করিয়া থাকেন।

লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজের ত্রিশবৎসরকালব্যাপী চেষ্টায় ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে বহুসংখ্যক লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকার অন্তঃপাতী যুক্তরাজ্যে, কানাডা, ব্রেজিল, প্যাটাগোনিয়া প্রভৃতি প্রদেশে, এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখা যাইতেছে। ইয়োরোপ খণ্ডের জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন রাজ্য সমূহে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাদৃত হইতেছে। সুইডেনের দেশীয় ভাষায় বয়সী সাহেবের ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। বয়সী সাহেবের একখানি প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ স্পেন, ইটালী, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স ও হলণ্ডের দেশীয় ভাষাসমূহে অনুবাদিত হইয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বয়সী সাহেবের সাহায্যকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বা আচার্য্য নামে অভিহিত না হইলেও প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মপরায়ণ চার্লস বয়সী মহোদয়ের জীবনব্যাপী প্রাণগত চেষ্টা ও যত্ন এবং অপরিসীম উৎসাহ ও অধ্যবসায়বলে, লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজ এক্ষণে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। বয়সী সাহেব যে সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহার একটী নিগূঢ় কারণ এই যে তিনি ইংরাজদিগের জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিতেছেন। বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপন্ন করিতেছে, বয়সী সাহেব অপরিশ্রান্ত ভাবে, ক্রমাগত স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের মনে এই সত্য গভীর রূপে অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন যে যাহা প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্যদেশবাসীগণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে যে সুবিধা হইতেছে তাহা অন্য উপায়ে হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

আদি ব্রাহ্মসমাজ লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজের জন্মাবধি উহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের সকল ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজেরও

---

* "What would be a wonderful revelation to the world, if I could show it, is the mass of letters I have received from thousands and thousands of people who have become Theists, and have written to me their loving thanks for such help as I give them in my letters and books. They come in now every day. Formerly if we got one a week it was thought good. Now, at times, we have had 2 or 3 in one day."

উন্নতিকল্পে আবশ্যকমত অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। উক্ত সমাজের ত্রিশ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে শ্রীযুক্ত বয়সী সাহেব ঐ সাহায্য জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন:—"From India has come most handsome support contributed by the venerable Maharshi Debendra Nath Tagore" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি ঈশ্বরপ্রসাদে লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজ দিনে দিনে স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র প্রসারণ পূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইয়োরোপ ও আমেরিকাকে ভ্রান্ত বিশ্বাসের অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল জ্যোতি দ্বারা আলোকিত করিতে সক্ষম হউন।

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত।*

আমরা সম্বৎসর কাল পরে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রসূত জড়বাদের ভিতরে থাকিয়া আমাদের মনে নানা কুটিল সংশয়ের উন্মেষ হইতে পারে যদিও আস্তিক্য বুদ্ধি বংশপরম্পরাক্রমে আমাদের অস্থিমজ্জার সহিত বিজড়িত, যদিও ধর্ম্ম-ক্ষেত্র আর্য্যভূমির রসাকর্ষণ করিয়া আমাদের স্থিতি বৃদ্ধি, যদিও ভাবপ্রবণতা ও নানা অনুকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের জন্ম, তথাপি অন্তরনিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব ম্লান হইবার শত শত কারণ আজ কাল আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। ভারতের আকৌমার ব্রহ্মচর্য্য গর্ভাষ্টমে আরব্ধ—সে শিক্ষা, সে দীক্ষা, সে আদর্শ এ দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে। প্রকৃত উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই, মানসিক কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ আজকালকার গণনায় পরম পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়াইতেছে। বৈরাগ্যের ভাব ক্রমিকই অস্তমিত হইতেছে। ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধন ক্রমিকই শ্লথ হইতেছে। নিস্পৃহ নিরহঙ্কার সাত্ত্বিক ভাব আজ কাল আমাদের নিকট হইতে বিদায় মাগিতেছে। তাহার স্থলে রাজসিক ভাবের সঞ্চার হইতেছে। এখনও যদি আমাদের অন্তরে চেতনার সঞ্চার না হয়, এখনও যদি আমরা প্রতিকূল অবস্থা-স্রোতের নিদারুণ ঘূর্ণীর প্রবল আকর্ষণ হইতে সবলে বিনির্ম্মুক্ত হইবার চেষ্টা না করি, যদি বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া এবং নিজেকে দুর্ব্বল জানিয়া সেই দুর্ব্বলের বল পতিতপাবনের সাহায্য ভিক্ষার জন্য আমরা প্রার্থনা না করি, তবে রসাতলের দিকে যে ক্রমিকই অগ্রসর হইয়াছি, তাহা হইতে আর কেহই আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। সেই জন্যই আমরা বিনয়ের সহিত সকলকে বলিতেছি যে, নিজ নিজ অবস্থার বিষয় একবার আলোচনা কর, আপনার দুর্ভাগ্য নিজে অনুভব না করিলে তাহার প্রতিকার চেষ্টা আসিতে পারে না।

শরীরকে পবিত্র ও নীরোগ রাখিবার জন্য শাস্ত্রে যে ভূরি ভূরি অনুশাসন রহিয়াছে তাহার কারণ কি? আমাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, শরীর ও স্বাস্থ্যের উপরেই নির্ভর করে। আজ কালকার দিনে বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমজাত দৌর্ব্বল্য, জীবনব্যাপী পীড়া, অকাল মৃত্যু দেখিয়া আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি? আমরা স্পষ্ট বুঝিতেছি জ্ঞান শিক্ষা করিতে গিয়া শরীরের অবমাননা ঈশ্বরের রাজ্যে অসহ্য। শরীর ও মন কোনটিই আমাদের উপেক্ষণীয় নহে। শরীরের সতেজ ও সবল ভাবের ভিতর দিয়া আনন্দ জাগিতেছে। কাব্য, সাহিত্য, জ্যোতিষ, রসায়ন আলোচনা কর, মহত্তর বিমলতর আনন্দধারা প্রবাহিত দেখিবে। কিন্তু এ আনন্দও মনুষ্যের তাবৎ নহে। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী পথে পথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, এক মুষ্টি অন্ন দিয়া তাহাদিগকে সঞ্জীবিত কর। পুত্র কন্যা, ভার্য্যাশোকে শোকার্ত্ত মানবের দরদর ধারে প্রবাহিত নয়নাশ্রু মার্জ্জনা করিয়া সান্ত্বনা দাও। ভয়াবহ মহামারী রোগযন্ত্রণায় অন্তর্দাহে প্রপী-

---

* বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার সারাংশ।

ড়িত রুগ্নের অন্তিম শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার সেবা কর, দেখিবে তোমার অন্তরে অভূতপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদের বিমলতর আনন্দ যাহা সহজে জাগিয়া উঠিবে, কোথায় তাহার নিকটে স্বাস্থ্য-জনিত আনন্দ, জ্ঞানালোচনা-সম্ভূত তুষ্টি। ইহা অপেক্ষা যদি বিমলতর আনন্দের ভিখারী হও, আইস ভারতের সেই প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত সখ্য বন্ধন কর, যাঁহারা ঈশ্বরের আনন্দেই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিয়া চারিদিকে শোকের এত মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, মর্ম্মাহতের হৃদয়ের তুষানল, এত হাহুতাশ, এত চিতাভস্মের ছবি সম্মুখে দেখিয়াও সমস্ত হৃদয়ের সহিত অচল অটলভাবে বলিতেছেন 'আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি' মৃত্যু আর কিছুই নয়, অনন্ত অপার উদার আনন্দের সহিত সম্মিলন—আনন্দে পরিসমাপ্তি। দূর হইতে ধর্ম্ম ঈশ্বর লইয়া বিচার করিও না, ধর্ম্মের আশ্রয়ে আইস, সর্ব্বসংশয় ও হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হইবে, সংশয় কুতর্ক দূরে পলায়ন করিবে, আত্মার ভিতরে মধুময় ঈশ্বরের আবির্ভাবে জীবন মধুময় হইবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪৫১৮ ৩
পূর্ব্বকারস্থিত	...	৮৬৫।৶৬
সমষ্টি	...	১৩১৭।৶৯
ব্যয়	...	৭৩৮ ৶৯
স্থিত	...	৫৭৯।০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৭৯।০

৫৭৯।০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৲

১৯৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৪।৶০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা
২৲
„ „ গোপালচন্দ্র দে, ঐ
১৲
„ „ কানাইলাল দাস, ঐ
৩৲
„ „ মহেন্দ্রনাথ সেন, ডিব্রুগড়
৩।৶০
„ „ দিগম্বর দত্ত, ক্ষীরপাই
৫৲

১৪।৶০

পুস্তকালয়	...	৪ ৶৬
যন্ত্রালয়	...	২৩৬॥৴৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২॥০
সমষ্টি		৪৫১৮৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯০ ৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		৮৮৸৶৬
পুস্তকালয়	...	৮।৴৯
যন্ত্রালয়	...	১৫০॥৴৯
আমানত	...	৩০০৲
সমষ্টি		৭৩৮ ৴৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

পঞ্চদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮৩।

[illegible] সংখ্যা | ১৮৩৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬৯। কলিগতাব্দ ৫০১৩। ১ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা কাহার নাম ? *

আজ কাল জগতে ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষ বিবাদ বিসম্বাদ নানা মতামত ও অশান্তির একশেষ হইয়াছে দেখা যায়, অতএব যথার্থ পক্ষে ধর্ম্ম যে কি, ও কাহাকে বলে ধর্ম্ম, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেন ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকেন, কিন্তু এই ধর্ম্ম কি বস্তু ? তাহা কি কেবল কল্পিত একটী শব্দ মাত্র, কিম্বা বাস্তবিক কোন সত্য বস্তু আছেন, যাঁহার নাম ধর্ম্ম ? যদি ধর্ম্ম নামে কোন সত্য বস্তু থাকেন, তবে তাহা কি ও কোথায় আছেন ? তাহা এক কি অনেক ? যদি এক হন তবে তাহাই বা কোথায় ? আর যদি বহু হন তবে তাহাই বা কোথায় ?

সত্যের নাম ধর্ম্ম কি মিথ্যার নাম ধর্ম্ম ? আর যিনি ধর্ম্মকে ধারণ করিতে চাহেন ও ধর্ম্মের নিয়মে চলিতে চাহেন, তিনি নিজে মিথ্যা হইয়া মিথ্যা ধর্ম্মকে ধারণ করিতে চাহেন, কিম্বা সত্য হইয়া সত্য ধর্ম্মকে ধারণ করিতে চাহেন ? যিনি ধারণ করিবেন ও যিনি ধৃত হইবেন এই উভয়ই যদি মিথ্যা হন, তাহা হইলে এখানে বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে মিথ্যাকে মিথ্যা কি ধারণ করিবে ? মিথ্যা মিথ্যাই, যাহা কোন কালে নাই— তাহারই নাম মিথ্যা, আর যাহা মিথ্যা তাহা সকলের নিকট মিথ্যা, মিথ্যা হইতে সৃষ্টি স্থিতি লয়, এবং ঈশ্বর গড আল্লা খোদা ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, ধারণ করা ধৃত হওয়া, ইহার কিছুই হইতে পারা অসম্ভব কি না ? যদি কেহ বলেন যে মিথ্যা হইতেই সমস্ত হইয়াছে ও হইতে পারে,—তবে তাঁহার জানা উচিত যে তিনিও যখন সেই মিথ্যা হইতে হইয়াছেন, তখন তিনি নিজেও মিথ্যা, তাঁহার বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা, এবং তাহা হইলে বিচার এই খানেই শেষ হয় কারণ মিথ্যার বিচারের প্রয়োজনই নাই।

আর যদি বোধ কর যে আমরা সত্য হইতে হইয়াছি; আমরা সত্য, আমাদের বিশ্বাস ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল অমঙ্গল ইত্যাদি সমস্তই সত্য; এবং পক্ষান্তরে ইহাও যখন স্থির যে, সত্য এক ব্যতীত দুই হইতে পারে না, কা-

* মহর্ষিদেবের অন্তঃপুরে মহিলাসমাজে তাঁহারই পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পঠিত।

রণ যাহা সত্য নহে—বা সত্যের বিপরীত তাহারই নাম মিথ্যা, তখন সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত যে সত্য ধর্ম্ম বা পরমাত্মার এক কি বহু হওয়া সম্ভব, যদি এক হন তবে জীব মাত্রেরই এক ধর্ম্ম ও এক মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা হইবেন কি না? আর ইহাই যদি হয় যে মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা এক ভিন্ন দুই হইতেই পারে না, তবে মনুষ্য মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এত বিবাদ কলহ মতভেদ ও অশান্তি কেন? ইহার অবশ্যই কোন কারণ আছে, সেই কারণ আমাদের অন্বেষণ করা বিশেষ আবশ্যক কি না?

মনুষ্যে যাহাকে ধর্ম্মগ্রহণ করা বলে তাহার প্রকৃত অর্থ কি? এক অদ্বিতীয় সত্য বস্তু যে পরমাত্মা তাঁহাকে ধারণ বা গ্রহণের নামই ধর্ম্মগ্রহণ? কি মনুষ্যকল্পিত মতামত বা অনুষ্ঠান গ্রহণের নাম ধর্ম্মগ্রহণ? যদি মনুষ্যকল্পিত কোন মতামত বা অনুষ্ঠান বিশেষের গ্রহণের নাম প্রকৃত ধর্ম্মগ্রহণ হয়, তবে জগতে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের নামে এত মতামৃত ও এত অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, তাহা অবলম্বনে লোক মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইতেছে না কেন? ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের এত আড়ম্বর সত্ত্বেও রোগ শোক, দুঃখ অভাব, হিংসা দ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ মহামারী, অমঙ্গল অশান্তি, অকালমৃত্যু কেন?

ধর্ম্ম গ্রহণ ও ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্য কি? ইহা জীবের মঙ্গলার্থে কি অমঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত হয়, অথবা মঙ্গল-অমঙ্গল-শূন্য খেয়াল মাত্র, যদি খেয়াল মাত্র হয়, তবে পাগলের খেয়াল ও শিশুর খেলার যেমন কোন বিচার নাই, এ সম্বন্ধেও সেইরূপ কি না? যদি জীবের অমঙ্গলার্থে হয়—তবে সকলেরই ইহার নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য কি না? আর যদি মঙ্গলের জন্য হয়—তবে মঙ্গল হইতেছে কি না বিচার না করিয়া, না বুঝিয়া ধর্ম্মাচরণ করা উচিত কি অনুচিত?

ধর্ম্ম বা সত্য বা ইষ্টদেবতা বা পরমাত্মা নামীয় কোন সত্য বস্তুকে জীবের প্রয়োজন আছে কি না? যদি প্রয়োজন থাকে, তবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক কি না, যে তিনি কিরূপ কোথায় আছেন? প্রকাশ কি অপ্রকাশ, নিরাকার কি সাকার, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধই বা কিরূপ, এবং ব্যবহারের প্রণালীই বা কিরূপ?

পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ দেখ, যাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিবিশেষের বিনা চেষ্টায় বা বিতর্কে, স্বভাবতঃ সকলের মধ্যে সমান ভাবে ঘটিয়া থাকে ও ঘটিতেছে, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কি না? বহির্ম্মুখেও দেখা যাইতেছে যে, জীবসমূহের স্থুল সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়াদি এবং যে ইন্দ্রিয়ে যে গুণ বা ধর্ম্ম তাহা সকল জীবে সমানভাবে বর্ত্তাইতেছে, এই হাড় মাসের পুতুল শরীর, রক্ত রস নাড়ী ইত্যাদি, এবং চক্ষু দ্বারা দেখা, কর্ণদ্বারে শব্দ গ্রহণ করা, নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া, ক্ষুধা পিপাসা, দুঃখ সুখ, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি, যে যে ধর্ম্ম আছে তাহা সকলেতেই সমভাবে ঘটিতেছে কি না? এবং যার যা অভাব সে নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছে কি না? জীব স্বয়ং প্রত্যক্ষ চেতন, কি সত্য কি মিথ্যা, কি আছে কি নাই, এবং তাহার কিসের অভাব আছে সে নিজেই তাহা বুঝিতে পারে, ও বুঝিয়া নিজেই সে অভাব মোচন করিতে চেষ্টা পায় ইহা প্রত্যক্ষ কি না? কাহারো নিজের চেষ্টাতে অভাব মোচন হয়, কাহারো অপরের দ্বারা বা সাহায্যে অভাব মোচন হয়,—কিন্তু অবিচারে, উপায়ের বলাবল না বুঝিয়া কোন কার্য্য করিতে চেষ্টা পাইলে যেমন তৃষ্ণায় অগ্নিসেবন—তাহার দ্বারা অভাব

মোচনরূপ চেষ্টার সফলতা হয় কি না? জীব শিশুকালেও ক্ষুধা পিপাসাদির অভাব বোধ করে এবং ফুটিয়া বলিতে ও নিজে মোচন করিতে না পারিয়া কাঁদে; তাহাদের মাতা পিতা চেতন, তাহাদের অভাব বুঝিতে পারেন ও বুঝিয়া তাহা মোচন করেন। এই রূপ যে যে বিষয়ে জীবের অভাব আছে জীব নিজেই যখন তাহা বুঝিতে পারে দেখা যাইতেছে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে ধর্ম্ম বা সত্য বা পরমাত্মা, তাঁহার অভাব জীবের স্বয়ং অনুভব করিতে পারা সম্ভব কি না? আর এই অভাব বোধ স্বভাবতঃ জন্মাইবার পূর্ব্বে, বিচারের দ্বারা জীবাত্মাকে নিজের প্রকৃতি বুঝাইয়া দিয়া অভাব বোধ উদ্বোধিত করিয়া দেওয়া ব্যতীত, মতামত ও সংস্কার দিয়া জ্ঞান জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা পাইলে, স্বাভাবিক জ্ঞান উদ্বোধিত হইবার পরমাত্মা-নির্দ্দিষ্ট সত্য পথ হইতে জীবকে ভ্রষ্ট করা হয় কি না?

লোকে যাহার নাম দিয়া থাকে সত্য বা ধর্ম্ম, তাহা কি কেবল নাম মাত্র বা মনঃকল্পিত ভাব মাত্র, অথবা স্বাভাবিক স্বতঃপ্রকাশ আপন শক্তিতে আপনি প্রকাশিত কোন বস্তু আছেন, যাঁর নাম সত্য বা ধর্ম্ম।

নিত্যকালস্থায়ী যে এক অদ্বিতীয় সত্য বস্তু আছেন, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই চৈতন্য, তিনিই জীবসমূহের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা, মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা, পরমাত্মা, কি এই প্রত্যেক শব্দের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্য বস্তু আছেন? যদি কেহ বলেন যে, এই সকল শব্দের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্য বস্তু আছেন, তবে সে বহু সত্য বস্তু কোথায় আছেন? আর যদি কেহ বলেন যে এই সকল শব্দের প্রতিপাদ্য একই সত্য বস্তু, তবে সে এক সত্য বস্তুই বা কোথায় আছেন? এবং তিনি কিরূপ?

ইনিই যে সত্য বস্তু এইরূপে সত্য বস্তুকে চিনিবার কোন উপায় আছে কি না? জীবের নিকট সত্য বলিয়া কি ভাসিতেছে, প্রকাশ কি অপ্রকাশ? যদি কোন প্রকাশ না থাকিত তবে যাঁহাকে এখন অপ্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে—তাঁহার সম্বন্ধে, তিনি অপ্রকাশ এরূপ উক্তি জীবের পক্ষে সম্ভবপর হইত কি না? যেমন বর্ত্তমান না থাকিলে ও তাহা সত্য না হইলে ভূত, ভবিষ্যতকে কেহ সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেই পারে না, ইহাও সেইরূপ কি না?

অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণই কেবল যদি ধর্ম্ম বা সত্য বা বস্তু বা পরমাত্মা হন, তবে প্রকাশ সাকার সগুণ, এই যাহা প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, যাহার অন্তর্গত জীব সমূহ তাহা কি এবং কোথা হইতে আসিল? আবার যদি প্রকাশ সাকার সগুণই কেবল ধর্ম্ম বা সত্য বা বস্তু বা পরমাত্মা হন, তবে প্রকাশ সাকার সগুণের অতিরিক্ত অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ এই দ্বিতীয় সত্য কোথা হইতে আসিল? অপ্রকাশ নিরাকার নির্গুণ এক সত্য, এবং প্রকাশ সাকার সগুণ আর এক সত্য? কি প্রকাশ অপ্রকাশ নিরাকার সাকার জীবসমূহকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ এক অদ্বিতীয় সত্য আছেন, যিনি ধর্ম্ম, যিনি সত্য, যিনি একমাত্র সকলের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা, এবং যাঁহাকে ধারণ বা গ্রহণ করিলে, যথার্থ পক্ষে জীবের সর্ব্বদুঃখ মোচন হয়, এই বিষয় মনুষ্যমাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া যথার্থ সত্যধর্ম্ম বা পরমাত্মাকে ধারণ করা কর্ত্তব্য কি না? এবং এই সকলের মীমাংসা ব্যতীত জগতে এক সত্যধর্ম্ম স্থাপন হওয়া সম্ভব কি না?

হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা, আপনি যে সাকার নিরাকার প্রকাশ অপ্রকাশ চরাচর জীবসমূহকে লইয়া পূর্ণ ও

অখণ্ড, আমরা আপনার এই অসীম পূর্ণ অ-খণ্ড স্বরূপ ধারণে অক্ষম হইয়া, অজ্ঞান অভিমান বশতঃ সাকার নিরাকার প্রকাশ অপ্রকাশ ভাবের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করিয়া, আপনার পূর্ণত্বের ও অখণ্ডত্বের অপলাপ করিতেছি এবং তদ্দারা নানা মতামত ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি কল্পনা করিয়া, হিংসা দ্বেষ বশতঃ জগতে অমঙ্গল ও অনিষ্টপাতের মূল সৃষ্টি করিতেছি, এই অপরাধ আপনি নিজ গুণে মার্জ্জনা করিয়া আমাদের নিকটে পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হউন, এবং কৃপা করিয়া এরূপ শক্তি দান করুন, যাহাতে আমরা আপনার এই পূর্ণস্বরূপ ধারণে সক্ষম হই; আমরা নিজে যে কি, আমরা আদি অন্ত মধ্যে কি, এবং জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে প্রতিদিন আমাতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহাই বা কিরূপ? ইহাই বুঝিতেছি না, তখন আপনাকে কি বুঝিব যে আপনি কিরূপ।

আমরা জ্ঞান ভক্তি প্রেম ধর্ম্ম কিছুই জানি না, আপনিই আমাদের জ্ঞান ভক্তি প্রেম ধর্ম্ম যোগ তপস্যা, গর্ভজাত সন্তানের প্রতি মাতা যেমন স্নেহপরবশ হইয়া তাহার সমস্ত অভাব মোচন করেন, হে জ্যোতিঃস্বরূপ সেই প্রকার আপনি সাকার নিরাকার অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া এরূপ বিধান করুন, যাহাতে সমস্ত অমঙ্গল দুঃখ দ্বন্দ্ব দূর হইয়া, জগতে মঙ্গল ও শান্তি স্থাপনা হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা যেমন নয়নপ্রীতিকর, নববর্ষের পবিত্র ঊষার সৌন্দর্য্য তদ্রূপ হৃদয়ানন্দকর। আত্মার অনন্ত জীবনের আশা এই মধুময় প্রভাতেই প্রস্ফুটিত হয়। শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, বর্ষে বর্ষে শরীর যেমন ক্ষয়ের দিকে নিপতিত হইতেছে, আত্মা সেইরূপ অনন্ত অমরত্বের দিকে উত্থান করিতেছে। শরীর এবং আত্মা দুই ভিন্নধর্ম্মী—এক অন্ধকার, অন্য জ্যোতি; এক মৃত্যুরূপ, অন্য অমৃত; এক মিথ্যা, অন্য সত্য। এই নববর্ষের উষালোকেই আত্মার নূতন গতি, নূতন ভাব উপলব্ধি করিয়া আমরা আত্মপ্রসাদে পুলকিত হই—আত্মাকে অক্ষয় সম্পদ লাভের অধিকারী দেখিয়া আশা পুলকে বিহ্বল হই। আমাদের গন্তব্য ব্রহ্মধাম, পুণ্য এবং পবিত্রতা সেই ব্রহ্মধামে যাইবার পথের জ্যোতি। একটি বর্ষ পরিত্যাগ করিয়া বর্ষান্তরে প্রবেশ করিবার সন্ধিক্ষণে এই জ্যোতি আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহাতে অঙ্কিত দেখি, "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্।" এই ব্রহ্মকৃপা গুরুরূপে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা আমাদের মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমাদের জীবনের গতি মুক্তির ভাব প্রকটিত করিয়া দেয়। ব্রহ্মকৃপাই আমাদের অন্তর্বাহে নেতা। শোক, তাপ, জরা মৃত্যুর আয়তন এই শরীরে স্থিত আত্মার মধ্যে পরমাত্মার কি অতুল কৃপা প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে! তাঁহার কৃপাতেই আমরা মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের আস্বাদ পাইতেছি, কালের মধ্যে সেই অকাল পুরুষের অমৃত আহ্বান শ্রবণ করিয়া অভয় হইতেছি। তাঁহাকেই ইহকালের এবং পরকালের এবং অনন্ত কালের সহায়, সুহৃৎ এবং আশ্রয় জানিয়া শান্তিলাভ করিতেছি। সেই শান্তিদাতা পরমপিতা যখন আমাদের মনের সকল সংশয় দূর করিয়া খণ্ডকালের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এক অখণ্ড মহাপ্রাণে আমাদের

আত্মার শাশ্বত যোগ দেখাইয়া তাঁহাকে চির উন্নত জীবনের আশা প্রদান করিতেছেন, তখন তাঁহাকে আমাদের সমস্ত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দিয়া—নির্ম্মল হৃদয়ের প্রীতি দিয়া তাঁহার উপাসনা করা ব্যতীত আমাদের আর কোন্ কর্ত্তব্য অধিক হইতে পারে? এমন শুভ মুহূর্ত্তই বা কি আছে, যখন তাঁহার বিশেষ করুণা অনুভব করিবার জন্য অন্তঃকরণ এবং জীবাত্মা নূতন চক্ষু লাভ করিয়া জীবনের অশেষ কল্যাণ দেখিতে পায়। এমন পুণ্য মুহূর্ত্তে—শুভক্ষণে আমাদের শত প্রাণ একরাগে সেই মহেশ্বরেরই প্রেমক্রোড়ে উত্থিত হইতেছে। এই পুণ্য পবিত্র মুহূর্ত্ত অবহেলা করিবার নহে, এখন আইস আমরা সকল ভ্রাতৃগণ মিলিয়া তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত হই—তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করিয়া জীবন সার্থক করি।

আচার্য্যের উপদেশ।

মাস পক্ষ ঋতু সম্বৎসর অতীত হইয়া যাইতেছে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম চিরকাল বর্ত্তমান। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে যাঁহারা পরমাত্মাকে জানেন তাঁহারা অমর হ'ন। ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমন আলোকের প্রতি বিরক্ত, অন্ধকারের প্রতি অনুরক্ত; মোহমুগ্ধ ব্যক্তি তেমনি জ্ঞানের প্রতি বিরক্ত, অজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত। জাগ্রত ব্যক্তি যেমন অন্ধকারের প্রতি বিরক্ত, আলোকের প্রতি অনুরক্ত; জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তেমনি অজ্ঞানের প্রতি বিরক্ত, জ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু জ্ঞান কোথা হইতে আসিতেছে? সূর্য্য হইতেই দিবালোক আসিতেছে। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম হইতেই জ্ঞান আসিতেছে। কেহ বলেন না যে পৃথিবী হইতেই দিবালোক আসিতেছে; কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান তাঁহার নিজের আত্মা হইতেই আসিতেছে। আর সেই জন্য পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মতামতের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। অন্ধকারাসক্ত ব্যক্তিরা জ্ঞানের মূল আকরের প্রতি মনের কপাট বন্ধ করিয়া দে'ন। জ্ঞানের অন্ন সত্য; জ্ঞান যখন সত্যের প্রতি দৃষ্টি করে, তখন তাহার আপনার আদি-অন্ত-মধ্য সমস্তের প্রতি তাহার চক্ষু পড়ে, তখন সে দেখিতে পায় যে, সমস্ত ব্যক্তির সমস্ত জ্ঞানের মূল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, সদ্যোজাত শিশুর জ্ঞান অন্তঃপুরের কর্ত্তৃত্বাধীনে অল্পে অল্পে পরিস্ফুটিত হয়; তাহার কিছুকাল পরে বয়স্ক বালকের জ্ঞান বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিস্ফুটিত হয়, এবং তাহার পরে পূর্ণবয়স্ক যুবা ব্যক্তির জ্ঞান সংসারক্ষেত্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিস্ফুটিত হয়; কিন্তু যেখান হইতে যে ব্যক্তির জ্ঞান পরিস্ফুটিত হউক্ না কেন, জ্ঞানের মূল আকর সেই একরত্তি স্থানেই আবদ্ধ নহে—জ্ঞানের মূল আকর একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরমাত্মা। জ্ঞান যখন আপনার সেই মূল আকরে নিবিষ্ট হয়, তখনই তাহা সত্যেতে নিবিষ্ট হয়; সত্যেতে নিবিষ্ট হইয়া সত্যজ্ঞান হয়। এইরূপ সত্যজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞান যদি সত্যতে নিবিষ্ট হইয়া সত্যজ্ঞান না হয়, তবে সেরূপ মিথ্যাজ্ঞানের আর এক নাম ভ্রান্ত সংস্কার; আর এইরূপ ভ্রান্ত-সংস্কার পৃথিবীতে নানা প্রকার বিরোধী মতামতের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া বিবাদবিসম্বাদের মূল পত্তন করিতে থাকে। অতএব যদি প্রকৃত জ্ঞানের প্রয়াসী হও, তবে জ্ঞানের মূল আকর যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতি জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন কর। রজনী প্র-

ভাতে যেমন পক্ষী সকল আলোকে সন্তরণ করে এবং আনন্দে গান করে; আদিম কালের ঋষিরা তেমনি জ্ঞানের প্রভাত-কিরণে প্রাণ পাইয়া গায়ত্রী-মন্ত্র গান করিয়া উঠিয়াছিলেন—আর সেই অবধি গায়ত্রী-মন্ত্র সকল বেদের শিরঃস্থানে অধিকার পাইয়া আসিতেছে। আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে নববর্ষের প্রভাত-কিরণে পরমাত্মার প্রসাদ-জ্যোতি আমাদের প্রতি উন্মুক্ত হইয়াছে—এই সেই গায়ত্রী ধ্যানের মুখ্য সময়।

ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।"

স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ সমস্ত আকাশ আপন মহিমায় একীভূত করিয়া পরমাত্মার জ্ঞান এবং শক্তি বিরাজ করিতেছে! কেবল আমরাই কি এরূপ হতভাগ্য জীব যে, আমরা এই সুমঙ্গল প্রভাতে তাঁহার সেই সুমঙ্গল প্রসাদে বঞ্চিত হইব?

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু।

ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না, আমারে ত্যজেন নাই প্রভু।
তাঁহারে ত্যজিব আমি, এমন না হয় যেন কভু॥

আর্য্যাবর্ত্তের পুরাতন ঋষিরা বলিতেছেন

শুন দিব্যধামবাসী অমৃতের যতেক সন্তান
জানিয়াছি আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহান্
আদিত্য-বরণ, তিমিরের পার! তাঁরে জানিয়াই
মরণ এড়ায় জীব, নিস্তারের অন্য পথ নাই।
আপনাতে ভর ক'রে র'য়েছেন যিনি এই নিত্য,
জানিবারই বস্তু তিনি, যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য॥
ইঁহারে পাইয়া পূজ্য ঋষিগণ জ্ঞান-পরিতৃপ্ত,
প্রশান্ত কৃতার্থমনা বীতরাগ বিষয়-নির্লিপ্ত,
সর্ব্বত দেখিয়া সেই সর্ব্বাধারে, হ'য়ে যোগযুক্ত
প্রবিশেন সর্ব্ব ঘটে জ্ঞান-দ্বার পাইয়া উন্মুক্ত॥
জীবাত্মা বিজ্ঞানময় সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সাথে
জীবজন্তু চরাচর ভর করি রহিয়াছে যাঁতে
সেই অবিনাশী ব্রহ্মে যেই জানে, জানে সব সত্য;
সকলের ভিতরে প্রবেশ করে, লভে অমরত্ব॥
তেজোময় পুরুষ অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ মহান্,
তিনিই আকাশে এই—তিনিই আত্মাতে বিদ্যমান॥
তাঁরেই জানিয়া ধীর মরণ এড়ায়।
নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপায়॥

হে পরমাত্মন্, আজ এই নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা সবান্ধবে তোমার প্রসাদের ভিখারী হইয়া তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি; তুমি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আমাদিগকে জ্ঞান সত্য এবং অমরত্ব বিতরণ কর; তুমি আনন্দরূপমমৃতং আমাদিগকে প্রেম ভক্তি এবং অমৃত আনন্দ বিতরণ কর; তুমি শান্তং শিবমদ্বৈতং আমাদিগকে শান্তি কল্যাণ এবং একনিষ্ঠা বিতরণ কর। তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা। নববর্ষের প্রারম্ভে তোমার প্রসাদ-বারিতে আমাদের আত্মাকে ধৌত কর, এবং তোমার প্রীতি ভক্তি উদ্দীপন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণের প্রথম প্রীতি-পুষ্প এবং প্রথম মঙ্গল ফল গ্রহণ কর; আমরা সকলে তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি; এই বরাভয় বিতরণ কর—যেন বৎসর বৎসর তোমার প্রতি দৃঢ় ভক্তি এবং দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া এবং তোমার অভিপ্রেত কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া অকুতোভয়ে সংসার-সাগর পার হই, এবং অন্ত দিনে তোমার ক্রোড়ে উপনীত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ।

পুরাতন বর্ষের সূর্য্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে নিঃশব্দে অস্তমিত হইল। যে কয়বৎসর পৃথিবীতে কাটাইলাম অদ্য তাহারই বিদায় যাত্রার নিঃশব্দ পক্ষধ্বনি এই নির্ব্বাণালোক নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি। সে অজ্ঞাত সমুদ্র-পারগামী পক্ষীর মত কোথায় চলিয়া গেল তাহার আর কোন চিহ্ন নাই।

হে চিরদিনের চিরন্তন! অতীত জীবনকে এই যে আজ বিদায় দিতেছি এই বিদায়কে তুমি সার্থক কর—আশ্বাস দাও যে, যাহা নষ্ট হইল বলিয়া শোক করিতেছি তাহার সকলি যথাকালে তোমার মধ্যে সফল হইতেছে। আজি যে প্রশান্ত বিষাদ সমস্ত সন্ধ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়কে আবৃত করিতেছে, তাহা সুন্দর হউক্ মধুময় হউক্, তাহার মধ্যে অবসাদের ছায়া মাত্র না পড়ুক্! আজ বর্ষাবসানের অবসান দিনে বিগত জীবনের উদ্দেশে আমাদের ঋষি পিতামহদিগের আনন্দময় মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ করি :—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাংঅস্তু সূর্য্যঃ! ওঁ,

বায়ু মধু বহন করিতেছে! নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করিতেছে! ওষধী বনস্পতি সকল মধুময় হউক্! রাত্রি মধু হউক্, উষা মধু হউক্, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হউক্, সূর্য্য মধুমান্ হউক্!

রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লি-ঝঙ্কারসুপ্ত অন্ধকারের মত হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শূন্যতা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়!

যে বিষাদ ধ্যানের পূর্ব্বাভাস, যে শান্তি মঙ্গল কর্ম্মনিষ্ঠার জননী, যে বৈরাগ্য উদার প্রেমের অবলম্বন, যে নির্ম্মল শোক তোমার নিকটে আত্মসমর্পণের মন্ত্রগুরু তাহাই আজিকার আসন্ন রজনীর অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে সন্ধ্যাদীপোজ্জ্বল গৃহপ্রত্যাগত শ্রান্ত বালকের মত অঞ্চলের মধ্যে আবৃত করিয়া লউক্।

পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে এবং যাইতেছে—কিছুই স্থির নহে, সকলই চঞ্চল—বর্ষশেষের সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহা আছে, যাহা চিরকাল স্থির থাকে, যাহাকে কেহই হরণ করিতে পারে না, যাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে বিরাজমান—গত বর্ষে সেই ধ্রুবের কি কোন পরিচয় পাই নাই—জীবনে কি তাহার কোন লক্ষণ চিহ্নিত হয় নাই? সকলই কি কেবল আসিয়াছে এবং গিয়াছে? আজ স্তব্ধ ভাবে ধ্যান করিয়া বলিতেছি তাহা নহে—যাহা আসিয়াছে এবং যাহা গিয়াছে তাহার কোথাও যাইবার সাধ্য নাই, হে নিস্তব্ধ, তাহা তোমার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। যে তারা নিবিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে নিবে নাই, যে পুষ্প ঝরিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে বিকশিত—আমি যাহার লয় দেখিতেছি তোমার নিকট হইতে তাহা কোন কালেই চ্যুত হইতে পারে না। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে শান্ত হইয়া তোমার মধ্যে নিখিলের সেই স্থিরত্ব অনুভব করি। বিশ্বের প্রতীয়মান চঞ্চলতাকে, অবসানকে, বিচ্ছেদকে আজ একেবারে ভুলিয়া যাই! গত বৎসর যদি তাহার উড্ডীন পক্ষপুটে আমাদের কোন প্রিয়জনকে হরণ করিয়া যায় তবে হে পরিণামের আশ্রয়, করযোড়ে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমারই প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলাম। জীবনে যে তোমার ছিল মৃত্যুতেও

সে তোমারি। আমি তাহার সহিত আমার বলিয়া যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা ক্ষণকালের - তাহা ছিন্ন হইয়াছে। আজ তোমারই মধ্যে তাহার সহিত যে সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছি তাহার আর বিচ্ছেদ নাই। সেও তোমার ক্রোড়ে আছে আমিও তোমার ক্রোড়ে রহিয়াছি। অসীম জগদরণ্যের মধ্যে আমিও হারাই না, সেও হারায় নাই,— তোমার মধ্যে অতি নিকটে অতি নিকটতম স্থানে তাহার সাড়া পাইতেছি।

বিগত বৎসর যদি আমার কোন চিরপালিত অপূর্ণ আশাকে শাখাচ্ছিন্ন করিয়া থাকে তবে, হে পরিপূর্ণস্বরূপ, অদ্য নতমস্তকে একান্ত ধৈর্য্যের সহিত তাহাকে তোমার নিকটে সমর্পণ করিয়া ক্ষত-উদ্যমে পুনরায় বারিসেচন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তুমি আমাকে পরাভূত হইতে দিয়ো না। একদিন তোমার অভাবনীয় কৃপাবলে আমার অসিদ্ধ সাধন গুলিকে অপূর্ব্ব ভাবে সম্পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে সহসা আমার ললাটে স্থাপন পূর্ব্বক আমাকে বিস্মিত ও চরিতার্থ করিবে এই আশাই আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম।

যে কোন ক্ষতি, যে কোন অন্যায়, যে কোন অবমাননা বিগত বৎসর আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকুক্, কার্য্যে যে কোন বাধা, প্রণয়ে যে কোনও আঘাত, লোকের নিকট হইতে যে কোন প্রতিকূলতা দ্বারা আমাকে পীড়ন করিয়া থাক্—তবু তাহাকে আমার মস্তকের উপরে তোমারই আশীষ হস্তস্পর্শ বলিয়া অদ্য তাহাকে প্রণাম করিতেছি। গত বৎসরের প্রথম দিন নীরব স্মিতমুখে তাহার বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমার জন্য কি লইয়া আসিয়াছিল সে দিন তাহা আমাকে জানায় নাই—আমাকে কি যে দান করিল আজ তাহাও আমাকে বলিয়া গেল না, মুখ আবৃত করিয়া নিঃশব্দ পদে চলিয়া গেল। দিনে রাত্রিতে আলোকে অন্ধকারে তাহার সুখ দুঃখের দূত গুলি আমার হৃদয়গুহাতলে কি সঞ্চিত করিয়া গেল সে সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রম আছে, আমি নিশ্চয় কিছুই জানি না,—একদিন তোমার আদেশে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে যাহা দেখিব তাহার জন্য আগে হইতেই অদ্য সন্ধ্যায় বর্ষাবসানকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া কৃতজ্ঞতার বিদায় সম্ভাষণ জানাইতেছি!

এই বর্ষশেষের শুভ সন্ধ্যায় হে নাথ, তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করি! আগামী বর্ষে যেন ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করি, বীর্য্যের সহিত কর্ম্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করি!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ।

যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি, দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনি কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবেষ্টিত তৃণধান্যশ্যামল ধরণীতলে

তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম— তুমি আনন্দিত হও, তুমি বল লাভ কর।

প্রান্তরের মধ্যে পুণ্যনিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্ম্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে স্থান দিয়াছেন তাহা আজ আমরা নবগৌরবে অনুভব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য! এই যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য! এই যে গীতগন্ধবর্ণস্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে আমরা ধন্য! অদ্যকার প্রভাতে এই যে জ্যোতির্ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে তোমার অমৃত আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব;—এই যে বৃষ্টিধৌত বিশাল পৃথিবীর বিস্তীর্ণ শ্যামলতা ইহার মধ্যে তোমার অমৃত ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব, এই যে নিশ্চল মহাকাশ আমাদের মস্তকের উপর তাহার স্থির হস্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমারই অমৃতভারে নিস্তব্ধ তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব।

এই মহিমান্বিত জগতে অদ্যকার নববর্ষ দিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, এই আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আকাশতলে আসীন হইবার গৌরব তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই! তবে সেই ঋষিবাক্য বুঝিতে পারি

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত কেই বা প্রাণধারণ করিত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন! আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত তাই সূর্য্যলোকের বিরাট্ যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত তাই পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে, তিনি আনন্দিত তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত তাই আমি আছি—তাই আমি গ্রহ তারকার সহিত লোকলোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—তাঁহার আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্য্যাদা।

তাঁহার প্রতি নিমেষের ইচ্ছাই আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের অস্তিত্ব, আজ নববর্ষের দিনে এই কথা যদি উপলব্ধি করি—আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীর ভাবে অন্তরে উপভোগ করি—তবে সংসারের কোন বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর মনে করিয়া অভিভূত হইব না—কারণ, ঘটনাবলী তাহার সুখ দুঃখ বিরহ মিলন লাভ ক্ষতি জন্ম মৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কত দিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য! এই রহস্য ভেদ না করিতে পারি

নাই পারিলাম—আমাদের বোধ-শক্তিতে এই শাশ্বত আনন্দ এত বিপরীত আকারে এত বিবিধভাবে কেন প্রতীয়মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম—কিন্তু ইহা যদি নিশ্চয় জানি এক মুহূর্ত্ত সর্ব্বত্র সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়—যদি জানি,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তবে আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন

নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোন অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

স্বার্থের জড়তা এবং পাপের আবর্ত্ত ব্রহ্মের এই নিত্যবিরাজমান আনন্দের অনুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তখন সহস্র রাজা আমাদের নিকট হইতে করগ্রহণে উদ্যত হয়, সহস্র প্রভু আমাদিগকে সহস্র কাজে চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান করে। তখন যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বড় হইয়া উঠে—তখন সকল বিরহই ব্যাকুল, সকল বিপদই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে—সকলকেই চূড়ান্ত বলিয়া ভ্রম হয়। লোভের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই মনে হয় তাহাকে না পাইলে নয়, বাসনার বিষয় উপস্থিত হইলেই মনে হয় ইহাকে পাইলেই আমার চরম সার্থকতা। ক্ষুদ্রতার এই সকল অবিশ্রাম ক্ষোভে ভূমা আমাদের নিকটে অগোচর হইয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদিগকে প্রতিপদে অপমানিত করিয়া যায়।

সেই জন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে,

অসতোমা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও;—প্রতি নিমেষের খণ্ডতা হইতে তোমার অনন্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাকে উপনীত কর;—অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও;—অহঙ্কারের যে অন্তরাল, বিশ্বজগৎ আমার সম্মুখে যে স্বাতন্ত্র্য লইয়া দাঁড়ায়, আমাকে এবং জগৎকে তোমার ভিতর দিয়া না দেখিবার যে অন্ধকার তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও,—আমার প্রবৃত্তি আমাকে মৃত্যুদোলায় চড়াইয়া দোল দিতেছে, মুহূর্ত্তকাল অবসর দিতেছে না; আমার মধ্যে আমার ইচ্ছাগুলাকে খর্ব্ব করিয়া আমার মধ্যে তোমার আনন্দকে প্রকাশমান কর, সেই আনন্দই অমৃত লোক।

আজিকার নববর্ষ দিনে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি! বলিতেছি—আবিরাবীর্ম্মএধি! হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও! অন্তরে বাহিরে তুমি উদ্ভাসিত হইলেই, প্রবৃত্তির দাসত্ব, জগতের দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়—তখন তোমার মধ্যে সমস্ত দেশকালের একটি অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য একটি পরিপূর্ণ সমাপ্তি দেখিয়া সুগভীর শান্তির মধ্যে আমরা নিমগ্ন ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই। তখন, যে চেষ্টাহীন বলে সমস্ত জগৎ সহজে বিধৃত তাহা আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যে চেষ্টাহীন সৌন্দর্য্যে নিখিল ভুবন পরস্পর গ্রথিত তাহা আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। তখন আমি যে তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি এ কথা মনে থাকে না—তোমার সমস্ত জগতের এক সঙ্গে তুমিই আমাকে লইতেছ এই কথাই আমার মনে হয়।

সেই স্বপ্রকাশ যত দিন না আমাদের

নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন তত দিন যেন নিজের ভিতর হইতে তাঁহার দিকে বাহির হইবার একটা দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সেই পথ দিয়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া আসিতে পারি। আমাদের জীবনের একটা দিনের সহিত আর একটা দিনের যে বন্ধন সে যেন শুধু স্বার্থের বন্ধন না হয়, জড় অভ্যাসসূত্রের বন্ধন না হয়—একটা বৎসরের সহিত আর একটা বৎসরকে যেন প্রাত্যহিক নিবেদনের দ্বারা তাঁহারই সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি। এমন কোন সূত্রে যেন মানবজীবনের দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলিকে না বাঁধিতে থাকি যাহা মৃত্যুর স্পর্শমাত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়! জীবনের যে বৎসরটা গেছে তাহা পূজার পদ্মের ন্যায় তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই—তাহার তিন শত পঁয়ষট্টি দল দিনে দিনে ছিন্ন করিয়া লইয়া পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি। অদ্য বৎসরের অনুদ্‌ঘাটিত প্রথম মুকুল সূর্য্যের আলোকে মাথা তুলিয়াছে ইহাকে আমরা খণ্ডিত করিব না, সৌন্দর্য্যে, সৌগন্ধ্যে, শুভ্রতায় ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব। তাহা কখনই অসাধ্য নহে—সে শক্তি আমাদের মধ্যে আছে—নাত্মানমবমন্যেত—নিজেকে অপমান অবজ্ঞা করিয়ো না!

ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা।

আপনাকে যে ব্যক্তি দীন বলিয়া অবমান করে তাহার কখনুই শোভন ঐশ্বর্য্য লাভ হয় না।

ধর্ম্মের যে আদর্শ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যে আদর্শে ব্রহ্মের জ্যোতি বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা কল্পনাগম্য অসাধ্য নহে, তাহা রক্ষা করিবার তেজ আমাদের মধ্যে আছে;—নিজেকে জাগ্রত রাখিবার শক্তি আমাদের আছে;—এবং জাগ্রত থাকিলে অন্যায় অসত্য হিংসা ঈর্ষা প্রলোভন দ্বারের নিকটে আসিয়া দূরে চলিয়া যায়। আমরা ভয় ত্যাগ করিতে পারি, হীনতা পরিহার করিতে পারি, আমরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি—এ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। কেবল দীনতায় সেই শক্তিকে অবিশ্বাস করি বলিয়া তাহাকে ব্যবহার করিতে পারি না। সেই শক্তি আমাদিগকে কি ভূমানন্দে কি চরম সার্থকতায় লইয়া যাইতে পারে তাহা জানি না বলিয়াই আত্মার সেই শক্তিকে আমরা স্বার্থে এবং ব্যর্থ চেষ্টায় এবং পাপের আয়োজনে নিযুক্ত করি। মনে করি অর্থ লাভেই আমাদের চরম সুখ, বাসনাতৃপ্তিতেই আমাদের পরমানন্দ, ইচ্ছার বাধা মোচনেই আমাদের পরম মুক্তি। আমাদের যে শক্তি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাকে একাগ্রধারায় ব্রহ্মের দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জীবনের কর্ম্ম সহজ হয়, সুখ দুঃখ সহজ হয়, মৃত্যু সহজ হয়। সেই শক্তি আমাদিগকে বর্ষার স্রোতের মত অনায়াসেই বহন করিয়া লইয়া যায়; দুঃখ শোক, বিপদ আপদ, বাধা বিঘ্ন, তাহার পথের সম্মুখে শরবনের মত মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পুনর্ব্বার বলিতেছি, এই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে; কেবল, চারিদিকে ছড়াইয়া আছে বলিয়াই তাহার উপর নিজের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া গতিলাভ করিতে পারি না। নিজেকে প্রত্যহ নিজেই বহন করিতে হয়। প্রত্যেক কাজ আমাদের স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়ে; প্রত্যেক কাজের আশা নৈরাশ্য লাভ ক্ষতির সমস্ত ঋণ নিজেকে শেষ কড়া পর্য্যন্ত শোধ করিতে হয়। স্রোতের উপর যেমন মাঝির নৌকা

থাকে এবং নৌকার উপরেই তাহার সমস্ত বোঝা থাকে তেমনি ব্রহ্মের প্রতি যাঁহার চিত্ত একাগ্রভাবে ধাবমান, তাঁহার সমস্ত সংসার এই পরিপূর্ণ ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায় এবং কোন বোঝা তাঁহার স্কন্ধকে পীড়িত করে না।

নববর্ষের প্রাতঃসূর্য্যালোকে দাঁড়াইয়া অদ্য আমাদের হৃদয়কে চারিদিক হইতে আহ্বান করি!—ভারতবর্ষের যে পৈতৃক মঙ্গল শঙ্খ গৃহের প্রান্তে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে সমস্ত প্রাণের নিশ্বাস তাহাতে পরিপূর্ণ করি—সেই মধুর গম্ভীর শঙ্খধ্বনি শুনিলে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত অহঙ্কার হইতে স্বার্থ হইতে বিলাস হইতে প্রলোভন হইতে ছুটিয়া আসিবে। আজ শতধারা একধারা হইয়া গোমুখীর মুখনিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইবে—তাহা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রান্তরশায়ী এই নির্জ্জন তীর্থ যথার্থই হরিদ্বার তীর্থ হইয়া উঠিবে।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, অদ্য নববর্ষের প্রভাতে তোমার জ্যোতিঃস্নাত তরুণ সূর্য্য পুরোহিত হইয়া নিঃশব্দে আমাদের আলোকের অভিষেক সম্পন্ন করিল। আমাদের ললাটে আলোক স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের দুই চক্ষু আলোকে ধৌত হইয়াছে। আমাদের পথ আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। আমাদের সদ্যোজাগ্রত হৃদয় ব্রতগ্রহণের জন্য তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে শরীরকে অদ্য তোমার সমীরণ স্পর্শ করিল তাহাকে যেন প্রতিদিন পবিত্র রাখিয়া তোমার কর্ম্মে নিযুক্ত করি! যে মস্তকে তোমার প্রভাতকিরণ বর্ষিত হইল সে মস্তককে ভয় লজ্জা ও হীনতার অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া তোমারই পূজায় প্রণত করি! তোমার নামগানধারা আজ প্রত্যূষে যে হৃদয়কে পুণ্যবারিতে স্নান করাইল, সে যেন আনন্দে পাপকে পরিহার করিতে পারে, আনন্দে তোমার কল্যাণ কর্ম্মে জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারে, আনন্দে দারিদ্র্যকে ভূষণ করিতে পারে, আনন্দে দুঃখকে মহীয়ান্ করিতে পারে, এবং আনন্দে মৃত্যুকে অমৃতরূপে বরণ করিতে পারে। আজিকার প্রভাতকে কালি যেন বিস্মৃত না হই! প্রতিদিনের প্রাতঃসূর্য্য যেন আমাদিগকে লজ্জিত না দেখে; তাহার নির্ম্মল আলোক আমাদের নির্ম্মলতার, তাহার তেজ আমাদের তেজের সাক্ষী হইয়া যায়—এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে আমাদের প্রত্যেক দিনটিকে নির্ম্মল অর্ঘ্যের ন্যায় তাহার রক্তিম স্বর্ণথালীতে বহন করিয়া তোমার সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারে। হে পিতা, আমার মধ্যে নিয়ত কাল তোমার যে আনন্দ স্তব্ধ হইয়া আছে, যে আনন্দে তুমি আমাকে নিমেষকালও পরিত্যাগ কর নাই, যে আনন্দে তুমি আমাকে জগতে জগতে রক্ষা করিতেছ, যে আনন্দে সূর্য্যোদয় প্রতিদিনই আমার নিকটে অপূর্ব্ব, সূর্য্যাস্ত প্রতিসন্ধ্যায় আমার নিকট রমণীয়, যে আনন্দে অজ্ঞাত ভুবন আমার আত্মীয়, অগণ্য নক্ষত্র আমার সুপ্তরাত্রির মণিমাল্য, যে আনন্দে জন্মমাত্রেই আমি বহুলোকের প্রিয় পরিচিত, সমস্ত অতীত মানবের মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকারী, যে আনন্দে দুঃখ নৈরাশ্য বিপদ মৃত্যু কিছুই লেশমাত্র নিরর্থক নহে,—আমি যেন প্রবৃত্তির ক্ষোভে পাপের লজ্জায় আমার মধ্যে তোমার সেই আনন্দ-মন্দিরের দ্বার নিজের নিকটে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া পথের পঙ্কে যদৃচ্ছা লুণ্ঠিত হওয়াকেই আমার সুখ আমার স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম না করি! জগৎ তোমার জগৎ, আলোক তোমার আলোক, প্রাণ তোমার নিঃশ্বাস, এই কথা স্ম-

রণে রাখিয়া জীবনধারণের যে পরম পবিত্র গৌরব তাহার অধিকারী হই, অস্তিত্বের যে অপার অজ্ঞেয় রহস্য তাহা বহন করিবার উপযুক্ত হই—এবং প্রতিদিন তোমাকে এই বলিয়া ধ্যান করি ঃ—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

বিশ্বসবিতা এই সমস্ত ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন—তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন—তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি—তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্ম প্রাচীন ও নবীন।

প্রথম প্রস্তাব।

অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রায় সকল দেশেই ধর্ম্মভাব কোন না কোন ভাবে বিরাজমান। যে সকল স্থানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে, তথায় ঈশ্বরতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের সাধনপ্রকরণ যেরূপ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়াছে, অসভ্যসমাজ বা অতীব প্রাচীন কালে সেরূপ হইতে পারে না বা তাহার আশাও করা যাইতে পারে না। সেই জন্য বিবিধ দেশের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা ধর্ম্মভাবের উন্মেষ যে কিরূপে ও কি ভাবে হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে কিরূপে যে তাহা পরিস্ফুটতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে আমরা চেষ্টা পাইব। মনুষ্যের বুদ্ধি ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণে যে অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছে এবং জগতের বৈচিত্র এই রাজ্যে মনুষ্যের প্রতিভা-বিকাশে যে অসামান্য সাহায্য দান করিয়া আসিয়াছে, তাহাও ইহাতে সর্কলের হৃদগত হইবে। দেশবিদেশ-প্রচলিত ধর্ম্মে আমাদের চক্ষে যতই কেন স্বাতন্ত্রের চিহ্ন অনুভূত হউক না, বিকাশোন্মুখ অনৈতিহাসিক যুগে যে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল তাহাও সহজে বোধগম্য হইবে।

ধর্ম্ম মাত্রেই বিকাশোন্মুখ, একথা আমাদের স্মরণ রাখা চাই। বিজ্ঞান সাহিত্য যেরূপ উন্নতিশীল, অনুকূল অবস্থা পাইলে তাহারা যেমন ক্রমশই উন্নতি লাভ করে, ধর্ম্মবিজ্ঞানও সেইরূপ। যে দেশের ধর্ম্ম চির-নির্দ্দিষ্ট বাইবেল কোরাণে আবদ্ধ, স্বাধীন চিন্তা তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করে নাই। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ইহারই অন্যতম প্রমাণ। রোমান ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট, ডিসেণ্টার ইহাদিগের মধ্যে যে কেবল সম্প্রদায়গত বিচ্ছিন্ন ভাব তাহা নহে, চিন্তা ও সাধনাগত পার্থক্যও আছে। কালবশে নূতন চিন্তার উন্মেষ হইতেছে আরও হইবে। সিয়া সুন্নি প্রভৃতি নানাসম্প্রদায় মুসলমান-সমাজে থাকিলেও চিন্তারাজ্যে সূফি প্রভৃতি অনেকানেক উচ্চ অঙ্গের শ্রেণী দৃষ্ট হয়। আমাদের হিন্দু সমাজের ভিতরেও পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে যে চিন্তাস্রোত বহমান ছিল তাহারও কতকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। খাঁটি তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের ও সাধনের স্থলে রূপক-বাদ দয়ানন্দবাদ ব্রহ্মজ্ঞানবাদ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। আজ কালকার দিনে প্রতিমাপূজার অনুকূলে সাবেক যুক্তি বড় আর শুনিতে পাওয়া যায় না। বাল্যকালে আমরা শুনিতাম যেমন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে

তাঁহার কর্ম্মচারীগণের অনুগ্রহ সর্ব্বাগ্রে ভিক্ষা করিতে হয়, পরে তাঁহাদের কৃপা হইলে রাজার সাক্ষাৎকার ঘটে, তেমনি পুরাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি বিবিধ দেবের উপাসনা না করিলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ঘটা অসম্ভব, কেন না তাঁহারা ঈশ্বরের পথের দ্বারী। তাঁহারা প্রসন্ন হইলে তবে তাঁহারা ঈশ্বর সমীপে লইয়া যান। আজকালকার দিনে তাঁহারা পূর্ব্ব কথা পরিত্যাগ করিয়া কেহ বা বলেন পুরাণ তন্ত্র আর কিছুই নহে, রূপক মাত্র! কেহ বা ইন্দ্র বরুণের ধাত্বর্থ দেখাইয়া ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন। কেহবা বা বৌদ্ধ-বিপ্লবের দোহাই দিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মের সাময়িক উপযোগিতা দেখান। কেহ বা জ্ঞানোন্নত প্রাচীন উপনিষদ ধর্ম্মকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করাইবার চেষ্টা পান। অবশ্য এ দেশে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অকস্মাৎ উন্মীলনে এবং প্রাচীনত্ব ও নবীনত্বের ঘাত-প্রতিঘাতে যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে তাহা উপশান্ত হইলে যে কিরূপ স্থৈর্য্য ও প্রশান্তভাব আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে ধর্ম্মরাজ্যে ভবিষ্যতে সত্যই যে জয়যুক্ত হইবে তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত।

প্রথমে আমাদের নিরূপণ করিতে হইবে অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্ম বলিলে কি বুঝাইত এবং ধর্ম্মের অঙ্কুর কি ভাবে মনুষ্যের অন্তরে প্রথম অঙ্কুরিত হইল। কেহ বলেন আদিম মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বা[illegible]ক ক্ষমতাবান পদার্থ বা মনুষ্যের পূজা হইতে ধর্ম্মের আরম্ভ। কেহ বা বলেন সকল ধর্ম্মের মূলভিত্তি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধির পক্ষে কারণ নিরূপণ সহজ নয়। কেহ বা বলেন অসীম অনন্তের অস্তিত্বে বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক ও উহা মানব বুদ্ধির আয়ত্তাধীন, উহা যুক্তি বা বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কেহ বা বলেন বিস্ময় হইতে ধর্ম্মের সূচনা। মনুষ্যের মন স্বভাবতই কারণানুসন্ধান করিতে যায় এবং আপনা হইতে প্রথম কারণকে অন্বেষণ করে। মনের এই যে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, ধর্ম্মই তাহার নামান্তর। কেহ বা বলেন অভাবই প্রার্থনার মূল এবং অনির্দ্দেশ্য শক্তির নিকট যে ভিক্ষা তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু সেই অনির্দ্দেশ্য শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও প্রার্থনা ধর্ম্মের তাবৎ নহে যতক্ষণ না ভক্তি তাহাদের সহিত মিলিত হয়। তাহা হইলেই মোটামুটি দাঁড়াইতেছে, ধর্ম্মের তিনটি অঙ্গ, প্রথম শক্তি বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, দ্বিতীয় তাঁহার নিকট ভিক্ষা, তৃতীয় তাঁহাতে প্রীতির্ভক্তি।

কিন্তু মনুষ্য তাই বলিয়া সেই শক্তি বা শক্তিমানের উপাসনা করিতে যায় না, যিনি তাহার অভাব দূরীকরণে অন্য কথায় অমঙ্গল নিরাকরণে অসমর্থ। মনুষ্য যখন দেখে যে সে নিজে অভাব মোচন করিতে অপারগ, তখন সে সেই ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি করে, যিনি তাহার ভালমন্দ সবই করিতে পারেন। মনুষ্যের জীবন যদি একভাবে সুখে শান্তিতে চলিয়া যাইত, যদি সে নিজে তাহার অভাব মোচন করিতে পারিত, তাহা হইলে হয় ত তাহার ধর্ম্মের আবশ্যক হইত না। কিন্তু মনুষ্যের জীবন সুখদুঃখের। নিজ চেষ্টায় সে সকল সময়ে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না, বা বিপদের করাল-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। অভাব ও আশঙ্কার ভিতরে কোথা হইতে যেন ধর্ম্মভাব অন্তরে সহসা জাগ্রত হইয়া তাহাকে বলিয়া দেয় যে এমন এক উচ্চতর মহত্তর শক্তি বাহিরে রহিয়াছেন, যিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে রক্ষা করিতে ও সকলপ্রকার অভাব বিমোচন করিতে পারেন; শক্তিমানের প্রতি মনের এই যে

আবেগ তাহাই ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা। কিন্তু এই অবস্থা ঠিক স্বার্থপরতা-প্রসূত নহে। দুই বন্ধুর মধ্যে যে ভাব, পিতাপুত্রের মধ্যে যে ভাব, অর্থাৎ সখ্য ও নির্ভরের ভাব, উহাতেই তাহাই অন্তর্নিবিষ্ট। এই সখ্য যতই বৃদ্ধি পাইয়া গাঢ় হইয়া আইসে ধর্ম্ম-ভাব ততই স্বচ্ছ ও সতেজ ভাব ধারণ করিতে থাকে।

তাহা হইলেই দাঁড়াইতেছে অভাব হইতে প্রার্থনার সূচনা এবং প্রার্থনার বিষয়ের উৎকর্ষ অনুসারে—(সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার বিষয়ের উৎকর্ষতা স্বাভাবিক বলিয়া) কালবশে ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। ক্রমে ধর্ম্মের ভিতরে পদ্ধতি স্থান সময় স্তব-স্তুতির পারিপাট্য পবিত্রতা প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মকে ক্রমিকই পরিণত করিয়া তোলে। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় দেশের ভিতরে যতই সভ্যতার বিস্তার হইতে থাকে, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সাধন ও প্রার্থনার ভাব সুন্দর ও পবিত্র হইতে থাকে। তবে যে কখন কখন সভ্যতা ধর্ম্মকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজে অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়ায়, সভ্যতাবিরুদ্ধ বিজ্ঞান ও হৃদয়-বিরুদ্ধ কার্য্যসকল জ্ঞানের দীপ্তালোকে ও ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হয় তাহার কারণ অন্যরূপ। মনুষ্যেরা বংশানুগত প্রচলিত ধর্ম্মকে অমূল্য রত্নের ন্যায় কণ্ঠের হার করিয়া ধারণ করে, উহার উপরে তাহার এতই অপরিসীম স্নেহ যে প্রাণ ধরিয়া তাহাকে ছাড়িতে পারে না, জ্ঞানের দিক দিয়া প্রচলিত ধর্ম্মের মলিনতা ও কদর্য্যভাব প্রতিভাত হইলেও সে তাহা দেখিয়াও দেখিতে চায় না! বিকলাঙ্গ মলিন পুত্রের প্রতি মাতাপিতার অপরিমেয় স্নেহ মমতার ন্যায় সে গাঢ় অনুরাগের সহিত তাহাকে নিরীক্ষণ করে। সময় বহিয়া যায়, যুক্তি বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি সে নিশ্চল। সে হয়ত নিজপোষিত ধর্ম্মের বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বাণী গোপন করিবে, আভ্যন্তরিক মলিন অংশ চাপা দিবে, রূপকার্থ টানিয়া আনিয়া বিবৃত করিবে, অর্থ-হীন অংশে শাস্ত্রকারগণের সুগভীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির বা সুমহান লক্ষ্যের কল্পনা করিবে, জ্ঞান বিজ্ঞানের টানে সভ্যতার স্রোতে অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে কিন্তু মমতাপোষিত অস্থিমজ্জার সহিত বিজড়িত কুলক্রমাগত প্রাচীনধর্ম্ম বিজ্ঞান ও নীতিবিরুদ্ধ হইলেও সে তাহাকে সহজে পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু সত্যের অপরিহার্য্য বলে অল্প বা অধিক বিলম্বে তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছায়াপাত ধর্ম্মের উপরে শীঘ্র বা বিলম্বে নিপতিত হইবেই হইবে। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম সভ্যতার নিতান্তই অন্তরঙ্গ, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় প্রকৃতির ছায়া এই ধর্ম্মতেই প্রতিফলিত। যদি কোন দেশের কোন কালের লৌকিক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বুঝিতে চাও, সেই দেশের সেই সময়ের ধর্ম্মপুস্তক উদ্‌ঘাটন কর উহারই মধ্যে তাহার সন্ধান মিলিবে। এক কথায় দেশ বিদেশের জাতীয় ইতিহাস পাঠের ফল তত্তদ্দেশীয় ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের মধ্যেই সুপ্রাপ্য, সভ্যতার ইতিহাস উহারই অন্তর্নিবিষ্ট। এই সকল কারণে বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ, যাহা আমরা আলোচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা নিতান্ত [illegible]ফল না হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৬৫৵০
পূর্ব্বকায় স্থিত	...	৫৭৯।০
সমষ্টি	...	৯৪৪।৵০
ব্যয়	...	৩৮৫।৴৬
স্থিত	...	৫৫৮৸৶৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৫৮৸৶৬

৫৫৮৸৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১৯০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১২।৵০

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়, কলিকাতা
২৲

" " হরিমোহন রায়, ঐ
৩৲

" " মতিলাল পাল, ঐ
১৲

শ্রীযুক্ত " চন্দ্রশেখর বসু, দ্বারভাঙ্গা
৩।৵০

" " দ্বারকানাথ নন্দী, বানাইন
৩৲

১২।৵০

পুস্তকালয়	...	১৬৸৶০
যন্ত্রালয়	...	১৪১৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৪৸০
সমষ্টি		৩৬৫৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৫৪৸৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		৬৩।৴৬
যন্ত্রালয়	...	৬৬৸৵০
সমষ্টি		৩৮৫।৴৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের আদেশানুসারে কর্ম্মচারী নিয়োগ।

১৮২৪ শক ১ বৈশাখ হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিম্নোক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

যন্ত্রালয় ও পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল।
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ট্রষ্টীগণ।

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्

सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया

पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ১ আষাঢ় রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাশুল।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

৭০৭ সংখ্যা | ১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব।

এই উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মসাধারণ তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে সমাগত হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রহ্মোপাসনা করিয়া যে বক্তৃতা পাঠ করেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের নির্দ্দেশে পূজ্যপাদ পিতৃদেব অদ্য ৮৬ বৎসরে উপনীত হইলেন। তাঁহার জীবনের মহৎ আদর্শ যাহা এ যাবৎকাল আমাদের উপরে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহার ফল যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু আমাদের মধ্যে ফলিয়াছে এবং ফলিতেছে, তাহাতেই আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। তদ্ব্যতীত, তাহার ফল যাহা আমাদের মধ্যে ফলিতে পারে নাই বা পারিতেছে না তাহা যে কেন ফলিতে পারে নাই এবং পারিতেছে না, তাহারও আমরা কারণ দেখিতে পাইতেছি। সে কারণ লোক-সমাজের আপাত-রমণীয় বিপরীত আদর্শ। পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জীবনের আদর্শ যে কি, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মে দুই কথায় বলিয়া দেওয়া আছে। কি? না

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

গৃহী ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন, তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন, এবং যে যে কর্ম্ম করেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। এই আদর্শের কল্যাণ-চ্ছায়ায় "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং" ব্রহ্মের সর্ব্বসন্তাপহারী নামধ্বনির মধ্যে এত কাল যে আমরা বাস করিয়া আসিয়াছি, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ফল যাহা কিছু আমাদের মধ্যে ফলিয়াছে তাহাতেই আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। যে আদর্শের কথা বলিলাম—যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মে দুই কথায় বলিয়া দেওয়া আছে এবং পূজ্যপাদ পিতৃদেবের ঈশ্বর-প্রাণিত জীবন যাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—সে আদর্শ অতীব সুদুর্লভ। বর্ত্তমান সময়ে আমরা এক মহাবিপত্তি-সঙ্কুল দুর্দ্দশাপন্ন ভয়াবহ সমাজের মধ্যে বাস করিতেছি;—এক্ষণকার লোক-সমাজের আদর্শ ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিপ্রেত উপরি-উক্ত আদর্শের অবিকল বিপরীত। সে আদর্শ এই যে, গৃহী ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন না, সংসারনিষ্ঠ হইবেন; তত্ত্বজ্ঞান-

পরায়ণ হইবেন না—অবিদ্যা-পরায়ণ হইবেন; এবং যে যে কর্ম্ম করেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন না—আত্মগৌরবের উদ্দেশে সমর্পণ করিবেন। বর্ত্তমান কালের লোক-সমাজের এই যে এক বিপরীত আদর্শ, এ আদর্শ যে আমাদের উপরে কার্য্য করে নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই বিপরীত আদর্শের কুহকে মুগ্ধ হইয়া আমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ না হইয়া স্বার্থ-নিষ্ঠ হইয়াছি; তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ-ধারিণী মায়াবিনী নাস্তিক্য বুদ্ধিকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়াছি; এবং ব্রহ্মেতে কর্ম্ম সমর্পণ করা অকর্ত্তব্য বোধে সকল কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব আপনাতে পুঞ্জীভূত করিয়া স্ফীত ভাবে বিচরণ করিয়াছি। কালের এই বিপরীত আদর্শ আমাদের উপরে বল খাটাইতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হয় নাই, তবে কেন আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হই নাই? কে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে? আর কেহই নহে—সর্ব্বজগতের জনক-জননী পরমেশ্বরের করুণা। সে করুণার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পূজ্যপাদ পিতৃদেবের জীবনের পবিত্র আদর্শ। জীবনের আদর্শ স্বতন্ত্র এবং বচনের আদর্শ স্বতন্ত্র। মহাত্মাগণের সদুপদেশ বাক্য সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই প্রচুর পরিমাণে ছড়ানো রহিয়াছে। তাহা লোকের প্রাণে পৌঁছিলে তবেই তাহাতে ফল দর্শিতে পারে। কিন্তু তাহা কাহারো প্রাণে পৌঁছে না—বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের জ্ঞানে উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ায়; আর তাহার ফল হয় পাণ্ডিত্য মাত্র। কিন্তু পাণ্ডিত্য স্বতন্ত্র এবং তত্ত্বজ্ঞান স্বতন্ত্র। যে জ্ঞান জীবাত্মার লক্ষ্যকে পরমাত্মার দিকে ফিরাইয়া মনুষ্যকে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবর্ত্তিত করে, এবং যে জ্ঞান ঈশ্বরোপাসনার কল্যাণ-প্রসাদে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হয়—সেই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। ঈশ্বর-পরায়ণ ভক্তিভাজন গুরুদিগের ভগবদ্ভক্তি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার আদর্শ-প্রভাবে যে জ্ঞান অলক্ষিত ভাবে ভিতরে ভিতরে পরিপোষিত হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। তাহার পরে ঈশ্বরোপাসনার অমৃত সিঞ্চনে সেই জ্ঞান যখন কামক্রোধাদির পঙ্কিল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঈশ্বর-প্রীতির মুক্ত বায়ুতে সমুত্থান করে, তখন তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ স্ফূর্ত্তি। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির আদর্শ জীবন ঈশ্বরের স্নেহ-পূর্ণ কল্যাণ-বাণী—তাহা লোকের প্রাণের উপরে অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করে; তাহার উপরে যখন ঈশ্বরোপাসনার অমৃত সিঞ্চন হইতে থাকে—তখন ঈশ্বরের সেই স্নেহময়ী বাণী প্রাণ হইতে মনে মন হইতে জ্ঞানে ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চে লতার ন্যায় জড়াইয়া উঠে—আর তাহা হইতেই তত্ত্বজ্ঞান পুষ্পের ন্যায় বিকসিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান এবং ঈশ্বর-প্রীতি এপিট ওপিট। যে সাধকের মনোমধ্যে ঈশ্বরপ্রীতি শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়, সেই সাধকই ব্রহ্মেতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া শোক তাপ এবং হৃদয়ভার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন আর কেহই তাহ পারে না। অতএব এটা স্থির যে, ঈশ্বরপ্রীতি তত্ত্বজ্ঞান এবং ব্রহ্মে কর্ম্ম-সমর্পণ, অথবা শাস্ত্রে যাহাকে বলে ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ, তিনের মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই—উহা একেরই তিন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উচ্চ আদর্শের ঠিক্ বিপরীত আদর্শ আমাদের চতুর্দ্দিকের জনসমাজে দম্ভ সহকারে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; সেই আদর্শের কুহকে পড়িয়া কর্ম্মী ব্যক্তিরা জ্ঞান এবং ভক্তি হইতে দূরে পড়িয়া যাইতেছেন, ভক্তেরা জ্ঞান এবং

কর্ম্ম হইতে দূরে পড়িয়া যাইতেছেন, এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভক্তি এবং কর্ম্ম হইতে দূরে পড়িয়া যাইতেছেন। যদি বা কোনো সাধক ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ উচ্চ আদর্শের সানুমঞ্চে ক্ষণকালের জন্য দণ্ডায়মান হ'ন, কিন্তু সেখান হইতে তিনি পশ্চাৎ দিকে নিম্নস্থিত ঐ বিপরীত আদর্শের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকিতে পারেন না,—কিন্তু তাহা সৎপরামর্শ নহে। পর্ব্বতের সানুমঞ্চের কিনারায় দাঁড়াইয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করা নিতান্তই অসমসাহসিক কার্য্য। সে-সকল ভয়াবহ স্থান হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেবের এই শুভ জন্মদিনে তাঁহার জীবনের পবিত্র আদর্শের প্রতি লক্ষ্য সমাধান করিয়া ভয়ের মধ্যে অভয়, অশান্তির মধ্যে শান্তি, দুঃখ দুর্দ্দিনের মধ্যে সুদিনের অরুণ-জ্যোতি আমরা যে আজ দর্শন করিতেছি—এক কথায়, পরমেশ্বরের অপার করুণা দর্শন করিতেছি—ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ব্রহ্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই।

"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু।"

ব্রহ্মে আমি ত্যজিব না
আমায় ত্যজেন নাই প্রভু।
তাঁহারে ত্যজিব আমি
এমন না হয় যেন কভু॥

হে পরমাত্মন্! যতকাল পর্য্যন্ত আমরা সপরিবারে এবং সবান্ধবে তোমাকে আমাদের আত্মাতে নিকট হইতে নিকটে পাইয়া ভবার্ণবের কাণ্ডারী প্রাপ্ত না হই, ততকাল পর্য্যন্ত তোমার করুণার এইরূপ জাজ্বল্যমান আদর্শ যেন বৎসর বৎসর আমাদের আত্মাতে সুবিমল শান্তি-সুধা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত না হয়—তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল নিম্নোদ্ধৃত এই প্রার্থনা পাঠ করিলেন।

হে ব্রাহ্মপরিবারের গৃহদেবতা,—মহর্ষি-জীবনের পরম ধন, আজ সমাগত ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া তোমার সুপুত্রের জন্য কর্ম্ম এবং চরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও আস্বাদ করিবার জন্য তোমার দ্বারে আমরা উপস্থিত হইয়াছি, আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর। যে জীবন্ত ব্রহ্মতেজে এই মহাত্মার জীবনকে তুমি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলে আমরা তাহার কণা মাত্রের ভিখারী। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে অদ্যাপি এই মূর্ত্তিমান ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানুরাগের দিব্য দেহ চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া আমরা অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছি। মহাত্মাদিগের জীবন অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্রের ন্যায়; যতই ইহার মধ্যে অবতরণ করা যায়, ততই অভিনব তত্ত্বরত্ন সকল দেখিতে পাই। বর্ষে বর্ষে তাই তোমার এই প্রিয় ভক্তের জন্ম কর্ম্ম আলোচনা ধ্যান আমাদের পক্ষে শিক্ষা এবং আনন্দ সম্ভোগের একটী বিশেষ উপলক্ষ্য। তজ্জন্য আজ হে দেবদেবেন্দ্র, তোমার পরম আদরের ধন এবং আমাদের পূজনীয় ভক্তি-ভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিনে তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা ভক্তি উপহার দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। প্রাচীন মহর্ষিদেব তোমার নির্জ্জন সহবাসে গভীর যোগে মগ্ন থাকিয়া জরা বার্দ্ধক্যের ক্লেশ সমস্ত ভুলিয়া যাউন! অথবা তাঁহার মঙ্গলের জন্য আমরা তোমার নিকট কি আর প্রার্থনা করিব! তুমি যে আশীর্ব্বাদে ইহাঁকে চির-কৃতার্থ করিয়াছ, তাহারই এক কণিকা আমাদিগকে দাও, যেন আমরা ইহার এই প্রাচীন জীবনে ঘনীভূত ব্রহ্মানুরাগ এবং

যোগানন্দের নবনব স্ফূর্ত্তি সন্দর্শন করত অমরত্বের আশা বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিতে পারি। এবং তাঁহার প্রসন্ন মুখের মধুর বাণী শ্রবণে সর্ব্বদা উৎসাহযুক্ত হই।

হে পুরাণ পুরুষ, প্রচীন শাস্ত্রে কথিত ছিল যে ধনীসন্তান স্বর্গে যাইতে পারে না। কিন্তু এই নব যুগে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানে হে ভক্তবৎসল ভূভারহারী ভগবান, সে কথা তুমি খণ্ডন করিয়া দিলে। প্রচুর ভোগ বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও তোমার বিশেষ কৃপায় ধনীসন্তান যে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত তুমি আমাদের সম্মুখে রাখিয়াছ। যোগে মগ্ন চিত্তের নিকট ভূতল অট্টালিকা, বিপুল বিভব এবং স্বজনপূর্ণ বাসভবন আর বিজন বনভূমি বা হিমালয় পর্ব্বত উভয়ই সমান। নতুবা কেন আজ এই বিলাসপ্রিয় সভ্যতার যুগে জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, নব্য ও প্রাচীন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা হইতে অন্তঃপুরবদ্ধা হিন্দু মহিলা পর্য্যন্ত ঐ দেবমূর্ত্তির চরণে ভক্তিভরে অবনত মস্তকে প্রণিপাত করে? ইহা কি প্রণত ব্যক্তিদিগের নিজের গুণ, না প্রণম্য মহাপুরুষের মাহাত্ম্য? সাধু ভক্তের জীবনে হে লীলাময় পরব্রহ্ম, তোমার যে দেবগুণ সকল জনসাধারণের কল্যাণার্থ মূর্ত্তিমান আকারে প্রকাশ পায় তাহা নিদাঘের জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় অতীব সুতীব্র, সামান্য দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কিছুই ধারণা হয় না। কিন্তু যখন তুমি পুরাতন জীবনের ভিতর হইতে নবজীবনের অঙ্কুর প্রথমে উৎপাদন কর, সেই অলৌকিক দেবক্রিয়া কি মনোহর! যে মাহেন্দ্র ক্ষণে উপনিষদের ছিন্ন পত্র এবং শ্মশান ভূমির উপরি স্থিত অগণ্য নক্ষত্র খচিত অনন্ত নীলাকাশের ভিতর দিয়া—যবনিকার অন্তরালবাসিনী মাতার ন্যায় যুবক দেবেন্দ্রনাথের পানে তুমি স্নেহদৃষ্টিতে চাহিলে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সজীব হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতি সঞ্চারিত করিলে তৎকালকার ভাব কি জীবনপ্রদ! তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত, মন স্তম্ভিত হয়। আহা! এইরূপে তুমি মানব হৃদয়ে নিজ মহিমা প্রদর্শন করিয়া থাক,—যাহা দেখিলে অবিশ্বাসী মায়াবদ্ধ জীবের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং শুনিলে নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

যে ব্রহ্মোপাসনার অক্ষয় অমর বীজ তুমি মহর্ষির হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলে তাহা হইতে এক প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপন্ন হইয়া বিস্তীর্ণ ভারত সমাজকে ফুল ফল ছায়া দান করিতেছে। সেই মহাদ্রুমের একটী বীজ সত্যেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া কত গম্ভীর সুশ্রাব্য এবং মধুর কবিত্বপূর্ণ ব্রহ্মসঙ্গীত এবং সাহিত্য রচনা করিল! এবং তাহার আর একটী বীজ জ্ঞানানন্দপ্রিয় দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তাশীল চিত্তে অঙ্কুরিত হইয়া কত রাশি রাশি তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পত্রিকা প্রবন্ধ প্রণয়ন করিল! অধ্যাত্ম জগতে সেই ব্রহ্মশক্তির প্রভাব যে কত তাহা কে বলিতে পারে? হে সর্ব্বমূলাধার অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষ, ইহা কেবল তোমারই জীবন্ত প্রত্যক্ষ শাসনের পরিচায়ক।

হে অখণ্ড অদ্বিতীয় পরম দেব, আবার বলি, পৌত্তলিক ভারত গৃহসংসারে থাকিয়া আর্য্যের আরাধ্য ব্রহ্মারাধনা করিতে পারিবে না এবং এক নিরাকার চৈতন্যময় দেবতার অর্চ্চনায় শান্তি মুক্তি কিছুই পাইবে না, এই যে কথা প্রচলিত ছিল, তাহাও তুমি তোমার এই ঋষিপুত্রের দ্বারা খণ্ডন করিয়া দিলে। ধনীও স্বর্গ লাভের অধিকারী, এবং জড় ও নরোপাসক পৌত্তলিক গৃহস্থ ব্যক্তি অনন্ত নিরাকার যে তুমি, তোমার ধ্যানে জ্ঞানে, যোগানন্দ সুধাপানে অধিকারী এই

উভয়, সত্যই তুমি মহর্ষিজীবনে প্রমাণ করিয়া দিয়াছ। এই অক্ষয় বীজ অলক্ষিত ভাবে শত শত ধনী জ্ঞানী, শিক্ষিত অশিক্ষিত নরনারীর জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি সমুৎপন্ন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে বংশপরম্পরায় করিবে। সেই শ্মশানভূমিতে অনন্ত নৈশ আকাশ দর্শনে, এবং গৃহে উপনিষদের ছিন্নপত্র অবলোকনে মহর্ষির অন্তরে তুমি যে গভীর রহস্যময় ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করিয়াছিলে বহু বাধা বিঘ্ন, রোগ শোক বিপদের মধ্য দিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে তাহা বিকসিত ও সমুজ্জ্বলিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের প্রত্যাদিষ্ট যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এবং আধ্যাত্মিক ব্রহ্মানুরাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তুমি ইহাঁকে পাঠাইয়াছিলে এখনও অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থির থাকিয়া ইনি সেই মহাব্রত পালন করিতেছেন। ইহাঁর কত কত সঙ্গী সহচর এবং পরবর্ত্তীগণ নিরাকার চৈতন্যের উপাসনা ধ্যানে শান্তি না পাইয়া পুনরায় পৌত্তলিকতা, অবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের মধ্যে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, কিন্তু ইহাঁকে তুমি অনন্ত হিমানীরঞ্জিত প্রবল ঝঞ্ঝাবাত-সহিষ্ণু অটল হিমাদ্রির ন্যায়—নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সেই ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানুরাগের সাক্ষীরূপে সমান ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছ; তজ্জন্য আমরা তোমাকে আজ বার বার প্রণাম করি। আমাদের আর্য্য পিতামহগণের বহুযত্নে উপার্জ্জিত লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দ যাঁহার দ্বারা বহু যুগযুগান্তের পর আবার তুমি পুনর্জ্জীবিত করিলে অদ্য তাঁহার শুভ জন্মদিনে অন্য কি উপহার দিয়া তাঁহাকে আমরা সন্তুষ্ট করিব? কেবল মুখে তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়াই বা কি হইবে? সামাজিক সৌজন্য, মৌখিক প্রশংসাগানে হৃদয় তৃপ্ত হয় না। মানবীয় দৃষ্টিতে এ সকল দেখিয়াও কোন লাভ নাই। তিনি যে পৈতৃক ব্রহ্মধন লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন সেই চিরন্তন অমূল্য রত্ন এবং যোগৈশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী তিনি আমাদিগকে করিতে চাহেন। তাহা করিতে পারিলেই তিনি বড় সুখী হন। ভারতের ঘরে ঘরে এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পূজা হয়, পৌত্তলিকতা কুসংস্কার ছাড়িয়া সকল নরনারী ব্রাহ্মধর্ম্মের সুধাপান করে, এই দেখিলেই তিনি সুখী। ইহাই তাঁহার প্রিয় উপহার।

হে আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রিয়তম পরমেশ্বর, বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানে দীক্ষিত ব্রহ্মোপাসক ভক্ত ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ তোমার পদতলে বসিয়া আজ তোমার ঋষিপুত্রের জন্মোৎসবে নিজ নিজ ব্রাহ্মজীবন উপহার দিতেছে তুমি ইহা গ্রহণ কর এবং এই প্রিয় উপহার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দাও। দয়াময় মঙ্গলদাতা পিতা, অদ্যকার দিনের গৌরব স্মরণ করিয়া তোমার মহর্ষি পুত্রের সহিত একাত্মা হইয়া ভক্তিভরে কৃতজ্ঞ অন্তরে তোমায় বার বার প্রণাম করি। তাঁহার আত্মা আমাদের আত্মা হউক! এবং আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা, সঙ্কীর্ণ হৃদয় তাঁহার মহান্ আত্মা এবং উদার হৃদয়ের সঙ্গে মিশিয়া তোমার হইয়া যাউক!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এইরূপ বলিলেন।

এ কথা সকলে অবগত আছেন, যে ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ভক্তি-ভাজন মহর্ষিদেব তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ঈশ্বর যখন তাঁহাকে সমুন্নত ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন, কি আকারে কিরূপে যে

তাহা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিতে হইবে, সে আলোকও তিনি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই আলোক সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহাকে গন্তব্য পথ হইতে কিছুতেই বিচলিত হইতে দেয় নাই। অনেক লোক ভ্রষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়াছে, অনেকে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তিনি সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান। তিনি বলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের যতই আলোচনা হউক তাহা কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী হইবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রেম-ভক্তি কোন কালেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী নহে। জনসমাজ গৃহ পরিবার সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠান, এ কাহারও সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধ নাই। জগতে ধর্ম্মভাবের যে সকল বিকাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ভিতর দিয়া যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য জাগিয়া উঠিতেছে, ইহা আমরা তাঁহার চরণে বসিয়া দেখিতেছি। মহর্ষিদেব বলেন আমি বৃদ্ধ ও শক্তিহীন হইয়াছি, আমাদ্বারা আর কোন কার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু আমরা বলি, তাঁহার পবিত্র জীবন আমাদিগকে যে শক্তি উৎসাহ ও নবজীবন প্রতিনিয়ত দান করিতেছে, তাহাতেই তিনি যথেষ্ট কার্য্য করিতেছেন। আমরা সকলে প্রার্থনা করি তিনি আরও অধিক দিন ধরিয়া জীবিত থাকুন যে তাঁহার চরণে বসিয়া আমরা সকলে উৎসাহ শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে থাকি।

হে করুণাময় বিধাতা! তুমি তোমার এই বিশ্বাসী অনুরক্ত জ্ঞানপরায়ণ পুত্রকে নিজ চরণে বসাইয়া, তাঁহার ও আমাদের সকলের কল্যাণের ও দেশের মঙ্গলের জন্য, তাঁহার হৃদয়ে যে আলোক প্রদান করিলে, সে আলোক যেন আমরা ধরিতে পারি, সে আলোকের কণামাত্র আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক। তুমি কৃপা করিয়া ইহাঁকে আরও দীর্ঘজীবী কর। জীবনের যৌবনের প্রারম্ভে ইহাঁর চরণে বসিয়া যে আলোক লাভ করিয়াছি তাহা যেন নির্ব্বাণ হইয়া না যায়। ইহাঁর ন্যায় অকপট প্রেম ভক্তি ঈশ্বরানুরাগ যেন হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তোমার নিকট আমাদের সকলের এই প্রার্থনা।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ভক্ত্যুপহার মুদ্রিত করিয়া আনিয়াছিলেন। সভাস্থলে তাহার এক এক খণ্ড প্রায় সকলকে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশিত করিলাম।

একান্তভক্তিভাজন—

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপিতৃ মহোদয়-

শ্রীচরণকমলেষু—

রূপং পশ্যতি চক্ষুষা শৃণোতি চ পুনঃ শ্রোত্রেণ শব্দং নরো
ঘ্রাণং জিঘ্রতি নাসয়া রসং রসনয়া গৃহ্লাতি তৈর্বাঞ্জসা।
হীনো দিব্যগুণেন তৎ কথং নু মনসা চৈকেন সর্ব্বং কিল
গৃহ্লন্ সংরমতে সদা পরত্র নিতরাং পশ্যন্ত্বমুষ্মিন্ জনাঃ॥

ক্ষীণে দেহে বিকলকরণে পারমেবাবতীর্য্য
যাস্যত্যাত্মা স্বমহিমগুণৈর্ধাম্নি নিত্যে তথাপি।
বাসং পৃথ্ব্যাং রচয়তি কথং? দাতুমধ্যাত্মতত্ত্বং
শেষোঽস্তীতি প্রথয়তি স তু প্রাপ্তমন্তর্ব্বিকাশম্।

ক্ষান্তং বাগ্রচনং পরেশমননৈর্যোঽসৌ দিনং যাপয়-
ত্যস্মাত্তৎ কিমহো পরেষু প্রবিশৎ তানূর্দ্ধভূমৌ নয়েৎ।
মা মাঃ সংশয়মত্র যত্ত্ব হৃদয়ে তত্ত্বং স্ফুরত্যস্য ত-
চ্চিত্তং সংস্পৃশতি হ্যলক্ষিতগতি প্রাপ্তানুরূপ্যস্য তু॥

কিমস্মাকং যত্নৈর্যদি ন নিখিলস্তত্ত্ববিভবো
ভবেদস্মাকং তত্তনয়পদবীং গন্তমনসাম্।
যদব্যক্তং ব্যক্তং হৃদি বিতনুতে রাজ্যমধুনা
ন চেন্মত্ত্যুঃ সোঽয়ং বিফলজননস্যাত্মন ইহ॥

বহির্ভেদো যোঽসৌ জননয়নগো ভাতি নিয়তং
ন সোঽস্মাকং ভীতিং জনয়তি যতো যোগমসকৃৎ।
বয়ং ত্বাত্তে নিত্যং প্রমিতিবিষয়ীকর্ত্তুমনসঃ
কৃতার্থাস্তস্মিংশ্চ প্রণতিনিবহশ্চাসা চরণে॥

অশীতীং ষট্পূর্ব্বাং বিশতি চ ভবানদ্য শরদা-
মহোব্রহ্মজ্ঞানাং নিকরমণ্ডিতো বন্ধুমণ্ডলম্।

* উপায়ং সংচিন্তন্ হৃদি সুবিমলে তাংশ্চ নিদধং
প্রবচ্ছত্যত্রাশাং বয়মপি মুদা সুষ্ঠু বিভূমঃ ॥

মানুষ চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখে, শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ শুনে, নাসা দ্বারা গন্ধ লয়, রসনা দ্বারা রস গ্রহণ করে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে চক্ষুরাদিবিরহিত হইয়াও এক দিব্যগুণবিশিষ্ট মনের দ্বারা সে সকল গ্রহণপূর্ব্বক পরলোকে মানব কি প্রকারে নিত্য অবাধে বিহার করে, লোক সকল ইহাঁতে (মহর্ষিতে) দর্শন করুন।

দেহ ক্ষীণ, ইন্দ্রিয় বিকল, এ অবস্থায় আত্মা পার হইয়া নিজমহিমগুণে নিত্যধামে গমন করিবে, তথাপি কেন উহা পৃথিবীতে বাসরচনা করিতেছে? এ বাস এই দেখায় যে, অন্তরে যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, এখনও তাহার বিতরণ অবশেষ আছে।

বাক্যরচনা ক্ষান্ত হইয়াছে। ঈশ্বরমননে ইনি দিনযাপন করেন, ইহা হইতে কি সেই তত্ত্ব অপর সকলেতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঊর্দ্ধভূমিতে লইয়া যাইবে? এ বিষয়ে সংশয় করিও না, যে কোন তত্ত্ব ইহাঁর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা অলক্ষিতগতি হইয়া যে ব্যক্তির চিত্ত ইহাঁর চিত্তের অনুরূপ সেই চিত্তকে গিয়া স্পর্শ করে।

আমরা তাঁহার (মহর্ষির) তনয়পদবীলাভাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার নিখিল তত্ত্ববিভব যদি আমাদের না হয়, তাহা হইলে আমাদের যত্নে কি ফল? যে তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে, যে তত্ত্ব ব্যক্ত হয় নাই, তাহা যদি এখন আমাদের হৃদয়ে রাজ্যবিস্তার না করে, তাহা হইলে তাহা বিফলজন্মা আত্মার পক্ষে মৃত্যু।

বাহিরে জন্মচক্ষুর নিকটে নিয়ত এই যে ভেদ (বিচ্ছিন্নভাবে স্থিতি) প্রকাশ পায়, উহা আমাদের ভয় জন্মায় না, কেন না আমরা অন্তরে নিয়ত নিত্যযোগ প্রত্যক্ষের বিষয় করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষী! যাই আমরা তাহাতে কৃতার্থ হই, অমনি ইহাঁর (মহর্ষির) চরণে আমরা অসংখ্য প্রণাম করি।

আজ আপনি ষড়শীতিবর্ষে প্রবেশ করিলেন আর অমনি ব্রহ্মভক্তগণকে সর্ব্বতোভাবে বান্ধিবার বিশুদ্ধ উপায়চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপনার সুবিমল হৃদয়ে স্থান দিলেন। এই ব্যাপারে আমরাও আনন্দের সহিত বিলক্ষণ আশাপোষণ করিতেছি।

১৮২৪ শক। ৩রা জ্যৈষ্ঠ। প্রশ্রয়াবনত
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।

আমাদের বক্তব্য।

আকাশমার্গে নিরীক্ষণ করিলে গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রতারার ভিতরে যে এক ঘনিষ্ঠতম যোগ আছে তাহা স্থূল দৃষ্টিতে প্রতীয়মান না হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাহারা যে এক সূত্রে আবদ্ধ তাহা বেশ বুঝা যায়। পৃথিব্যাদি গ্রহ সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে, চন্দ্রমাদি উপগ্রহ পৃথিবীকে আবেষ্টন করিতেছে; সকলেরই মধ্যে সখ্যভাব ও সুন্দর শৃঙ্খলা বিদ্যমান। যে যে দিকেই ধাবিত হউক না, সৌরজগতের কেহই সূর্য্যকে ভুলিয়া নাই; সূর্য্যের আকর্ষণ সকলকেই আপনারদিকে সবেগে টানিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও, অবান্তর বিষয়ে সামান্য সামান্য মতবৈষম্য থাকিলেও, পরস্পরে নিজনিজ মতের গণ্ডীর ভিতরে ভ্রাম্যমাণ হইলেও, সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী যে এক অবিচ্ছিন্ন যোগ-সূত্রে গ্রথিত, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সকলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছেন।

যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ-বলে সৌরজগত পরিচালিত ও সমাকৃষ্ট। দেবেন্দ্রনাথের আকর্ষণ-রজ্জু, তাঁহার আধ্যাত্মিক বল নৈতিক বল ও স্নেহপ্রেমের বল, এই ত্রিবিধ তন্তু দ্বারা সংরচিত। বার্দ্ধক্যের সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার দেহে জরার সঞ্চার হইয়াছে বটে, কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মবলে তাঁহার মুখমণ্ডল উদ্দীপনাপূর্ণ, স্নেহ ও অমায়িকতায় সরস ও মাধুর্য্যময়।

ব্রাহ্ম সাধারণের উপর দেবেন্দ্রনাথের এই যে গাঢ় স্নেহধারা, তাহা নিষ্ফল বিগলিত হয় নাই। সকলে কৃতজ্ঞতাপাশে যে তাঁহাতে নিতান্তই অনুরক্ত, তাহার পরিচয় দিবার জন্যই যেন সকল সম্প্রদায়স্থ ব্রাহ্মগণের সম্মিলন ধর্ম্মপিতা মহর্ষির জন্মদিন উপলক্ষে ঘটে। সমাগত ব্রাহ্মসংখ্যা প্রায় ৩০০ শত হইবে। উপাসনা শেষ হইয়া গেলে সকলেই মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ত্রিতলে গমন করিলে প্রণিপাত ও সস্নেহসম্ভাষণে আরও একঘণ্টা কাটিয়া যায়। সকলের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ ভাব দেখিয়া সেদিনকার ব্যাপার আমাদের চক্ষে বড়ই রমণীয় বোধ হইয়াছিল। স্নেহধর্ম্মশীল মহর্ষি, কৃতজ্ঞতাভারাবনত ব্রাহ্মগণ, ইহাঁদের মধ্যে সেদিনকার ঘটনায় কে যে অধিক ভাগ্যবান তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া রাত্রি ৮টার সময় মহর্ষির চরণপ্রান্ত হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, ভগবন্! ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণের জন্য এরূপ দৃশ্য যেন আর কিছু দিনের জন্য স্থায়ী হয়।

গত ১ বৈশাখে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে ছাত্রসমাজে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

নববর্ষের চিন্তা।

বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিদিনই নূতন, কিন্তু তাহাকে প্রত্যহ নূতন করিয়া অনুভব করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। আমাদের পরমায়ু অল্পই, কিন্তু আমরা বিশ্বের চেয়েও যেন প্রাচীন। একটা সেকালের দিঘী যেমন তাহার ভাঙাঘাটে ও শৈবাল-দলে গঙ্গার চেয়ে প্রাচীন, তেমনি যে জগতে দুদিনমাত্র জন্মিয়াছি, সেই চিরদিনের জগতের চেয়ে আমরা পুরাতন। প্রকৃতি একই সূর্য্য লইয়া কোটিবৎসর প্রত্যহ তাহার প্রভাত রচনা করিয়া আসিতেছে, একই নক্ষত্রমণ্ডলী অসংখ্যযুগ ধরিয়া তাহার প্রতিরাত্রের সভাসজ্জা সম্পাদন করিতেছে, নূতনত্বের চেষ্টামাত্রকে সে অবজ্ঞা করে, এতই সে স্বভাব-নবীন। আর আমরা কয়েকটা দিনমাত্র যে জীবনকে বহন করি, সে তাহার প্রাত্যহিক কর্ম্মে এবং চিন্তায় প্রত্যহই জরাজীর্ণ হইতে থাকে, সে নিজের প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তিতে প্রত্যহই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। নূতনত্বের জন্য আমাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, কত উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতে হয়—আমরা এতই অল্প দিনের মধ্যে এতই ভয়ানক পুরাতন হইয়া পড়ি,—আমাদের স্পর্শে নবীনত্বের মধ্যে জরা সংক্রান্ত হয়।

সেইজন্য প্রকৃতিতে বর্ষারম্ভের কোন বিশেষ দিন না থাকিলেও, মানুষ একটানা-ভাবে বহন করিতে চায় না—জীবনটাকে যেন নূতন-নূতন পরিচ্ছদে মাঝে-মাঝে নূতন করিয়া আরম্ভ করিলাম, এইরূপ কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয়।

পৃথিবী গতবৎসরের ১লা বৈশাখ হইতে

এ বৎসরের ১লা বৈশাখে সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল, ইহা তাহার পক্ষে কোন সংবাদই নহে। এখানে তাহার কোন ছেদ নাই। আমাদেরও জীবনে ১লা বৈশাখে কোন ছেদ পড়ে নাই। জীবনের ধারা কালি হইতে আজিকার মধ্যে সমানভাবেই গড়াইয়া আসিতেছে, কর্ম্মের স্রোত আপনার চিরাভ্যস্ত পথে স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই, তবু ক্লান্ত মন আজিকার এই একদিনকে বিশেষ দিন নাম দিয়া প্রত্যহের এই বোঝাটাকে বহিবার জন্য নূতন বল অন্বেষণ করিতেছে।

ইহার বিশেষ কারণ আছে। অভ্যাসের বেগ আমাদের অন্ধভাবে ঠেলিয়া লইয়া যায়—প্রাত্যহিক কাজের ভারে মৃত্যুর ঢালু-রাস্তার দিকে আমরা গড়াইয়া চলিয়া যাই—নিজের কর্তৃত্বগৌরব অনুভব করিবার অবসর পাই না। নববর্ষের দিনে সেই অন্ধগতির মুখে একটা বাধার মত দিয়া অভ্যস্ত কর্ম্মচালিত মন নিজেকে স্বতন্ত্র জাগ্রতভাবে একবার অনুভব করিয়া লইতে চায়। সে গর্ব্বের সহিত বলে, আজ হইতে আমি নববর্ষ আরম্ভ করিলাম, আমি নূতন সালের পথে যাত্রা করিয়া চলিলাম, এই বলিয়া ২রা বৈশাখের দিনে সে পুনরায় আপনার কোচ্‌বাক্সের উপর আরামে ঘুমাইয়া পড়ে এবং চিরাভ্যাস জরাজীর্ণ গর্দ্দভের মত বিনা বল্গায় বিনা চালনায় দিবারাত্রি তাহার রথ টানিয়া মৃত্যুর দিকে চলিতে থাকে।

যে প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আমাদের মনের উপরেও কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে মন নববর্ষের দিনে বৈরাগ্যের ছায়াপাত করিয়া সেই কর্ম্মকে ছোট করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে। বলে, মৃত্যুতে সকল কর্ম্মের অবসান হইবে, নববর্ষ সেই খবর দিতে আসিয়াছে। বলে, "গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে"—বলে, "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।"—বলে, এই যে ধনজনমানের জন্য বৎসর বৎসর খাটিয়া মরিতেছ, একটি বৎসর আসিবে, যে সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তোমাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিয়া দিবে। হয় ত এই-ই সেই বৎসর, কে বলিতে পারে? মন তাই উপদেশ দেয়, কর্ম্মস্তূপের দ্বারা মনের জীবনকে, কর্ম্মের গতির দ্বারা মনের গতিকে নাশ করিয়ো না।

যখন নগরের কর্ম্মশালার মধ্যে বাস করিতাম, তখন নববর্ষে সভা ডাকিয়া আমরা এই কথা চিন্তা করিয়াছি। তখন মৃত্যুর কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করা আমাদের প্রয়োজন ছিল,—কারণ, সেখানে কর্ম্ম আমাদিগকে একেবারে চারিদিকে চাপিয়া থাকে, নিশ্বাস ফেলিতে দেয় না। মৃত্যুর ভাব সেই নিবিড় কর্ম্মকে খর্ব্ব করিয়া সেই কর্ম্মের চারিদিকে বৃহৎ অবকাশ রচনা করিয়া দেয়—মৃত্যু সেই কর্ম্মকারাগারের মধ্যে জান্‌লা কাটিয়া অবরুদ্ধ অনন্তকে প্রকাশিত করে। বর্ষারম্ভের প্রভাত-আলোক হইতে বর্ণচ্ছটাবিহীন শুভ্র বৈরাগ্য-রশ্মি আকর্ষণ করিয়া আমাদের চারিদিকের যাহা কিছু ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, জীর্ণ, তাহারই ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, জীর্ণতা প্রত্যক্ষ করি, এবং তাহারই একাধিপত্য হইতে মনকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করি।

এবারে ভাগ্যক্রমে যেখানে আছি, সেখানে অভ্রভেদী কর্ম্মস্তূপের মধ্যে ছিদ্র করিয়া বর্ষারম্ভের দিনকে কেবল একদিনের অভ্যাগতের মত আমাদের ঘরের মধ্যে ডাকিয়া আনিতে হয় না। এখানে আমরাই সনাতন নববর্ষের বিপুলপ্রাসাদে অতিথিরূপে সমবেত।

উন্মুক্তদ্বার প্রাসাদ এই-যে আমাদের চারিদিকেই। বিরলতৃণ অনুর্ব্বর মাঠ

কোথায় চলিয়া গেছে! তাহার অবাধ বিস্তৃত নভোন্নত ভঙ্গিমার নিশ্চল বৈচিত্র্য অনুসরণ করিতে করিতে দুই চক্ষু আকাশের পাখীর মত সুদূর দিক্‌প্রান্তের নীলাভ কুহেলিকার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া লুপ্ত করিয়া ফেলে। এই মাঠ দিগম্বর রুদ্রদেবের মত রিক্ত;—শূন্যতাই ইহার মহৎ ঐশ্বর্য্য। মাঝে মাঝে কাঁটা-গুল্ম, খর্ব্বখেজুর ও বল্মীকস্তূপে এই মাঠের অনুর্ব্বরতার সাক্ষ্য দিতেছে, ইহার সম্পূর্ণ অনাবশ্যকতার গৌরব প্রমাণ করিতেছে। শস্য প্রভৃতি মানুষের ক্ষুদ্র কাম্যবস্তু হইতে এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ড নিজেকে এমনি নির্ম্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, ইহার কাছে শূন্য বিস্তীর্ণ-ইহাকে ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করিবার নাই। এখানে দুঃসহদীপ্তি বৈশাখ তাহার অখণ্ড রুদ্রভাবে একাকী আসিয়া দণ্ডায়মান হয়; তাহার কোন কাজ—কোন প্রয়োজন নাই; সে ফলে পাক ধরাইতে বা মৌমাছির মধুভাণ্ডার পূর্ণ করিতে আসে না। ঘনঘোর শ্যামল শ্রাবণ বিদ্যুচ্চকিত দিগ্‌দিগন্তরে তাহার বিপুল সমারোহ প্রসারিত করিয়া গম্ভীর মেঘগর্জ্জনে এখানে আবির্ভূত হয়—শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করিবার জন্য নহে;—তাহার নববারিধারা গৈরিকবসনা মুনিকন্যাদের মত এই বিশাল নির্জ্জনতার মধ্যে আঁকাবাঁকা চিত্র কাটিয়া, গহ্বর খুদিয়া, বালি ও নুড়ির স্তূপ রচনা করিয়া, কলহাস্যে অকারণ খেলা খেলিয়া যায়। ঋতুপর্য্যায় এখানে ঘরের ছেলের মত আসে, কাহারো কোন কাজ করিতে নহে—নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে বিরাজ করিতে।

এই প্রয়োজনহীন বিপুল রিক্ততার মাঝখানে আমাদের স্নিগ্ধচ্ছায় আশ্রমটি। চারিদিকের এত-বড় বৃহৎ অবকাশের দ্বারা আমাদের আশ্রমশ্রী নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। শিবের সুবিশাল দারিদ্র্যের মাঝখানে অন্নপূর্ণা যেমন নিজের ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট করেন, সেইরূপ। পরস্পরকে পরস্পরের একান্ত প্রয়োজন ছিল—শ্যামলা আশ্রমলক্ষ্মী এই রক্তপাংশুমণ্ডিত শূন্যহস্ত উদাসীনকে বহুবর্ষ-তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং পূর্ণতা দান করিয়াছে।

এই আশ্রমের মধ্যে তরুলতা আজ নবপল্লবে বিকশিত, আম্রবন এতকাল মুকুলগন্ধে বাতাসকে পাগোল করিয়া দিয়া আজ তরুণফলভারে সার্থক। আমলকীশ্রেণী তাহার গত বৎসরের গর্ভভার মোচন করিয়া নবকিসলয়ে নবযৌবন লাভ করিয়াছে। শিরীষের গাছে ফুল ধরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। জামের মঞ্জরী শাখা পরিপূর্ণ করিয়া মুখর মৌমাছির দস্যুবৃত্তিতে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে।

এখানে কর্ম্মের ক্ষুদ্রতা, কালের অনিত্যতা, জীবনের অনিশ্চয়তা, সুখদুঃখের চাঞ্চল্য—এই সমস্ত কথা আলোচনা করিবার নহে। নিজের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও দীনতার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া বিলাপ-পরিতাপ করিবার জন্য এখানে আসি নাই। এখানে নূতনতার নিস্তব্ধ সমুদ্রের মধ্যে অবগাহন করিয়া লইব। এখানে কালিও যে নূতন ছিল, আজিও সেই নূতনই রহিয়াছে, কেবল আজ প্রভাতে আমাদের চিন্তাকীটজীর্ণ জীবনযাত্রার অতি ক্ষুদ্র প্রাচীনত্বটাকে ক্ষণকালের জন্য সরাইয়া দিয়া সেই যুগযুগান্তরের অবসানহীন নবীনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর লইয়াছি।

আমাদের ক্লান্তজীবনে যখন নূতনত্ব খুঁজি, তখন ক্রমাগত বৈচিত্র্য এবং উত্তেজনার আশ্রয় লইয়া থাকি। সেই অবিশ্রাম চাঞ্চল্য আমাদিগকে কেবলি নবতর ক্লান্তি ও জরার দিকেই অগ্রসর করিয়া দেয়। বৈচিত্র্যের

খণ্ডখণ্ড ক্ষুদ্রক্ষুদ্র নূতনত্বকে মুহূর্তে-মুহূর্তে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়া সেই আবর্জ্জনার মধ্যে অন্তঃকরণকে কবর দেওয়া হয়।

আজ চিরনূতনের রহস্য এই প্রান্তর-বাসিনী প্রকৃতির কাছে শিক্ষা করিয়া লইব।

অধুনা আমাদের কাছে কর্ম্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি। হাতের কাছে হোক—দূরে হোক্, দিনে হোক্—দিনের অবসানে হোক্, কর্ম্ম করিতে হইবে। কি করি, কি করি—কোথায় মরিতে হইবে—কোথায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে, ইহাই অশান্তচিত্তে আমরা খুঁজিতেছি। য়ুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা। কাজ, অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপায়েই হোক্, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া—মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে। এই কর্ম্মনাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যখন এক-একটা জাতিকে পাইয়া বসে, তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না। তখন দুর্গম হিমালয়-শিখরে যে লোমশ ছাগ এতকাল নিরুদ্বেগে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা অকস্মাৎ শিকারীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। বিশ্বস্তচিত্ত সীল্ এবং পেঙ্গয়িন্ পক্ষী এতকাল জনশূন্য তুষার-মরুর মধ্যে নির্ব্বিরোধে প্রাণধারণ করিবার সুখটুকু ভোগ করিয়া আসিতেছিল,—অকলঙ্ক শুভ্রনীহার হঠাৎ সেই নিরীহ প্রাণীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিল্পনিপুণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে থাকে,—এবং আফ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাচ্ছন্ন কৃষ্ণত্ব বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া আর্ত্তস্বরে প্রাণত্যাগ করে।

এখানে আশ্রমে নির্ম্মল প্রকৃতির মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্ম্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্ম্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুখের দিকে যখনি চাই, দেখি, সে অক্লিষ্ট—অক্লান্ত যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিস্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসনগ্রহণ করিয়াছে। এই নিখিলগৃহিণীর রান্নাঘর কোথায়, ঢেঁকিশালা কোথায়, কোন্ ভাণ্ডারের স্তরে স্তরে ইঁহার বিচিত্র আকারের ভাণ্ড সাজানো রহিয়াছে? ইঁহার দক্ষিণ হস্তের হাতাবেড়িগুলিকে আভরণ বলিয়া ভ্রম হয়, ইঁহার কাজকে লীলার মত মনে হয়, ইঁহার চলাকে নৃত্য এবং চেষ্টাকে ঔদাসীন্যের মত জ্ঞান হয়। ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিম্নে গোপন করিয়া, স্থিতিকেই গতির উর্দ্ধে রাখিয়া, প্রকৃতি আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশমান রাখিয়াছে—ঊর্দ্ধশ্বাস কর্ম্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়মান কর্ম্মের স্তূপে নিজেকে আচ্ছন্ন করে নাই।

এই কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে অবকাশ, এই চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশান্তির দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখা,—প্রকৃতির চিরনবীনতার ইহাই রহস্য। কেবল নবীনতা নহে ইহাই তাহার বল।

ভারতবর্ষ তাহার তপ্তভাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্কধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জট বিরাট্ মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কর্ম্মের ক্রীতদাস নহে।

সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়—তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া

কর্ম্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্ম্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্ম্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্ম্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্যমাত্র।

বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তিক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, আমাদের চরিত্র ভগ্ন-বিকীর্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কার্য্যপ্রণালী অতি সহজ-সরল, অতি প্রশান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। তাহাতে আড়ম্বরমাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না। সতী স্ত্রী অনায়াসেই স্বামীর চিতায় আরোহণ করিত, সৈনিক সিপাহী অকাতরেই চানা চিবাইয়া লড়াই করিতে যাইত, আচাররক্ষার জন্য সকল অসুবিধা বহন করা, সমাজরক্ষার জন্য চূড়ান্ত দুঃখ ভোগ করা এবং ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করা, তখন অত্যন্ত সহজ ছিল। নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে; আমরা নিজেই ইহাকে জানি না। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষা-চঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে, এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম্মরক্ষার দৃঢ়ত্ব দান করিয়াছে। শান্তির মর্ম্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদৃঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে, ইংরাজি কোর্ত্তা, ইংরাজের দোকানের আস্বাব, ইংরাজি মাষ্টারের বাক্‌ভঙ্গিমার অবিকল নকল কোথাও থাকিবে না, কোন কাজেই লাগিবে না। আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না,—জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজিস্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে, রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী—তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা

উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি— তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে;—যখন ঝড়ের গর্জ্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণবাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ-ঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ—তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন—তাহাকে অবিশ্বাস করিব না,—যাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না; করযোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

আজি নববর্ষে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর একটি ভাব আমরা হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতবর্ষের একাকিত্ব। এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জ্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

সকল দেশেই একজন অচেনা বিদেশী পথিক অপূর্ব্ব বেশভূষায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্থানীয় লোকের কৌতুহল যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে—তাহাকে ঘিরিয়া, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, আঘাত করিয়া, সন্দেহ করিয়া বিব্রত করিয়া তোলে। ভারতবাসী অতি সহজে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে—তাহার দ্বারা আহত হয় না এবং তাহাকে আঘাত করে না। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান, হিয়োন্‌থ্‌সাং যেমন অনায়াসে আত্মীয়ের ন্যায় ভারত পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন, য়ুরোপে কখন সেরূপ পারিতেন না। ধর্ম্মের ঐক্য বাহিরে পরিদৃশ্যমান নহে,—যেখানে ভাষা, আকৃতি, বেশভূষা, সমস্তই স্বতন্ত্র, সেখানে কৌতূহলের নিষ্ঠুর আক্রমণকে পদে পদে অতিক্রম করিয়া চলা অসাধ্য। কিন্তু ভারতবর্ষীয় একাকী আত্মসমাহিত—সে নিজের চারিদিকে একটি চিরস্থায়ী নির্জ্জনতা বহন করিয়া চলে—সেইজন্য কেহ তাহার একেবারে গায়ের উপর আসিয়া পড়ে না। অপরিচিত বিদেশী তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার যথেষ্ট স্থান পায়। যাহারা সর্ব্বদাই ভিড় করিয়া, দল বাঁধিয়া, রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া থাকে, তাহাদিগকে আঘাত না করিয়া এবং তাহাদের কাছ হইতে আঘাত না পাইয়া নূতন লোকের চলিবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তবে এক-পা অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় যেখানে থাকে, সেখানে কোন বাধা রচনা করে না—তাহার স্থানের টানাটানি নাই—তাহার একাকিত্বের অবকাশ কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। গ্রীক হউক্, আরব হউক্, চৈন হউক্, ভারতবর্ষ জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করে না, বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোন কথা বলে না।

এই একাকিত্বের মহত্ত্ব যাহার চিত্ত আকর্ষণ করে না, সে ভারতবর্ষকে ঠিকমত চিনিতে পারিবে না। বহুশতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিদেশী উন্মত্ত বরাহের ন্যায় ভারতবর্ষকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত

পর্য্যন্ত দন্তদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফিরিয়াছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন বিস্তীর্ণ একাকিত্ব-দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল—কেহই তাহার মর্ম্ম-স্থানে আঘাত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ যুদ্ধ-বিরোধ না করিয়াও নিজেকে নিজের মধ্যে অতি সহজে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে জানে—সেজন্য এ পর্য্যন্ত অস্ত্রধারী প্রহরীর প্রয়োজন হয় নাই। কর্ণ যেরূপ সহজ কবচ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি সেইরূপ একটি সহজ বেষ্টনের দ্বারা আবৃত—সর্ব্বপ্রকার বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যেও একটি দুর্ভেদ্য শান্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অচলা হইয়া ফিরে—তাই সে ভাঙিয়া পড়ে না, মিশিয়া যায় না, কেহ তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না—সে উন্মত্ত ভিড়ের মধ্যেও একাকী বিরাজ করে।

য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্ম্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধন-সম্পদ, আরাম-সুখ নিজের—কিন্তু তাহার দান-ধ্যান, স্কুল-কলেজ, ধর্ম্ম-চর্চ্চা, বাণিজ্যব্যবসায়, সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখ-সম্পত্তি একলার নহে—আমাদের দান-ধ্যান-অধ্যাপন, আমাদের কর্ত্তব্য একলার।

ক্রমশঃ।

একেশ্বরবাদীর বিশ্বাস।

ঈশ্বর! তুমিই জানি সকলের আদি
ইহাই বিশ্বাসি' আমি একেশ্বরবাদী;—
তুমি এক অদ্বিতীয় সকলের মূল
ইহাই বিশ্বাসি' আমি দূরি মিথ্যা ভুল;—
বিচিত্র ভাবের মাঝে সামঞ্জস্য পাই—
কণিকা বিশৃঙ্খলতা কোথাও যে নাই!—
আমাদের জ্ঞান ধর্ম্ম বিজ্ঞান বিবেক—
অনেক বিষয়, মধ্যে তুমি মন্ত্র এক!—
আশ্চর্য্য মহিমাময়,—তুমি চির সত্য
বিশ্বচরাচরে কর চির আধিপত্য;
তব ভাব হ'তে জাগে সত্য সমুদয়
তোমারে জানিলে ঘুচে সকল সংশয়,
বিশ্বাসে তোমার—জ্ঞানে জেগে ওঠে প্রাণ
কেটে যায় পাপ, জাগে পুণ্য পরিত্রাণ।

সংবাদ।

১। নক্ষত্রের গতি—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি অনেকগুলি দ্রুতগামী নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতক গুলি নক্ষত্র এক সেকেণ্ডে ৫০ মাইল গমন করিয়া থাকে।

২। মানবের স্বাস্থ্য—নিত্য নূতন নূতন রোগে ভারতের মনুষ্যগণ যে এত জীর্ণ ও অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে বসিয়াছে, হিন্দু আচার ব্যবহার পরিত্যাগ এবং বিশেষ-রূপে অনার্য্য বৈদেশিকগণের মৃতদেহ মৃত্তিকাসাৎ করাই তাহার একমাত্র কারণ। ভূমিতল হইতেই যত প্রকার ব্যাধির বীজ উত্থিত হইয়া মারাত্মক রূপে মনুষ্য শরীরকে এত আক্রমণ করিতেছে। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে, জর্ম্মাণী দেশের তিন হাজার ডাক্তার একযোগে শব-দাহের অনুকূলে জর্ম্মাণ পার্লামেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অন্ততঃ সংক্রামক রোগে মৃত ব্যক্তিদিগের দেহ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিতে প্রজা সাধারণকে বাধ্য করা হউক। নতুবা রোগের বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। চির-স্তন জাতীয় সংস্কারই মনুষ্যকে বহুবিধ কল্যাণের পথে গমন করিতে বাধা দিয়া থাকে। আমরা আশা করি জ্ঞানোন্নতিশীল

খ্রীষ্ট-শিষ্যদিগের ন্যায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের শিষ্যগণও এই সকল সমাজ সংস্কারের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবেন।

৩। নিদ্রাল্পতা—মানবকের উপনয়ন সময়ে আচার্য্য তাহাকে এই উপদেশ দিয়া থাকেন যে; "মা দিবাস্বাপ্সীঃ" দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না। নিদ্রাকে অল্প করিয়া শরীরের তেজ রক্ষা করাই এই উপদেশের উদ্দেশ্য। নিদ্রাশীল মৃত্তিকা প্রস্তরের ন্যায় মনুষ্যও যদি অধিকাংশ কাল নিদ্রাতেই কাটাইয়া দেয় তবে তাহার আর জাগ্রত জীবের গৌরব কোথায় রহিল? আমেরিকার সিকাগো নগরে একদল লোক আছেন, তাঁহারা চারি ঘণ্টার অধিককাল নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন না। ইহাঁদের একটি সভা আছে। এই সভার সভ্যগণের মতে চারি ঘণ্টার অধিক কাল নিদ্রার আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদিগকেও চারি ঘণ্টার অধিক ঘুমাইতে দেন না।

অভিনন্দন পত্র।

সম্প্রতি ভারতেশ্বরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে শ্রীমন্মহর্ষিদেবের গৃহে ব্রাহ্মসাধারণের এক সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভা হইতে ভারতেশ্বরকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয় তাহার প্রতিলিপি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

TO His Imperial Majesty,

KING EDWARD VII.

Emperor of India.

May it please Your Majesty.

We, the member of the Brahmo Somaj and subjects of your Majesty's Empire beg most humbly to approach you and to convey our most humble and heartfelt felicitations on the solemn and auspicious occasion of Your Majesty's Coronation. Under the benign reign of Your Majesty's mother, our late revered Empress Victoria, we, in common with the rest of Your Majesty's subjects in India. pursued our religious faith in perfect tranquility and freedom, without which the Brahmo Somaj would never have grown and flourished as it has done and we humbly avail ourselves of this happy event to express our deep-felt gratitude and to give renewed expression to our unswerving loyalty to you and Your Majesty's House. Our grateful memories of your most gracious mother and the visit of Your Majesty to this land draws us specially to Your Majesty. It is our fervent hope and trust, that Your Majesty's reign will, by Divine Grace, be marked by the maintenance of that freedom of thought and religion which we have hitherto enjoyed under the benign reign of our late beloved Queen-Empress. May the All-Wise and Benevolent Being who rules over all grant Your Majesty a long and prosperous reign and guide Your Majesty and Your Majesty's dearly beloved Consort in fulfilling the beneficent purposes of His divine will.

With deep loyalty and regards,

We remain,

Your Majesty's most Humble Subjects,

Devendra Nath Tagore,

Chief Minister

and

The other members of the Brahmo Somaj.

Calcutta 11th May 1902.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, বৈশাখ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৬২।/৯
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৫৮৸/৯
সমষ্টি	...	৯২১৶৩
ব্যয়	...	৩৮৩॥৯
স্থিত	...	৫৩৭॥৶৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৩৭॥৶৬

৫৩৭॥৶৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ২৬০।/৯

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
পারিবারিক দান
৩৪৲

বাবু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতাঠাকুরাণী
তাঁহার পুত্রের আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে
বিশেষ দান
৫৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর
১৫৲

দানাধারে প্রাপ্ত ১৬।/৯

২৬০।/৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৪৸০
পুস্তকালয়	...	৬।৶০
যন্ত্রালয়	...	৪৮৸/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৲
সমষ্টি		৩৬২।/৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২১৭।/৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		৪৩৲
পুস্তকালয়	...	৸৶৩
যন্ত্রালয়	...	১২২।/৩
সমষ্টি		৩৮৩॥৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় সোমবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ
১লা আষাঢ়, ১৩০৯।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

অনেক গ্রাহক মহোদয়ের নিকটে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বহুদিনের মূল্য বাকী পড়িয়া আছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে তাঁহারা সেই মূল্য অগৌনে প্রেরণ করিয়া আমাদের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সহায়তা করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজকে ব্যয়ভারে ভারাক্রান্ত করিয়া কাহারও লাভ নাই—কিন্তু ইহাকে সাহায্য করিলে পুণ্য ও মহত্ত্ব আছে। ইহা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।
সহকারী সম্পাদক।

পঞ্চদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৭।

৭০৮ সংখ্যা　　　　　　　　　　　　১৮২৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्

सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया

पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৬৩। কলিগতাব্দ ৫০০৭। ১ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

সৃষ্টি ও স্রষ্টা কাহার নাম ?*

এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি কি পদার্থ? ইহা সত্য কি মিথ্যা, এবং যিনি ইহার স্রষ্টা তিনি সত্য হইয়া মিথ্যাকে সৃষ্টি বা প্রকাশ করিয়াছেন, কি মিথ্যা হইয়া সত্যকে সৃষ্টি বা প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন সত্য ছিল তাহাকে রচনা বা সৃষ্টি করিয়াছেন বা একই অদ্বিতীয় সত্য যিনি পূর্ব্বে ছিলেন এখনও আছেন পরেও থাকিবেন, যাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও সত্য বা সত্তা নাই ও যাঁহার কোন কালে বিনাশ নাই, তাঁহাতেই অর্থাৎ সেই সত্তাতেই রূপ গুণ শক্তি প্রকাশ পাওয়ায় এই সৃষ্টি বোধ হইতেছে অর্থাৎ তিনিই এই সৃষ্টি নাম রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহার মধ্যে কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা বিচারের প্রয়োজন, কারণ এই বিষয়ের মীমাংসা না হইলে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ও ব্যবহার চলিতেই পারে না।

কেহ বলেন পরমাত্মা মূল সত্য, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যাহারা আছে তাহারা আপেক্ষিক সত্য, সংস্থায়ী এ লক্ষণ সেই মূল সত্য হইতে তাহাদিগেতে সংক্রমিত হইয়া তাহারাও সত্য হইয়াছে। এ বিষয়ে কয়েকটী বিবেচনার কথা আছে, প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে যাহা নাই তাহাতে কিরূপে পরমাত্মার সত্তা সংক্রমিত হইবে বা হইতে পারে? দুইটী ভিন্ন পদার্থ থাকিলে তবেই একের গুণ বা লক্ষণ অপরে সংক্রমিত হওয়া সম্ভব। পরমাত্মা হইতে সৃষ্টিতে যাহা সংক্রমিত হইতেছে তাহা সত্তা। গুণক্রিয়ার যাহা আধার তাহাই ত সত্তা? যাহা নাই তাহাতে সত্তার সংক্রমণ হইয়া তাহা হওয়া এবং সত্তারই তাহা হওয়া, এ দুয়েতে ভাষার প্রভেদ আছে, কিন্তু ভাব বা বস্তুর কোন প্রভেদ আছে কি না ইহাই দ্রষ্টব্য।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে এই এক ভেদ যে ঈশ্বর নিত্য সৃষ্টি অনিত্য, এবং ঈশ্বরের অতিরিক্ত কোন সত্তা নাই। ঈশ্বরের নিত্যতা গুণ (সৃষ্টিকে তাঁহা হইতে পৃথক ধরিলে) সৃষ্টিতে নাই ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কিন্তু এখানে দেখিতে হইবে যে সৃষ্টি তাঁহা হইতে পৃথক কি না, পৃথক হইলে কি অর্থে পৃথক? সৃষ্টি

* মহর্ষিদেবের অন্তঃপুরে মহিলাসমাজে তাঁহারই পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পঠিত।

তাঁহার সহিত কোন ভাবে কোন অর্থে অভিন্ন কি না, অভিন্ন হইলে কি অর্থে অভিন্ন?

তিনি মাতা পিতা আমরা পুত্র কন্যা, তিনি প্রভু আমরা দাস দাসী, তিনি গুরু আমরা শিষ্য, তিনি বৃহৎ আমরা ক্ষুদ্র, তিনি অসীম আমরা সীমাবদ্ধ, তিনি অখণ্ড আমরা খণ্ড খণ্ড, তিনি জ্ঞানময় আমরা অজ্ঞান, তিনি অপরিবর্ত্তনীয় আমরা পরিবর্ত্তনীয়, এইরূপ যে যে বিশেষণের দ্বারা সৃষ্ট পদার্থকে উল্লেখ করিতে হয়, তাহার প্রতিযোগী বিশেষণের দ্বারা স্রষ্টাকে উল্লেখ করিতে হয় ইহাতে কাহারো সংশয় নাই। বিশেষণের প্রতি দৃষ্টি করিলে সৃষ্টি ও তাহার অন্তর্গত আমাদের সহিত তাঁহার অনন্ত প্রকার ভেদ, ভেদের সীমা নাই, কিন্তু তত্রাচ কোন অর্থে কোন প্রকারে তাঁহার সহিত সৃষ্টি ও সৃষ্টির অন্তর্গত আমাদের অভেদ বা একত্ব আছে কি না? যদি কোন অর্থে কোন প্রকারে একত্ব না থাকে তবে যখন তিনি একমাত্র সত্য বা সত্ত্ব তাঁহার অতিরিক্ত কিছুই নাই থাকিতে পারেও না—তখন আমরা যে বলিতেছি সত্য বা ঈশ্বর আছেন, এই আমরা কে? আমরা কে হইয়া কাহার বিচার করিয়া কাহাকে নির্ণয় করিতেছি? আমরা সত্য হইতে ভিন্ন মিথ্যা কি সত্যরই স্বরূপ। যদি সৃষ্টি ও তাহার অন্তর্গত আমরা মিথ্যা হই, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান বিচার, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ভক্তি বিশ্বাস, উপাসনা শাস্ত্র, গুরু শিষ্য, মুক্তি বন্ধন সমস্তই মিথ্যা বা ভেল্কি হইবে, যাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিতেছি, সুতরাং তিনিও মিথ্যা হইবেন, কারণ তাহাও সেই মিথ্যারূপী আমাদেরই বোধ মাত্র। আমরা একমুখে তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া, আবার সেই মুখে কি প্রকারে, তাঁহার সহিত উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিব, এবং যে দয়া আমাদের ভিতর দেখিতেছি, সেই দয়া তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাহার ভরসায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব?

আমরা পুত্রকন্যারূপী জীব যদি সত্য হই, তবেই বলিতে পারি যে আমাদের মাতা পিতারূপী ঈশ্বর সত্য আছেন, এবং তাঁহার সত্য উপাসনার দ্বারা সত্য ফল যে সত্য আনন্দ তাহা সত্যই লাভ করিতে পারিব। তিনি স্বরূপতঃ আমাদের সহিত এক হইলেও মাতা পিতারূপে সৃষ্টিতে প্রকাশ পাইতেছেন, আমরাও বস্তুপক্ষে তাঁহার সহিত এক হইলেও পুত্রকন্যারূপে সৃষ্টিতে প্রকাশ পাইতেছি, এই প্রকাশকে মিথ্যা বোধে ত্যাগ করিলে সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়, কারণ প্রকাশই সমস্ত বোধাবোধের মূল। প্রকাশই বস্তু বা সত্তার অস্তিত্বের সাক্ষাৎ আবির্ভাব। প্রকাশে বা সৃষ্টি ও তাহার অন্তর্গত আমরা বস্তু বা সত্তার সহিত অভিন্ন ভাবে সত্য ভিন্ন ভাবে মিথ্যা—ভাবনায় মিথ্যা বস্তুতে সত্য, বস্তু বা সত্তা ত্যাগ করিয়া নাম রূপ গুণ ক্রিয়া পৃথক ধরিলে তাহা অবস্তু মিথ্যা, আর বস্তু বা সত্তারই নাম রূপ গুণ ক্রিয়া এই দৃষ্টিতে সমস্তই সত্য।

যিনি বা যাহা আছেন তিনি বা তাহাই এক অদ্বিতীয় সত্য যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা সত্য তাহা সর্ব্বকালে সকলের নিকট সত্য, যাহা মিথ্যা তাহা সর্ব্বকালে সকলের নিকট মিথ্যা, যাহা সত্য তাহা বস্তুতেও সত্য প্রকাশেও সত্য; যাহা নামরূপাত্মক প্রকাশে সত্য তাহাই বস্তুতেও সত্য, যাহা মিথ্যা অর্থাৎ নাই তাহা নামরূপাত্মক প্রকাশেও নাই নামরূপের অতীত বস্তুতেও নাই। সত্য সর্ব্বকালে এক থাকিয়াও অনন্ত শক্তি সংযোগে অনন্ত রূপে প্রকাশমান, এজন্য তাঁহাতে ব্যষ্টিভাবে অনন্ত বৈচিত্র্য ভেদ বোধ হয়, সে বোধ হওয়া সত্তেও সমস্ত চরাচর নামরূপকে লইয়া তিনি অখণ্ডাকার যাহা

তাহাই। বস্তুপক্ষে তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, গুণ ক্রিয়া দৃষ্টিতে তাঁহাতেই পরিবর্ত্তন ভাসিতেছে, পরিবর্ত্তন ভাসা সত্ত্বেও তিনি যাহা তাহাই অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সর্ব্বকালে নামরূপের অতীত থাকিয়াও নামরূপ ভাবে প্রকাশমান। মিথ্যার নামরূপ ভাসিতেই পারে না সত্যেরই নামরূপ ভাসা সম্ভব, আর তাহাই যদি হয়, তবে যখন তিনি স্বয়ং প্রকাশমান যাহা তাহাই তখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য মতামতের প্রয়োজন কি।

যদি কেহ বলেন পরমাত্মার অতিরিক্ত দ্বিতীয় সত্য ছিল যাহা হইতে তিনি এই সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে পরমাত্মা এক সত্য, তাঁহার অতিরিক্ত অপর এক সত্য এ দুয়ের মধ্যে যে ভেদ তাহা কি তৃতীয় অপর এক সত্য? আবার এই তিনের মধ্যে ব্যবচ্ছেদক আর এক সত্য, এরূপ হইলে অনন্ত সত্যের প্রয়োজন কি না? এবং তাহা হইলে পরমাত্মার পূর্ণত্ব কিরূপে রক্ষা হয়। যদি সৃষ্টি কর্ত্তা এক সত্য ও সৃষ্টির উপাদান অপর এক সত্য স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে এই দুয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বা অস্তিত্ব কোথায়? আমরা কিরূপে এই দুই সত্য উপলব্ধি করিতেছি, তাহাদের রূপের কি প্রভেদ বোধ হইতেছে? যদ্যপি সৃষ্ট জীব অনন্ত কাল তাঁহা হইতে ভিন্নই হন এবং কোন কালে কোন ভাবে তাঁহার সহিত এক না হন, তবে উপাসনার কি ফল? উপাসনার পূর্ব্বে যে অপূর্ণতার কষ্ট উপাসনার পরেও চিরকালই তাহা থাকিবে কি না, আর যদি থাকিয়া যায়, উপাসনায় কি ফল হইবে? চিরকালই অভাব, চিরকালই অভাব মোচনের চেষ্টা, এবং চিরকালই সেই নিমিত্ত দুঃখ, এরূপ গতি যথার্থ হইলে ভয়াবহ কি না?

ধর্ম্মসাধনের ফলে কেহ বলেন মুক্তি হইবে, কেহ বলেন পরিত্রাণ হইবে, কেহ বলে নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইবে, কেহ বলেন কৈবল্য লাভ হইবে, কেহ বলেন অনন্ত উন্নতি হইবে, কেহ বলেন ঈশ্বরের দর্শন লাভ হইবে, ইত্যাদি নানা ধর্ম্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধারণানুযায়ী সৃষ্টির পরিণাম বা জীবের গতি সম্বন্ধে এক একটী ভাব প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু জিজ্ঞাসার বিষয় এখানে এই যে মুক্তি আদি যে হইবে তাহা কাহার হইবে? মিথ্যার না সত্যের? আর কে কাহাকে মুক্তি দিবেন, সত্য মিথ্যাকে মুক্তি দিবেন, কি মিথ্যা সত্যকে মুক্তি দিবেন, অথবা সত্যকেই সত্য মুক্তি দিবেন? কিন্তু এখানে বিচার পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে যে মিথ্যা অবস্তু, তাহার মুক্তি বন্ধন হইতেই পারে না—অসম্ভব। আর এক সত্য ব্যতীত যখন দ্বিতীয় সত্য নাই তখন কোন্ সত্য কোন্ সত্যকে মুক্তি দিবেন? সত্য অপ্রকাশ না প্রকাশ, অথবা প্রকাশ অপ্রকাশকে লইয়া পূর্ণ? মুক্তি অপ্রকাশের হইবে না প্রকাশের হইবে? প্রকাশ অপ্রকাশকে মুক্তি দিবেন কি অপ্রকাশ প্রকাশকে মুক্তি দিবেন? যদি অপ্রকাশ প্রকাশের মুক্তি দেন বা প্রকাশ অপ্রকাশের মুক্তি দেন, তবে এই মুক্তি দেওয়া বা হওয়া কে বুঝিবে? অপ্রকাশ বুঝিবে কি প্রকাশ বুঝিবে? সুষুপ্তি অপ্রকাশ অবস্থায় জীব মুক্ত হইবে বা মুক্তি বোধ করিবে কি প্রকাশ জাগ্রত অবস্থায় মুক্ত হইবে বা মুক্তি বোধ করিবে? জ্ঞানময় হইয়া মুক্তি বোধ করিবে, কি জ্ঞানাতীত হইয়া মুক্তি বোধ করিবে? সত্য যখন সর্ব্বকালে পূর্ণ তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তাহাতে নানা নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ভাসা সত্ত্বেও তাহা অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য এক, তখন তাহার মুক্তি বা উন্নতি কিরূপে সম্ভবে? আর এই মুক্তি আদি কি বস্তু? ইহা কি সত্যের

অন্তর্গত সত্যেরই নাম অথবা সত্যের অতিরিক্ত মুক্তি আদি নামা কোন বস্তু আছে, যাহা লাভ করা জীবের প্রয়োজন, যদি তাহা হয় তবে সে বস্তু কি ও কিরূপে কোথায় আছেন? সম্যক দৃষ্টির অভাবে অর্থাৎ তাবৎ পদার্থ পূর্ণরূপে না দেখিবার জন্য অজ্ঞান বশতঃ ব্যষ্টিতে বন্ধন মুক্তি ভাসিতেছে কি না? এবং সম্যক দৃষ্টি হইলে অর্থাৎ পূর্ণভাব প্রকাশ হইলে বন্ধন-মুক্তি-জনিত তাবৎ সংশয় লয় হয় কি না? সম্যক দর্শন শক্তির অর্থাৎ বস্তুর সমগ্র ভাব এক দৃষ্টিতে দেখিবার যে শক্তি তাহার অভাব অর্থাৎ অপূর্ণতাই বন্ধন মুক্তি ভেদাভেদের হেতু কি না? যাঁহারা জগতের অতীত ব্রহ্ম স্বীকার না করেন তাঁহারা একদেশদর্শী কি না ও যাঁহারা জগৎকে ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে বহিষ্কৃত করেন তাঁহারাও একদেশদর্শী কি না? এতদুভয়ের কাহারো পূর্ণভাবে উপাসনা হইতেছে কি না? তাঁহাকে জগৎ ও জগতের অতীত জানিয়া সমস্ত মতামত ও সংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাপ্তির যে আকাঙ্ক্ষা ও তাঁহার নিয়মানুযায়ী যাহার দ্বারা যে কার্য্য হইবার, তাহার দ্বারা সেই কার্য্য ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক করা ও করানই তাঁহার পূর্ণভাবে উপাসনা কি না?

বিচার পূর্ব্বক এ বিষয়ে, প্রত্যেকেই যাহা সত্য তাহা বুঝিয়া ধারণ করুন ইহাই প্রার্থনীয়।

হে পরমাত্মা, আপনার বিচিত্র মহিমা বা ভাব অর্থাৎ আপনি সত্য কি মিথ্যা, দ্বৈত কি অদ্বৈত কে কাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, আপনি না বুঝাইলে আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই। আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ নিজেকে স্বাধীন মনে করিতেছি, বুঝিতেছি না যে আপনি আমাদের জ্ঞানের একমাত্র নিয়ামক, এবং মহতী শক্তি রূপে প্রকাশিত হইয়া আপনি আমাদিগকে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা শিশুকালে যাহাকে সত্য বলিয়া ধারণ করি যৌবনে তাহাকে অসত্য বলিয়া বোধ হয়, যৌবনে যাহাকে সত্য বলিয়া প্রীতি করি বার্দ্ধক্যে তাহা ছাড়িয়া যায়, আমাদিগকে যখন যেরূপ বুঝান আমরা তখন সেইরূপ বুঝি। হে মাতা পিতা, আপনি যখন আমাদের সুষুপ্তির অবস্থা ঘটান, তখন আমাদের কোন বোধাবোধ থাকে না যে আমি আছি বা আমার সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর আছেন বা আমার অতিরিক্ত আর কিছু আছে, স্বপ্নের সময় স্বপ্নকে সত্য বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না, এবং একজন অন্য জনের স্বপ্নের ভাব বুঝিতে পারে না, কিন্তু আপনি সকলি জানিতেছেন, আপনি যখন অজ্ঞানরূপী স্বপ্ন লয় করিয়া জ্ঞানরূপী জাগরণ ঘটাইবেন তখনই সকলের সকল বিবাদ ভঞ্জন হইয়া জগতে শান্তি স্থাপনা হইবে।

হে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা আপনাকে বারংবার পূর্ণরূপে নমস্কার বা প্রণাম করি, আপনার পূর্ণরূপে জয় হউক, আপনার জয় হইলেই সকলের জয় কেন না আপনাকে ত্যাগ করিয়া কেহই নাই। হে শান্তিময়, আপনি সর্ব্বকালে শান্তিরূপ আছেন, কৃপা করিয়া নর নারী জীব মাত্রের শান্তি বিধান করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

এই পতিত দুঃখদগ্ধ বর্ত্তমান ভারতের সহিত অতীত মহিমান্বিত ব্রহ্মজ্ঞানোজ্জ্বল ভারতভূমির সম্বন্ধবন্ধন যাঁহাকে দেখিলে

স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়, যিনি জ্ঞানে কর্ম্মে ধর্ম্মে জীবনে বিশ্বের মঙ্গলব্রতে চির-দীক্ষিত, যিনি জড় শরীরের মধ্যে থাকিয়া ঐশ্বর্য্যের উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত হইয়াও বিষয়-বাসনা হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্তর্গত সুদৃঢ় বৈরাগ্যের সহিত প্রিয়তম পরমাত্মায় নিত্য যুক্ত রহিয়াছেন,

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি'

এই মহাতত্ত্ব যিনি কঠোর তপস্যায় জীবনে প্রাপ্ত হইয়া সীমাহীন সুখসাগরে মগ্ন হইয়া আছেন, যিনি পুণ্যকীর্ত্তি, পুণ্যজ্যোতিঃ, পুণ্যবাণী এবং পুণ্যজীবনের দ্বারা জগতে পুণ্যের জয়ঘোষণা করিতেছেন, যাঁহার পুণ্যেচ্ছা, পুণ্যপ্রভাব, পুণ্য উপদেশ পাষণ্ডের প্রাণেও ভগবৎপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দেয়, সেই পুণ্যনামা পূজ্যপাদ মহাপুরুষ শ্রীমন্মহর্ষিদেবেরই পুণ্য উপদেশের ভাষ্যরূপে বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করা হইতেছে। ভগবানের অমোঘ কৃপা ও সেই ব্রহ্মপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষের শুভাশীর্ব্বাদ আমার সহায় হউক! আমাকে বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিবার মত শক্তি দান করুক্।

এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডলোকে জীবপ্রবাহ সুখেরই অনুসন্ধানে দিক্‌দিগন্তে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। মনুষ্য একমাত্র সুখেরই অভিলাষ হৃদয়ে লইয়া স্বদেশে বিদেশে সদয় নির্দ্দয় কঠোর নিষ্ঠুর বিচিত্র কর্ম্মের সাধনে শ্রান্ত ক্লান্ত হইতেছে। সুখতৃষ্ণা এ পথে ও পথে সুপথে কুপথে মনুষ্যকে নাসিকায় রজ্জু বাঁধিয়া চারিদিকে ঘুরাইতেছে—মনুষ্য দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই তৃষ্ণার আকর্ষণে সর্ব্বদা মরীচিকার ব্যর্থ অনুসরণে অকারণ উদ্যম এবং শক্তির অপচয় করিয়া বিকলেন্দ্রিয়—অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু হায়! সংসারের সামগ্রীসম্ভার কখনো মনুষ্যকে প্রকৃত সুখের শোভন শ্রীতে সমুদ্ভাসিত করিতে পারে না, একথা আমরা ভুলিয়া গিয়া কি কঠিন দুর্ভোগ অঙ্গীকার করিতেছি।

যাহার গৃহদ্বার হস্তি অশ্ব রথে সুসজ্জিত, যাহার ভবনপ্রাঙ্গণ ধবল মর্ম্মরে মণিখচিত রত্নস্তম্ভে পরিশোভিত, অগণ্য ভোগ্য বিষয় যাহার ইঙ্গিতে অঙ্কগত হয় তাহার অন্তঃস্থলের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায়, একের অভাবে সেখানে গ্লানিময় উদ্বেগের—অশান্তির প্রলোভনের বন্যা প্রবল বেগে ছুটিতেছে। চারিদিকে চাহিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, ধন ধান্যে রত্ন মণি মাণিক্যে কোষাগার পূর্ণ করিয়াও ধনিকুল অতৃপ্ত তৃষ্ণায় ব্যাকুলভাবে দেশ দেশান্তে সমুদ্রপারে আপনাদের বাণিজ্যতরণী ছুটাইয়া চলিয়াছে। ছলে কলকৌশলে দেশবিদেশের শত শত সম্মানিত রাজমস্তকের কনককিরীটের উজ্জ্বল রত্নে পাদপীঠ সমালোকিত করিয়াও চক্রবর্ত্তী নৃপতির অন্তরে অহর্নিশ আকাঙ্ক্ষার বিশ্বগ্রাসিনী অনলশিখা প্রজ্বলিত হইতেছে, আর লক্ষ লক্ষ নরনারী পতঙ্গের ন্যায় তাহাতে অকালে প্রাণাহুতি দান করিতেছে; কিন্তু সুখ কোথায়? সুখতৃষ্ণার বিরতি কোন্‌খানে? সংসারের শত শত জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় পুরুষ-পরম্পরায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়াও জ্ঞানাভিমানী কেহ কখনো শাশ্বত সুখের মধুর স্পর্শ লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহাতে কি স্পষ্টতঃ প্রমাণ হইতেছে না যে, সংসার স্বতন্ত্রভাবে কোন অবস্থাতেই আমাদিগকে প্রকৃত সুখ দান করিতে সমর্থ নহে? জড় দ্রব্যরাশি কখনই মানবাত্মার সুখ বিধান করিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের বিশ্বপ্রেমিক আর্য্য পিতামহগণ

সুখের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন, এবং সেই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া আধিব্যাধি-সমাকুল দুঃখ-মগ্ন বিশ্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সহজ ভাষায় জ্বলন্তভাবে বলেন,

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি,
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।'

যিনি ভূমা, যিনি মহান্ তিনিই সুখ, তিনিই সুখস্বরূপ; অল্প বস্তুতে—ক্ষুদ্র সংসারসামগ্রীসম্ভারে সুখ নাই। ভূমা পরমেশ্বরই সুখ, সেই ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা কর।

সংসার-নাট্যশালার যে লোচনরোচন দৃশ্যরাশি আজি আমার নয়নে প্রাণে সুধা-ধারা ঢালিয়া দিতেছে, তাহা কয় দিনের এবং কতটুকু? আজি যে মধুর কোমল ধ্বনি কর্ণকুহরকে অমৃত বর্ষণে সিক্ত করিতেছে, সময়ে তাহাই নিতান্ত কর্ণজ্বর উৎপাদন করিবে না, কে বলিতে পারে? যে রসের আস্বাদনে রসনেন্দ্রিয় চরিতার্থ হইয়া যায়, অল্পক্ষণ পরেই রসনা তাহা হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আইসে ইহা কি অত্যুক্তি? মন্দ মলয়ানিলের সুখ সংস্পর্শ সকল সময়েই কি আমাদের চর্ম্মের স্নায়ু-জালকে আন্দোলিত করিয়া আনন্দ দান করে? সংসারের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে ক্ষণিক সুখ দান করে মাত্র, কিন্তু সেই সুখভোগেও কাহার কিছু মাত্র স্বাধীনতা নাই, বিবিধ রসাল ভোজ্য-রাশি রসনেন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করে, কিন্তু কঠিন অসাধ্য অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইলেই রসনা সে তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার অন্যথা করিলে রসনার সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিনাশের প্রতি ধাবিত হয়। সুমধুর সঙ্গীতরসে প্রায় সকলেরই একান্ত অনুরাগ, কিন্তু শ্রবণযুগলের স্নায়ুজাল শ্লথ ও বিশ্লিষ্ট হইলেই সে অনুরাগ চিরকালের জন্য ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় দগ্ধ হইতে থাকে, শত কারণে দর্শনেন্দ্রিয় শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং সংসারের চঞ্চল দৃশ্যরাশি চঞ্চল সুখ সঞ্চারিত করিয়াও তাহাকে আর ক্ষণিক তৃপ্তি দান করিতে পারে না। বলদৃপ্ত উদ্ধত সৈনিকের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি মাত্র বিচ্ছিন্ন বা অকর্ম্মণ্য হইলেই জন্মের মত তাহার সমরসাধ চূর্ণ হইয়া যায়।

'তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাশি
তদ্ব্রহ্ম চিন্তয় কিমেভিরসাদ্বিকল্পৈঃ।
যস্যানুষঙ্গিনইমে ভুবনাধিপত্য
ভোগাদয়ঃ কৃপণলোকমতা ভবন্তি ॥'

অতএব হে চিত্ত! ক্ষুদ্র দীনগণের অভিমত এই ভোগৈশ্বর্য্যাদি ও ভুবনাধিপত্য যাঁহার অধীন হইয়া রহিয়াছে, সেই জরা-মরণহীন প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা কর। এই সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর কল্পনায় কি হইবে?

অপূর্ণ সংসারের অপূর্ণ সামগ্রীসম্ভারের কোনটাতেই আমরা যথার্থ সুখ পাই না, তজ্জন্যই নিত্য নূতনের আকর্ষণ আমাদি-গকে বিব্রত করিয়া তুলে। ক্রমশ এটা ওটা করিয়া যখন সমস্ত শক্তি—সমগ্র চেষ্টা—জীবনব্যাপী উদ্যম অবস্তুতে—অ-কার্য্যে—অযোগ্য বিষয়ে নিঃশেষ হইয়া যায়, যখন ভোগ্য বিষয় ভোগ করিবার অ-ধিকার থাকে না, এবং যাহা করা হইয়াছে তাহার জ্বালা আর কালিমা সমস্ত অন্তঃকর-ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন নৈরাশ্য-দগ্ধ পরমার্থহীন মানব পরকালের চিন্তায় একান্ত ক্লিষ্ট হয় ও মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত অধীর ও ভীত হইয়া উঠে। কিন্তু পরমার্থবান্ মহাপুরুষ তারুণ্যে, বার্দ্ধক্যে, ভোগে, অভাবে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে, হর্ম্ম্যে, অরণ্যে, সজনে নির্জ্জনে, রোগে স্বাস্থ্যে, জীবনে মরণে সকল অবস্থাতেই অবিচলচিত্তে ব্রহ্মা-নন্দ-সুধাসাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন; তাঁহার

সনাতন সুখ শান্তি বিশ্বসংসারের পরিবর্ত্তনশীল দুঃখ শোকের—মানাপমানের চঞ্চল ঘাতপ্রতিঘাতে কখনো খণ্ড হইয়া যায় না; তিনি অন্তরে সেই অবিচ্ছিন্ন পরম সুখ সম্ভোগ করেন, আর ব্রহ্মলোকযাত্রী সুখান্বেষী পথভ্রান্ত পান্থগণকে বলেন,—হে ভ্রান্ত পথিক! বিপথে ছুটিয়া কেন বৃথা ক্লান্ত হইতেছ, ওপথে গেলে কখনো সুখরত্নের সন্ধান পাইবে না।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

যে কোন প্রকারে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া পশুকুলই সুখ লাভ করে। পশুত্ব ইন্দ্রিয়েরই সমষ্টি; সুতরাং ইন্দ্রিয়েরই পরিতর্পণে পশুর পশুত্ব কৃতার্থ হইয়া যায়। পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া মানুষ পাশব সুখের অধিকারী হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার মনুষ্যধর্ম্ম চরিতার্থ হয় না,—হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত রাখিয়া অভিমত ভোগ্য বিষয় সকল অভিলাষানুসারে প্রাপ্ত হইলেও মানবের মানবত্বের প্রজ্ঞাচক্ষু অতৃপ্ত তৃষ্ণায় অধীর হইয়া উদাসভাবে উদার আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ইন্দ্রিয়গণের আপাতসুখকর প্রলোভনসঙ্কুল দুর্ম্মন্ত্রণাজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্ম-বিবেকের সত্যমঙ্গলমন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতে না পারিলে সুখলাভের আশা সম্পূর্ণই নিষ্ফল হইয়া যায়।

গর্ব্বিত উদ্ধত দুষ্টাশয় ধনীর অবিচার—অত্যাচারে কত শত নিরীহ দরিদ্র অকারণে লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত হয়, কি নিদারুণ রূপে দীনহীনগণের মনঃপ্রাণ বিদ্ধ হইতে থাকে, তাহা স্মরণ করিলেও শরীরের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়ে; কিন্তু ধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রাণ মহদাশয়ের গর্ব্বহীন বিভবরাশি নিঃশব্দে সহস্র সহস্র লোকের—দেশের বিচিত্র দুঃখ, দারিদ্র্য অভাব অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নানা মঙ্গলকর্ম্মের দ্বারা সংসারে শান্তিরস সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনন্ত আনন্দলোকযাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করে। সেইরূপ ইন্দ্রিয়েরা কামের অধীনে—কামনার বন্ধনকর মোহমন্ত্রে পরিচালিত হইলেই আপনার এবং পরের দুঃখ ব্যাধি অশান্তি উপদ্রবে সংসারকে দুঃসহ করিয়া তুলে; কিন্তু তাহারাই জীবনসংগ্রামে পরাভূত হইয়া আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার অধীনতা অবলম্বন করিলে পরম সুখের মঙ্গল সমাচার তাহাতে আনিয়া উপস্থিত করিতে থাকে। তখন সানন্দে সপ্রেমে আত্মা ভূমা পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া নিত্যসুখের আস্বাদে তৃপ্ত হইতে থাকে। তখন সংসারের ভোগ্য বিষয় সকলও সেই ভূমা পুরুষেরই আনন্দের সত্তায় সমাচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়,

'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।'

এই ঋষিবাক্য তখন সুখবোধ্য হইয়া উঠে। তখন সাধক সংসারের খণ্ড খণ্ড সুখগুলিকে এক অখণ্ড মঙ্গলসূত্রে গ্রথিত করিয়া নির্ভয়ে মঙ্গলের পথে অনন্ত সুখের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

দুঃখ শোক আধিব্যাধিকে আমরা সংসার হইতে সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিতে পারিব না; কিন্তু সেই ভূমা পুরুষের দ্বারা সমস্তই সমাচ্ছন্ন দেখিয়া সকলই যে তাঁহার অখণ্ড অক্ষয় মহামঙ্গলে পর্য্যবসিত হইতেছে ইহা যথার্থ রূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে সেই খণ্ড খণ্ড দুঃখ শোক আমাদের পরম সুখকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে পারে না। তাঁহা হইতে বিশ্বসংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সংসার শ্মশান হইয়া উঠে; তাহার বিভীষিকা ও সঙ্কট আমাদের দুস্তার্য্য হয়,

বাস্তব সুখ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রজ্ঞাচক্ষু-বলে যখন সৃষ্টির আদ্যন্ত মধ্যে ভূমা পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকায়, জলে, স্থলে, শূন্যে, অরণ্যে, নগরে, সাগরে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি অণু পরমাণুতে তাঁহারই অখণ্ড আনন্দ-লীলা দর্শন করিয়া মানবাত্মা পরম সুখের অমৃত-রসে সিক্ত হইতে থাকে। তখন কর্ণ ভদ্র শ্রবণ করে, চক্ষু ভদ্র দর্শন করে, চিত্ত ভদ্র চিন্তায় ব্যাপৃত হয়। তখন সবল সতেজ ইন্দ্রিয় সেই পরম সুখস্বরূপকে বিষয়ের মধ্যে উপভোগ করিয়া স্তব্ধ মুগ্ধ হইয়া যায়। বহিরিন্দ্রিয়কুল হীনবল হইলে অন্তরিন্দ্রিয় সবলতর হইয়া আত্মাতে অমৃতজ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলে। যখন দুঃখত্রয়ের অভিঘাতে কাতর হইয়া আমরা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টায় ব্যাকুল—যখন শাশ্বত সুখই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উপজীব্য; তখন আমাদের আর মিথ্যা মরীচিকার অনুসরণে সময় এবং শক্তি ক্ষয় করিলে চলিবে না। অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন ঐ আমাদের কালত্রয়ের পূজনীয় সিদ্ধ মহর্ষিগণ সংসার-রঙ্গভূমিতে আমাদের অশান্ত—অসঙ্গত উদ্ভট অভিনয় দর্শনে কৃপাপরায়ণ হইয়া মেঘমন্দ্র শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে দিব্যভাষায় বারবার ডাকিয়া বলিতেছেন—বৎসগণ, পুত্রগণ!

> ‘যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
> ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥’

যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনিই সুখস্বরূপ, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। ভূমাই সুখ, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর!

হে ভূমন্! আমরা সংসারের বিষয়-রাশিতে সুখাশা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রতারিত—লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত হইতেছি। প্রতি নিমেষে আমরা সংসারের নির্দ্দয় ঘাতপ্রতিঘাতে দেখিতেছি তোমাকে বিস্মৃত হইলে সংসার আমাদের নিকট ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, এখানে যথার্থ সুখের কথা আকাশকুসুমের মত অর্থহীন হইয়া পড়ে, কিন্তু হায়! তথাপি ধিক্কৃত অহঙ্কারকে দূরে পরিহার পূর্ব্বক তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া গ্লানিহীন নির্ভয়-সুখের পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। তুমি আত্মদাতা, তুমি বলদাতা, তুমি আমাদিগকে জীবনসংগ্রামে জয়শীল করিয়া আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত হও; আমাদের অন্তরে অটল নিষ্ঠা—অক্ষয় বল সঞ্চারিত করিয়া দাও; যাহাতে মনঃ-প্রাণ-বাক্যে ঐক্য করিয়া সুদৃঢ় গভীর নিষ্ঠার সহিত বলিতে পারি,—ইহ-পরকালের জন্য আত্মার অভ্যন্তরে সুস্পষ্টরূপে—উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি ‘যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।’ অনন্তস্বরূপ! সুখস্বরূপ! মঙ্গলময় তুমি, তুমিই আমাদের ইহ পরকালের গতি, আমাদের পরম সুখের একমাত্র অবলম্বন, এই মহাসত্য আমাদের অন্তরে জাগাইয়া দাও, যাহার প্রভাবে সংসারের খণ্ড ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তোমার অক্ষয় সিংহাসনতলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। হে মঙ্গলবিধাতা! আমার জন্ম এবং জীবনকে এই নিষ্ফলতা হইতে তুমি রক্ষা কর, তুমি আমাকে তোমার সত্য-সুখের পথে—নিত্য কল্যাণের পথে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

নববর্ষের চিন্তা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

এই ভাবটাকে চেষ্টা করিয়া নষ্ট করিতে হইবে, এমন প্রতিজ্ঞা করা কিছু নহে—করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই, হইবেও না। এমন কি, বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রকাণ্ড মূলধন

একজায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতায় ছোটছোট সামর্থ্যগুলিকে বলপূর্ব্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা শ্রেয়স্কর বোধ করি না। ভারতবর্ষের তন্তুবায় যে মরিয়াছে, সে একত্র হইবার ত্রুটিতে নহে—তাহার যন্ত্রের উন্নতির অভাবে। তাঁত যদি ভাল হয় এবং প্রত্যেক তন্তুবায় যদি কাজ করে, অন্ন করিয়া খায়, সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত দারিদ্র্যের ও ঈর্ষার বিষ জানিতে পায় না এবং ম্যাঞ্চেষ্টার তাহার জটিল কলকারখানা লইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে না। একটি শিক্ষিত জাপানী বলেন, "তোমরা বহুব্যয়সাধ্য বিদেশী কল লইয়া বড় কারবার ফাঁদিতে চেষ্টা করিও না। আমরা জার্ম্মাণী হইতে একটা বিশেষ কল আনাইয়া অবশেষে কিছুদিনেই সস্তা কাঠে তাহার সুলভ ও সরল প্রতিকৃতি করিয়া শিল্পিসম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে তাহা প্রচারিত করিয়া দিয়াছি—ইহাতে কাজের উন্নতি হইয়াছে, সকলে আহারও পাইতেছে।" এইরূপে যন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

আমোদ বল, শিক্ষা বল, হিতকর্ম্ম বল, সকলকেই একান্ত জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিলে, কাজেই সম্প্রদায়ের হাতে ধরা দিতে হয়। তাহাতে কর্ম্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এতই বৃহৎ হইয়া উঠে যে মানুষ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় কর্ম্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই—তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপন নহে—মাঝে মাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে বড় দল ছোট দলকে পিষিয়া ফেলে, বড় টাকা ছোট টাকাকে উপবাসে ক্ষীণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মত চোখ বুজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

কাজের উদ্যমকে অপরিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া, কাজগুলাকে প্রকাণ্ড করিয়া, কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া যে অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ উন্মথিত হইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক্। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলার ভিতরে, বাহিরে, চারিদিকে মানুষগুলাকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জ্জনত্বের সহজ অধিকার,—একাকিত্বের আব্রুটুকু থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের সঙ্গ নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্ব্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারো থাকে না।

যাহারা শ্রমজীবী, তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী, তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ, খেলা, নৃত্য, ঘোড়-দৌড়, শিকার, ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মত দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে আবর্ত্তিত করিয়া বেড়ায়। ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে এবং জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপ্‌সা দেখে। যদি একমুহূর্ত্তের জন্য

য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে, তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে, তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে, সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধনরত্নকে ভাঙা-কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সঙ্গত হয় না।

বস্তুত সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাঙ্ক্ষার যে বিকৃতি নাই, এ কথা কে মানিবে? সন্তোষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে যদি কাজে শৈথিল্য আনে, ইহা সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষার দম বাড়িয়া গেলে যে ভূরিভূরি অনাবশ্যক ও নিদারুণ অকাজের সৃষ্টি হইতে থাকে, এ কথা কেন ভুলিব? প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটে, তবে দ্বিতীয়টাতে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য, সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ জন্মে।

অতএব সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা, এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। ইহাতে প্রতিযোগিতা চক্‌মকির ঠোকাঠুকিশব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধ নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও স্ফুলিঙ্গকে এই ধ্রুবজ্যোতির চেয়ে মূল্যবান্ মনে করা বর্ব্বরতামাত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিদ্যালয় হইতেও যদি সে বর্ব্বরতা প্রসূত হয়, তবু তাহা বর্ব্বরতা।

ক্রমশঃ

স্বভাব ও সঙ্গীত।

শারদি পূর্ণিমার অমল-কিরণ-বিধৌত নৈশ নীলাকাশ দিগন্তকে আলিঙ্গন করিতে করিতে চলিয়াছে; সম্মুখদেশে পুণ্যসলিলা সুরধুনী, কলকল তানে যেন "দেহিপদপল্লবমুদারম্" গাহিতে গাহিতে সুদূর দিগন্ত পথে অগ্রসর হইয়াছে, কৌমুদী-বসন-পরিহিতা প্রকৃতিদেবী, সেই পূত জাহ্নবীর অমল সলিলে অবগাহন করিয়া, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষের মহাপূজায় নিযুক্তা; নৈশ সমীরণ জীবের কর্ণে বিশ্বনাথের অপার করুণার গীত গাহিতে গাহিতে অসীমের অনন্ত ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। অনতিদূরে গঙ্গার অপর তীরে জগতের সাম্যসংস্থাপক মহাশ্মশান। একদিকে সহস্রজিহ্ব হুতাশনের প্রচণ্ড অনলমুখে একটী মানবজীবনের ক্ষণবিধ্বংসী ভবলীলার অনন্ত পর্য্যবসান, ও অপর দিকে মাদকসেবী শববাহক ও দাহকবর্গের কর্ণভেদী উল্লাস-কোলাহল যেন পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান কালীন বকরূপী ধর্ম্মের সেই "কিমাশ্চর্য্যং" প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া জগতকে বৈরাগ্যের পথে আকর্ষণ করিতেছে; কর্ম্মক্ষেত্রের কোলাহল নীরবতার ক্রোড়ে বিলীন; আমিই কেবলমাত্র একাকী জাহ্নবীর পবিত্র পুলিনে উপবেশন করিয়া নদীর তরঙ্গ সনে শশু সহস্র খণ্ডচন্দ্রমার কেলিচাতুর্য্য, ও শ্মশানের সেই রহস্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করিতেছি, এমন সময় দূরস্থ একখানি নৌকা-নিঃসৃত গানের একটী স্বরলহরী সেই পৌর্ণমাসী যামিনীর জ্যোৎস্নাসাগরকে তরঙ্গায়িত করিয়া, সুদূর আকাশ ভাসাইয়া ছুটিল। গানের বাক্যাবলী শ্রুত হইতেছে না, কিন্তু তাহার সেই তরঙ্গায়িত মধুরিমার অন্তরালে ভবিষ্যতের শত শত স্বপ্নময়ী আশা, ও অতীতের সহস্র সহস্র সুখময়ী স্মৃতি, যেন

একজায়গায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাঁহার আওতায় ছোটছোট সামর্থ্যগুলিকে বলপূর্ব্বক নিষ্ফল করিয়া তোলা শ্রেয়স্কর বোধ করি না। ভারতবর্ষের তন্তুবায় যে মরিয়াছে, সে একত্র হইবার ত্রুটিতে নহে—তাহার যন্ত্রের উন্নতির অভাবে। তাঁত যদি ভাল হয় এবং প্রত্যেক তন্তুবায় যদি কাজ করে, অন্ন করিয়া খায়, সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত দারিদ্র্যের ও ঈর্ষার বিষ জানিতে পায় না এবং ম্যাঞ্চেষ্টার তাহার জটিল কলকারখানা লইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে না। একটি শিক্ষিত জাপানী বলেন, "তোমরা বহুব্যয়সাধ্য বিদেশী কল লইয়া বড় কারবার ফাঁদিতে চেষ্টা করিও না। আমরা জার্ম্মাণী হইতে একটা বিশেষ কল আনাইয়া অবশেষে কিছুদিনেই সস্তা কাঠে তাহার সুলভ ও সরল প্রতিকৃতি করিয়া শিল্পিসম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে তাহা প্রচারিত করিয়া দিয়াছি—ইহাতে কাজের উন্নতি হইয়াছে, সকলে আহারও পাইতেছে।" এইরূপে যন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

আমোদ বল, শিক্ষা বল, হিতকর্ম্ম বল, সকলকেই একান্ত জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিলে, কাজেই সম্প্রদায়ের হাতে ধরা দিতে হয়। তাহাতে কর্ম্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এতই বৃহৎ হইয়া উঠে যে মানুষ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় কর্ম্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই—তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপন নহে—মাঝেমাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে বড় দল ছোট দলকে পিষিয়া ফেলে, বড় টাকা ছোট টাকাকে উপবাসে ক্ষীণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মত চোখ বুজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

কাজের উদ্যমকে অপরিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া, কাজগুলাকে প্রকাণ্ড করিয়া, কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া যে অশান্তি ও অসন্তোষের বিষ উন্মথিত হইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক্। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলার ভিতরে, বাহিরে, চারিদিকে মানুষগুলাকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জ্জনত্বের সহজ অধিকার,—একাকিত্বের আব্রুটুকু থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের সঙ্গ নিজের কাছে অত্যন্ত অনভ্যস্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ খাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপূর্ব্বক নিজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীরব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারো থাকে না।

যাহারা শ্রমজীবী, তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী, তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ, খেলা, নৃত্য, ঘোড়-দৌড়, শিকার, ভ্রমণের ঝড়ের মুখে শুষ্কপত্রের মত দিনরাত্রি তাহারা নিজেকে আবর্ত্তিত করিয়া বেড়ায়। ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে এবং জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপ্‌সা দেখে। যদি একমুহূর্ত্তের জন্য

য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে, তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে, তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে, সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধনরত্নকে ভাঙা-কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সঙ্গত হয় না।

বস্তুত সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাঙ্ক্ষার যে বিকৃতি নাই, এ কথা কে মানিবে? সন্তোষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে যদি কাজে শৈথিল্য আনে, ইহা সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষার দম বাড়িয়া গেলে যে ভূরিভূরি অনাবশ্যক ও নিদারুণ অকাজের সৃষ্টি হইতে থাকে, এ কথা কেন ভুলিব? প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটে, তবে দ্বিতীয়টাতে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য, সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ জন্মে।

অতএব সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা, এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। ইহাতে প্রতিযোগিতা চক্‌মকির ঠোকাঠুকিশব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধ নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও স্ফুলিঙ্গকে এই ধ্রুবজ্যোতির চেয়ে মূল্যবান্ মনে করা বর্ব্বরতামাত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিদ্যালয় হইতেও যদি সে বর্ব্বরতা প্রসূত হয়, তবু তাহা বর্ব্বরতা।

ক্রমশঃ

স্বভাব ও সঙ্গীত।

শারদি পূর্ণিমার অমল-কিরণ-বিধৌত নৈশ নীলাকাশ দিগন্তকে আলিঙ্গন করিতে করিতে চলিয়াছে; সম্মুখদেশে পুণ্যসলিলা সুরধুনী, কলকল তানে যেন "দেহিপদপল্লবমুদারম্" গাহিতে গাহিতে সুদূর দিগন্ত পথে অগ্রসর হইয়াছে, কৌমুদী-বসন-পরিহিতা প্রকৃতিদেবী, সেই পূত জাহ্নবীর অমল সলিলে অবগাহন করিয়া, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষের মহাপূজায় নিযুক্তা; নৈশ সমীরণ জীবের কর্ণে বিশ্বনাথের অপার করুণার গীত গাহিতে গাহিতে অসীমের অনন্ত ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। অনতিদূরে গঙ্গার অপর তীরে জগতের সাম্যসংস্থাপক মহাশ্মশান। একদিকে সহস্রজিহ্ব হুতাশনের প্রচণ্ড অনলমুখে একটী মানবজীবনের ক্ষণবিধ্বংসী ভবলীলার অনন্ত পর্য্যবসান, ও অপর দিকে মাদকসেবী শববাহক ও দাহকবর্গের কর্ণভেদী উল্লাস-কোলাহল যেন পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান কালীন বকরূপী ধর্ম্মের সেই "কিমাশ্চর্য্যং" প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া জগতকে বৈরাগ্যের পথে আকর্ষণ করিতেছে; কর্ম্মক্ষেত্রের কোলাহল নীরবতার ক্রোড়ে বিলীন; আমিই কেবলমাত্র একাকী জাহ্নবীর পবিত্র পুলিনে উপবেশন করিয়া নদীর তরঙ্গ সনে শত সহস্র খণ্ডচন্দ্রমার কেলিচাতুর্য্য, ও শ্মশানের সেই রহস্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করিতেছি, এমন সময় দূরস্থ একখানি নৌকা-নিঃসৃত গানের একটী স্বরলহরী সেই পৌর্ণমাসী যামিনীর জ্যোৎস্নাসাগরকে তরঙ্গায়িত করিয়া, সুদূর আকাশ ভাসাইয়া ছুটিল। গানের বাক্যাবলী শ্রুত হইতেছে না, কিন্তু তাহার সেই তরঙ্গায়িত মধুরিমার অন্তরালে ভবিষ্যতের শত শত স্বপ্নময়ী আশা, ও অতীতের সহস্র সহস্র দুখময়ী স্মৃতি, যেন

কি এক মহান গাম্ভীর্য্যের অনন্ত পবিত্রতার সহিত বিমিশ্রিত, লীলায়িত ও আলিঙ্গিত ভাবে বিরাজমান থাকিয়া হৃদয়কে এক অ-ব্যক্ত, অশ্রুত ও অখণ্ড মহাভাবের সাগর-সঙ্গমে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এ অনু-ভূতির অভিব্যক্তি নাই; গভীর নিশীথে সঙ্গীতের সুললিত তান যাহার কর্ণকুহরে সুধাসিঞ্চন করিয়াছে, তিনিই জানেন, সেই তান কত মধুর! কত গম্ভীর! কত প্রাণ-স্পর্শী! এই জ্বালাময় সংসারে সঙ্গীত ভাল বাসে না কে? সঙ্গীত যাহার হৃদয়ে আন-ন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারে না, সে পশুনামের উপযুক্ত পাত্র। কবি বলিয়াছেন,

"সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ,
সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।"

প্রাচ্য সাহিত্য জগতের অমর কবি সেক্স-পিয়র বলিয়াছেন,

He who does not know music,
Nor is moved by the concord of sweet sound
Is fit for treason."

বাস্তবিক সঙ্গীতের মত পবিত্র জিনিস আর নাই। ভগবানের অনন্ত মহিমা, ও প্রেম ঘোষণা করিবার জন্যই সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। আহার্য্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা যে-মন কেবল মাত্র উদরপূর্ত্তি ও রসনেন্দ্রিয়ের পরিতর্পণে পর্য্যবসিত না হইয়া, উহা যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক বলবিধান কল্পে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ গান শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন জন্য নহে, উহার অমৃতময় প্রভাবে অতিবড় হস্তিমূর্খের অমা-র্জ্জিত কর্কশ হৃদয়ও সংযত ও সুনিয়মিত হইয়া দয়া, ঔদার্য্য, সারল্য ও সহানুভূতি-গুণে সমলঙ্কৃত হইয়া থাকে। সঙ্গীতে অনভ্যস্ত ছিল বলিয়াই প্রাচীন খ্রীষ্টীয়গণের মর্ম্মন্তুদ বর্ব্বর কাহিনী, আজও জগতের ইতিহাসের কতিপয় অধ্যায়কে কলঙ্কিত করিয়া মানবের ভীতি উৎপাদন করিতেছে। সঙ্গীত মনুষ্য-ত্বের জনক, শান্তির জননী, ভাবের জন্মক্ষেত্র, প্রেমের লীলানিকেতন। মায়াবিনী আশার অঞ্চল-দশা-পরিবদ্ধ বাসনা-ক্লিষ্ট মানব এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রামের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবর্ত্তে পরিত্রায়িত হইয়া যতই অবসন্ন ও পরিম্লান হইয়া পড়ুক না কেন, সঙ্গীত মৃতসঞ্জীবনী-রূপে তাহার সেই তাপদগ্ধ আধিক্লিষ্ট জীবনে ক্ষণকালের জন্যও শান্তির অমৃতরেখা অঙ্কিত করিবেই করিবে। তাই একদিন শ্রীচৈত-ন্যের হরিনামগানের প্রমাথী মত্ততায় সমগ্র বঙ্গের পাপজীর্ণ দুর্ব্বল হৃদয়, ভক্তির বৈদ্যু-তিক অণুপ্রাণনায় নাচিয়া উঠিয়াছিল। তাই একদিন সংসার-বিরাগী বৈজবাওয়ার সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতের সুমোহন তানে বনের সিংহ ব্যাঘ্রও হিংসা-বৃত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিত। আমাদের বেদচতুষ্টয়ও বুঝি সেই জন্যই সঙ্গীতের মধুময় ঝঙ্কারে চির মুখরিত। যদি সঙ্গীতের বিক্রম প্রবলই না হইবে, তবে শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান বহিবে কেন? গুরুগোবিন্দের ভেরীনিনাদে পঞ্জাবের আ-দ্যন্ত ধর্ম্মভাবে কাঁপিয়া উঠিবে কেন? শিবাজীর বংশিধ্বনিতে এক একবারে শত শত মহারাষ্ট্র সেনা প্রচণ্ড সমরানলে হাসিতে হাসিতে জীবনাহুতি প্রদান করিবে কেন? জগতের প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই, ধর্ম্মো-পদেশের সহিত সঙ্গীতের এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যেখানে শত শত উপদেশ বাক্য তরঙ্গ-চালিত তৃণ-গুচ্ছের ন্যায় বিফলতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সেখানে সেই সকল উপদেশ বাক্য সঙ্গীতের সূত্রে গ্রথিত করিয়া গান কর, দেখিবে, ইন্দ্রজালের ন্যায় তোমার উদ্দেশ্য সকল পরিণতির পথে অগ্রসর হই-য়াছে। তাই মহানুভব দার্ব্বীন (Darwin) বলিয়াছেন,—

"We can concentrate in a single song a greater intensity of feeling than in pages of writing."

সঙ্গীতময় বাক্য মানব হৃদয়ে অধিকতর বিক্রম সংগ্রহ করিয়া বসে কেন, ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, * স্বর ও অর্থযুক্ত বাক্য মানবের সহজাত জ্ঞানের উপর কার্য্য করিয়া থাকে, এবং সুস্বরবিশিষ্ট অর্থযুক্ত বাক্য অর্থাৎ সঙ্গীতের কার্য্যকারিতা, মানুষের ভাবের উপর প্রকাশ পাইয়া থাকে। এক কথায় সঙ্গীত ভাবের শব্দময় নিদর্শন মাত্র। ভাবের ফলে হৃদয়ে উদ্বোধনের সঞ্চার হয়, উদ্বোধন তন্ময়তা আনয়ন করে, উপদেশ বাক্য সকল তন্ময়তা ও একতানতার সহিত মিশ্রিত হইলেই ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। সেই জন্যই ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা ধর্ম্মসঙ্গীত, ভক্তির উন্মেষণ বিষয়ে প্রধান সহায় ও অবলম্বন। এই জন্যই জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে উপাসনার প্রবর্ত্তনা। জগদীশ্বরের অনন্ত প্রেম ও মহিমা ঘোষণা করিবার জন্য গানের আবশ্যকতা, এই মহাসত্য যদি প্রথমে ধর্ম্মপ্রচারকগণের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে যে এতদিন ধর্ম্মের নাম বিস্মৃতির অন্ধকার-গর্ভে ডুবিয়া যাইত না, তাহা কে বলিতে পারে?

সঙ্গীত কি? সঙ্গীতের জন্মস্থান কোথায়? সঙ্গীত আর কিছুই নহে, উহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বরের একীভূত সমষ্টিমাত্র। স্বরের উৎপত্তি ভাব হইতে; স্বরের আবরণে ভাব লুকায়িত থাকে; প্রথমে মানসিক উত্তেজনা হইতে ভাবের আবির্ভাব হয়, মনোমধ্যে ভাবের উদয় হইলে, তাহার ফলে আমাদের পেশী সকল কুঞ্চিত হইয়া থাকে। পেশীর আকুঞ্চনে স্বরের উদ্ভব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ভাব ও স্বর পরস্পর এত নিকট-সম্পর্কিত ও দৃঢ়সংবদ্ধ যে, একের অভাবে অন্যের উৎপত্তি অসম্ভব। যখন কোনও বাদ্যযন্ত্রে সুর দেওয়া যায় তখন বোধ হয় যে সেই 'সা, ঋ, গা, মা' প্রভৃতি সুরসপ্তকের প্রতি তরঙ্গের অন্তরালে বিবিধ ভাব যেন সমীরপ্রবাহে নৃত্য করিতে করিতে আমাদের হৃদয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, সেই ভাবরাশির যুগপৎ আন্দোলনে আমাদের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে। উক্ত ভাবসমূহের হৃদয়োন্মাদী ভাষা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; তাই দূরস্থ নিশীথসঙ্গীতের বাক্যাবলী আমাদের শ্রবণ-পথে অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইলেও, উহার সুমধুর ঐকতানে আমরা এক অনির্ব্বচনীয় সুখকম্পন অনুভব করিয়া থাকি।

এই দৃশ্যমান বিশ্বে সঙ্গীত নাই কিসে? কবি কিম্বা ভাবুকের চক্ষু লইয়া জড় জগতের প্রতি অবলোকন কর, দেখিবে সমগ্র বিশ্বই যেন স্বভাবসুন্দরীর একটা একটানা নীরব-সঙ্গীতের মধুময় ঝঙ্কারে অবিরাম প্রতিধ্বনিত। প্রকৃতিদেবীর এই নীরব সঙ্গীতেই সঙ্গীতের জন্ম। জগতের যাহা কিছু প্রকাণ্ড ও মহান্, তাহাই সেই মহিমাময়ের অনন্ত প্রেমের ললিত-তানে চিরমুখরিত। ইন্দীবরনয়ন সুকুমার শিশুর বাক্যস্ফুরণ জন্য যেমন এই জীবসঙ্ঘশব্দময়ী বসুন্ধরা বিবিধ শব্দঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত ও বিক্ষুব্ধ, সেইরূপ মানবকে সেই অনন্ত ও বিশ্বজনীন প্রেমশিক্ষা দিবার জন্য এই অনন্ত-বিশ্ব, এক অবিশ্রান্ত সঙ্গীতের তানে চিরশব্দায়মান। এই জগৎ-রচনার মূলেই সঙ্গীত। Plutarch বলিয়াছেন,—The universe was formed and

* Noises serve the purposes of intellect, while musical sounds applies more to feeling. Stephen.

constituted on the principles of music.” ঐ যে পূর্ণিমার বিমল চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাপ্রবাহে জগৎ ভাসাইয়া, হাসির উৎস খুলিয়া দিয়া আকাশের কোলে বিচরণ করিতেছে, ঐ যে বাত্যাসংক্ষুব্ধ নীলাম্বুপরিপূর্ণ অনন্ত বারিধি সুশ্বেত ফেনবসনে পরিশোভিত হইয়া বীচিহিল্লোলে, কলকল্লোলে গর্জ্জন করিতেছে, প্রভাতবাতবিকম্পিত বল্লরী মাঝে, হরিৎপত্রাবলীর সুকোমল কোলে, ঐ যে অনিন্দ্য সুন্দরী স্ফুটমাধবী সারল্যের পবিত্র-সুষমা ও লাবণ্যের পূর্ণ সৌকুমার্য্য বক্ষে ধারণ করিয়া স্নিগ্ধ-শান্তোজ্জ্বল হাসির আবেশে গলিয়া পড়িতেছে, আবার ঐ যে অতীত-সাক্ষী নগাধিরাজ হিমাচল স্বীয় বিরাট মস্তক উত্তোলন করিয়া প্রশান্ত প্রেমের ভাবে গগন চুম্বন করিতে করিতে ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ কঠোর নিয়তি প্রত্যক্ষ করিতেছে, উহারা কি প্রাণহীন, চেতনাশূন্য জড়পিণ্ডমাত্র? কখনই না। উহারা জীবজগতের কর্ণে সেই মহিমাময়ের অনন্ত প্রেমগীতির মহিমা ঢালিয়া দিতেছে। কি পূর্ণিমার বিমল হাস্যোদ্ভাসিত পূর্ণ চন্দ্রমা, কি অনিন্দ্য সুন্দর দিব্যকান্তিসমুজ্জ্বলা স্ফুটমাধবী, কি চলোর্ম্মিসংক্ষুব্ধ নীলানন্ত মহাসাগর, কি অভ্রচূড়-স্পর্শী প্রশান্ত গম্ভীর হিমাচল, সকলেই এমন কি স্বভাবরাজ্যের প্রত্যেক অণু পরমাণু পর্য্যন্ত অবিরাম জগতের বক্ষে সঙ্গীতের সুধা সিঞ্চন করিতেছে। প্রকৃতির এই নীরব-সঙ্গীত শুনিয়া একদিন মনস্বী কার্লাইল Carlyle বলিয়াছেন—“All inmost things are melodious, naturally utter themselves in song.” কিন্তু আমরা প্রকৃতির ঐ গান শুনিতে পাই না। ভাবের ঘনস্থায়িত্ব নিবন্ধন আমরা ও গানের কিছুই বুঝিতে পারি না। মহানগরীর রাজপথ দিয়া যেমন অবিরাম জনস্রোত প্রবাহিত হয়, আমাদের হৃদয়ের মধ্য দিয়াও সেইরূপ ভাবস্রোত অনবরত চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কোনটীরই সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হয় না। ভাব বারবার শত বার আমাদের নিকট অবমানিত হইয়াও আবার তখনি ম্লানমুখে হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া আমাদিগকে এক অভিনব জগতের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে বলিতেছে, কিন্তু কিছুতেই আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। আমাদের কেমন একটা স্বভাব যে, কিছুতেই আমরা ভাবদেবীর বদনমণ্ডলে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না, তাই তাহাকে গ্রাহ্যও করি না। আমাদের হৃদয়ে এমন অনেক সুভাব আছে, যাহা উদ্বোধনের অভাবে অকর্ম্মণ্য ও সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু যখন সঙ্গীতের সুখময় করস্পর্শে সেই নিদ্রিত ভাব সকল জাগিয়া উঠে, তখন আপনাপনি এই দৃশ্যমান জড় জগতকে জীবন্ত ও মুখরিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। জড় জগতের সজীবতা অনুভব করিলে, বারিদের কোলে চল সৌদামিনীর ন্যায় প্রাণের মধ্যে সহসা যেন যুগান্তের একটা ঘনান্ধকার হাসিয়া উঠে, জীবাত্মা তখন এক পবিত্র অনন্তত্বের আভাস পাইয়া পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীই যেন সেই বিশ্ব-যন্ত্রের অযুত-ভাবনিঃসৃত প্রাণময় মধুর নিক্বনের সহিত সমস্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া এক অব্যক্ত বাঙ্মনাতীত ঐকতানময় দিব্যসঙ্গীতে সমগ্র জগতকে প্রতিধ্বনিত ও আলোড়িত করিয়া তুলে। পঙ্কিল সংসারের পরিহীয়মান কলকল্লোল যেন ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইয়া আইসে; যন্ত্রণার অশ্রু প্রেমাশ্রুতে এবং আকাঙ্ক্ষা ও অন্য হৃদয়কামনা ভক্তিতে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। তখন আপনাপনি অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ের সেই মানসভুবনমোহন ত্রিদিবজ্যোতিঃ হৃদয়গগনে গলিত কাঞ্চনের ন্যায় টলটলায়মান হইয়া, জীবনকে ভগবৎপ্রেমের সেই

দিব্যানন্ত সিন্ধুসঙ্গমে টানিয়া লইয়া যায়। তাহাতেই বলি হে সঙ্গীত! তুমি শান্তির পরশমণি, প্রেমের ধাত্রী, ধর্ম্মের বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুঃখের সমাধি! তাই যখন ভাবি, তুমি পবিত্রতার পুণ্যক্ষেত্র, সর্গের অধিরোহিণী, যখন ভাবি, তুমি স্বভাব-হৃদয়ের প্রতিফলন, জগৎসৃষ্টির অতি নিকট সম্পর্কিত তখনই যুগপৎ ভক্তি ও বিস্ময়ে এই নশ্বর পার্থিব জীবন স্বপ্নময় বলিয়া বোধ হয়; অমনি সেই ভগবতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্মরণ করিয়া 'কবির ভাষায় গাহি,—

তুমি "জ্ঞানের জননী, জ্ঞানানন্দময়ী,
বাঙ্ময়ী বরদা, সঙ্গীতে রাগিণী;
দর্শনের চিন্তা, বিজ্ঞানে ধীশক্তি,
নির্ব্বাণের পথে আলোকরূপিণী।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে!"

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৮৬।৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৩৭৵৬
সমষ্টি	...	৮২৪॥৵০
ব্যয়	...	২২২৸৩
স্থিত	...	৬০১।/৯

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ.

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ১০১।/৯

৬০১।/৯

আয়:

ব্রাহ্মসমাজ ... ২১৩৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৲

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঠাকুর
৩৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায়
১০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর
ময়ুরভঞ্জ
১০৲

২১৩৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৪৮৵৬
পুস্তকালয়	...	৩৮৶০
যন্ত্রালয়	...	১৮৲
গচ্ছিত	...	১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৲
সমষ্টি		২৮৬।৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯৩॥/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৪॥৶৬
পুস্তকালয়	...	॥/৩
যন্ত্রালয়	...	৩৸৵০
সমষ্টি		২২২৸৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

পঞ্চদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩।

৭০৯ সংখ্যা ১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ৪ ভাদ্র বুধবার।

বিজ্ঞাপন।

১। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে বাঙ্গালা প্রভৃতি সকল রকম পুস্তক চেক্‌দাখিলা চিঠি পত্রাদি সকল প্রকার কার্য্য উচিত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করা যাইবে।

২। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য বাবদ স্বতন্ত্র রসিদ দেওয়া যাইবে না; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।

৩। মনি অর্ডার, নোট, নগদ টাকা ও অর্দ্ধ আনার ডাকের টিকিট ব্যতীত অন্য প্রকারে তত্ত্ববোধিনীর মূল্য লওয়া যাইবে না।

৪। কোন গ্রাহক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন ঠিকানা পত্র দ্বারা না জানাইলে পত্রিকা পাওয়া সম্বন্ধে কোন গোলযোগ জন্য দায়ী নহি।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকাদির মূল্য ও মুদ্রাঙ্কনের টাকা ও চিঠি পত্রাদি কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৬। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে নাম, ধাম এবং কি বাবতে কত টাকা পাঠান হইল, স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

৭। পত্রিকা বন্ধ করিবার সময় পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকার মূল্য বাকি থাকিলে তাহা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার।

আগামী ১৫ই জুনের (১৯০২) পর হইতে অঃ ব্রাঃ পরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইবে আবেদনকারী কিংবা কারিণীগণ স্ব স্ব অবস্থা বিবৃত করিয়া আমার নিকট আবেদন পাঠাইবেন। সুবিধা হইলে ব্রাহ্ম সমাজের দুই জন পরিচিত সভ্যের নিদর্শন পত্রও সঙ্গে প্রেরণ করিবেন। নিম্ন লিখিত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণই সাহায্য পাইবার যোগ্য।

১। যে ব্রাহ্ম পরিবার অভিভাবকের মৃত্যু বা উৎকট পীড়ার কারণে বা অপর কোন কারণে ভরণপোষণের উপায় রহিত।

২। এক হাজার টাকার জীবন বীমা (Life Insurance) করিবার জন্য যে প্রিমিয়াম আবশ্যক যে ব্রাহ্ম তাহার কিয়দংশ দিতে সমর্থ তাহাকে অবশিষ্ট প্রিমিয়ম প্রদত্ত হইতে পারে।

পূঃ সঃ কার্য্যালয় ৩৭, পাটুয়াটুলী ঢাকা
১লা জুন ১৯০২।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদক, পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩।

৭০৯ সংখ্যা ১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

চৈতন্যময় পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কাহার নাম ?

যাঁহাকে লোকে চৈতন্যময় পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন তিনি সাকার বা নিরাকার ? সাকারকে ছাড়িয়া তিনি কেবল নিরাকাররূপে চৈতন্যময় পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান, না, নিরাকারকে ছাড়িয়া কেবল সাকাররূপে চৈতন্যময় পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান ? অথবা সাকার নিরাকার এই যে নাম কল্পনা ইহার অতীত চৈতন্যময় পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান কেহ বা কিছু—এক বা বহু ? এই মিথ্যা কল্পিত নাম মাত্রই কেবল চৈতন্যময় পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান, না, ইহার মূলে কোন সত্য বস্তু আছে ? যদি কেবল নাম কল্পনা মাত্রই হন মূলে কোন সত্য বস্তু না থাকে তবে জীবের সত্যানুসন্ধান বৃথা।

যিনি চৈতন্যময় পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমানকে অনুসন্ধান করিবেন তিনি নিজে সেই চৈতন্যময় পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমানের অন্তর্গত, কি তদতিরিক্ত একটী ভিন্ন চৈতন্যময় সত্য বস্তু বা মিথ্যা কিছুই নহে ? সর্ব্বশক্তিমান পূর্ণ ঈশ্বর চৈতন্যের অন্তর্গত জীব চৈতন্য কি ঈশ্বর চৈতন্য জীব চৈতন্য দুইটী ভিন্ন পদার্থ ? যদি ঈশ্বর চৈতন্য হইতে জীব চৈতন্য ভিন্ন হন তবে ঈশ্বরের পূর্ণ চৈতন্যময় নাম বা সংজ্ঞা হওয়া কিরূপে সম্ভব হয় ? এই যে স্থূল শরীর যাহাকে অবলম্বন করিয়া অন্তর বাহির এই দুই ভাব ভাসিতেছে, তাহার অন্তরেই কি কেবল চৈতন্য আছে বাহিরে নাই, কি অন্তর বাহির সমভাবে এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তায় পূর্ণ কিম্বা অন্তরের চৈতন্য ও বাহিরের চৈতন্য দুইটী ভিন্ন ভিন্ন অথবা অন্তর বাহ্য সমুদায়কে লইয়া এক পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান চৈতন্যময় বস্তু বা ঈশ্বর অনাদি অনন্ত কাল প্রকাশমান রহিয়াছেন ? জীব চৈতন্য যদি মিথ্যা হন তবে জানিতে হইবে যে মিথ্যার পক্ষে লাভালাভ, জানা না জানা সকলি মিথ্যা। মিথ্যা হইয়া যদি সত্য চাহ তাহা নিতান্ত অসম্ভাবনীয়, কেন না যাহা মিথ্যা নহে তাহাই সত্য, মিথ্যার, নিষেধেরই নাম সত্য। যদি বল সত্য হইয়া সত্যকে জানিতে ইচ্ছা তবে বিচার করিয়া দেখ যে যাঁহার সত্য জানিতে ইচ্ছা, তিনি সাকার প্রকাশমান চৈতন্যময় সত্য হইয়া অপ্রকাশ নিরাকার চৈতন্যময় সত্যকে জানিতে চাহেন

কি অপ্রকাশ নিরাকার চৈতন্যময় সত্য হইয়া প্রকাশমান সাকার চৈতন্যময় সত্যকে জানিতে চাহেন? সত্যজিজ্ঞাসু নিজে সাকার অপূর্ণ ও অল্প শক্তিমান চৈতন্য হইয়া সাকার পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান চৈতন্যকে জানিতে চাহেন কি নিজে নিরাকার অপূর্ণ ও অল্প শক্তিমান চৈতন্য হইয়া নিরাকার পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান চৈতন্যকে জানিতে চাহেন? নিরাকারে বহুত্ব বা বৈচিত্র্য সম্ভবে কি না?

এস্থানে প্রথমে দেখিতে হইবে নিরাকার কাহাকে বলে। একখণ্ড কর্পূর বা পর্ব্বতাকার বারুদ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিরাকার হইয়া যায় ইহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই নিরাকারই কি ঈশ্বর? কিম্বা ঈশ্বর যে নিরাকার তাহা এরূপ নিরাকার নহে? যদি তিনি এইরূপ নিরাকার হন তাহা হইলে বায়ুকেই নিরাকার ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করা উচিত, অন্য ঈশ্বরের অনুসন্ধান অনাবশ্যক। কিন্তু "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়) সেই নিরাকারই নিরাকার ঈশ্বর যাঁহাকে মনোবুদ্ধি বাক্য এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। নিরাকার আছেন এইমাত্র বলা যায়। নিরাকার যে কি বা কেমন তাহা জানিবার বা বলিবার উপায় নাই। এই নিরাকার অপ্রকাশে পূর্ণ অপূর্ণ অল্পশক্তি সর্ব্বশক্তি অল্পজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি ভেদ বা বৈচিত্র্য কিরূপে ধারণা হইতে পারে? যাহাকে মন বুদ্ধি বাক্য ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাহারই নাম সাকার বা প্রকাশ। এই সাকার বা প্রকাশেই অনন্ত বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষগোচর। যেমন একই বস্তু বা সত্তা অবস্থাভেদে বারুদ বা কর্পূর ও বায়ু কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই সত্তা বা বস্তু অবিনাশী একই। সেইরূপ সাকার নিরাকার ভাবে গৃহীত যে বস্তু তাহা নিত্য এক ও অবিনাশী। এই ভাব সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে বস্তু বা সত্তা বা ব্রহ্ম সাকার নিরাকার ভাবের অতীত হইয়াও সাকার নিরাকার দুই ভাবে বিরাজমান। এখানে দেখিতে হইবে যে যিনি পূর্ণ চৈতন্যময় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধারণ করিতে চাহেন তিনি নিজে কোন্ রূপ হইয়া কোন্ রূপকে ধারণ করিবেন?

যিনি চৈতন্যময় পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান তিনি সাকার নিরাকার এই দুই ভাবকে আত্মস্থ করিয়া পূর্ণ চৈতন্যময় সর্ব্বশক্তিমান কি এ দুয়ের কোন ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ চৈতন্যময় সর্ব্বশক্তিমান? সাকার ছাড়িয়া কেবল নিরাকারই কি বস্তু বা ব্রহ্ম? এবং সাকার কি কেবল শক্তি প্রকাশ মাত্র? যদি তাহাই হয় তবে সে শক্তি কাহার ও কি? এই নামরূপাত্মক জগৎরূপে প্রকাশমান যে শক্তি তাহা যদি ব্রহ্মের না হইয়া অপরের হয় তবে সে অপর কে এবং কোথায়? এবং তাহার সত্তায় ও শক্তিতে ব্রহ্মের অপূর্ণতা ও শক্তির ক্ষুণ্ণতা হয় কি না? ইহা কি মিথ্যা হইতে প্রকাশিত মিথ্যার মিথ্যা শক্তি কি ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মেরই শক্তি? যদি ব্রহ্মের শক্তি না হয় তবে ব্রহ্ম কিরূপে পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান হইবেন। এই শক্তি ছাড়া যদি অপর অসংখ্য শক্তি ব্রহ্মের বলিয়া কল্পিত হয় তাহা হইলেও ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন কি না?

শক্তি শক্তিমানেরই রূপ বা প্রকাশ কি না? শক্তির প্রকাশ ব্যতীত শক্তিমানের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে কি না? শক্তি রূপাদিতে প্রকাশিত না হইলে তাহাকে শক্তি বলা না বলা সমান কি না? শক্তি শক্তির প্রকাশ বা কার্য্য এবং শক্তিমান বস্তু বা সত্তা এই তিনকে এক সঙ্গে সত্য বলিয়া গ্রহণ না

করিলে তিনের কোন একটীকেই পৃথকরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় কি না? প্রকাশ বা স্ফূর্ত্তিহীন শক্তি এরূপ একটা কথা মুখে কহা যায় বটে কিন্তু তাহা ভাবা যায় কি না? তাহার অনুভবে উপলব্ধি হয় কি না, এবং তাহা ব্যবহারে আসিতে পারে কি না? প্রকাশহীন শক্তি ও শক্তিহীন বস্তু মনের ভাব বা কল্পনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? শক্তির প্রকাশ বা কার্য্য ছাড়িয়া শক্তিকে ও শক্তি ছাড়িয়া বস্তুকে গ্রহণ বা উপলব্ধি করিতে গেলে তাহা বাক্য মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় কি না, তাহার ব্যবহার-যোগ্যতা থাকে কি না? কার্য্য নাই অথচ শক্তি স্ফূর্ত্তিমতী আছেন অর্থাৎ বস্তুরূপে থাকা ভিন্ন শক্তিরূপে আছেন ইহা কেহ কখনো দেখিয়াছেন কি না? ক্রিয়াহীন শক্তির শক্তিরূপে থাকা সম্ভবপর কিনা ও কার্য্যের দ্বারাই শক্তির অনুভব হয় কি না? যতক্ষণ বস্তু কোন কার্য্য না করেন ততক্ষণ বস্তুর শক্তি আছে ইহা জানিবার উপায় আছে কি না? বিশেষ্যের যে গুণ বিশেষণ তাহা বিশেষ্যের রূপ মাত্র কিনা এবং বিশেষণের দ্বারাই বিশেষ্য প্রকাশ পান কি না? ব্রহ্ম বিশেষ্য ব্রহ্মের যে রূপ গুণ শক্তি প্রকাশ প্রভৃতি বিশেষণ ব্রহ্মের রূপই কি না? এবং তাঁহার এই শক্তি প্রকাশের দ্বারাই তাঁহার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে কি না? যাহা দ্বারা যাহা প্রকাশ পায় তাহা অবলম্বনেই তাহার গ্রহণ বা ধারণ হয় কিনা এবং অনবলম্বনে হওয়া সম্ভব কি না? অগ্নি অগ্নির প্রকাশ ও তাহার নানা শক্তি ইত্যাদি অগ্নিরূপই কি অগ্নি হইতে পৃথক? অগ্নির প্রকাশে তাহার নাম রূপ গুণ ক্রিয়া শক্তি সমুদায় প্রকাশ পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে কি না—যেমন প্রকাশ শক্তি দ্বারা অন্ধকার দূর করা, উষ্ণতা শক্তির দ্বারা শীতলতা দূর করা, চেতন গুণ দ্বারা তেল বাত্তি আদি ভক্ষণ করা, ধূম দ্বারা মেঘ হইয়া জল বর্ষণ হওয়া ইত্যাদি। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হন তখন যে কেবল তাঁহার নামরূপ মাত্র অদৃশ্য হয় তাহা নহে তাঁহার নামরূপের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গুণ ক্রিয়া শক্তি অপ্রকাশ নিরাকার অর্থাৎ অদৃশ্য হয় কি না? অগ্নি নামরূপে প্রকাশ নাই, নামরূপরহিত অপ্রকাশ ভাবে আছেন অথচ অগ্নির সমস্ত ক্রিয়া হইতেছে ইহা সম্ভবপর কিনা? এইরূপ এই দৃশ্যমান প্রকাশ শক্তি বা জ্ঞান দ্বারাই অপ্রকাশ নিরাকারের উপলব্ধি হইতেছে কি না? এবং ইহার দ্বারাই চৈতন্যময় পূর্ণ সর্ব্বশক্তি-মান এক বস্তু আছেন বোধ হইতেছে—ইহা প্রত্যক্ষ কি না?

তুমি জাগিয়া আছ এবং নানা শক্তির দ্বারা নানা কার্য্য করিতেছ ও তাহা বুঝি-তেছ। যখন এই জীব বা তুমি অপ্রকাশ সুষুপ্তির অবস্থায় থাকে বা থাক তখন জাগ্রত অবস্থার মত ক্রিয়া হয় কি না ও জীবের কোন বোধাবোধ থাকে কি না, যে আমি এতক্ষণ শুইয়া আছি, এতক্ষণ পরে জাগিব আমি আছি কিম্বা ব্রহ্ম আছেন, এরূপ স্মৃতি কখন দেখিয়াছি? যদি থাকে তবে সুষুপ্তি অবস্থা নাম কেন হইল? যখন জীব অপ্রকাশ জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থা হইতে জাগিয়া জ্ঞানময় হইয়া সমস্ত শক্তি বা জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কার্য্য সমাধা করে ও সমস্ত বোধাবোধ করে তখন তাহার সব শক্তি সঙ্গে সঙ্গে থাকে কি না ও সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে কি না? অথচ জাগ্রত অবস্থায় যে জীব শক্তিযুক্ত হইয়া কার্য্য করে সেই জীবই সুষুপ্তির অবস্থায় জ্ঞানাতীত থাকে কি না? জাগ্রত-অবস্থাপন্ন জ্ঞানময় জীব একটী পৃথক ও সুষুপ্তি-অবস্থাপন্ন জ্ঞানাতীত জীব আর একটী পৃথক, কি উভয় অবস্থায় একই ব্যক্তি

বা বস্তু থাকেন, কেবল রূপ গুণ ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন মাত্র কি না? জাগ্রত প্রকাশ জ্ঞানময় অবস্থার মনুষ্য মাতা পিতাকে অপমান করিয়া সুষুপ্তি অপ্রকাশ জ্ঞানাতীত অবস্থার মনুষ্য মাতা পিতাকে মান্য করিতে হইবে কিম্বা জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় অপমান করিয়া জাগ্রত প্রকাশ অবস্থায় মান্য করিতে হইবে? অথবা উভয় অবস্থাতে একই জীব মাতা পিতা জানিয়া উভয় অবস্থাতে মান্য করিতে হইবে? সেই রূপ বুঝিয়া একই সত্য যিনি নিরাকার সাকার উভয় ভাবকে লইয়া পূর্ণ চৈতন্যময় সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাকে সকল ভাবেতে একই জানিয়া প্রেম ভক্তি মান্য করা উচিত কি না? সাকার একটী পৃথক সত্য পূর্ণ চৈতন্যময় সর্ব্বশক্তিমান উপাস্য দেবতা ও নিরাকার একটী পৃথক সত্য পূর্ণ চৈতন্যময় সর্ব্বশক্তিমান উপাস্য দেবতা জানিয়া এক সত্যকে মান্য ও অপর সত্যকে অপমান করিতে হইবে? কি যখন যে ভাবেই প্রকাশ পান না কেন সেই এক সত্যই প্রকাশ পাইতেছেন জানিয়া সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে তাঁহাকে পূর্ণরূপে প্রেম ভক্তি মান্য করিতে হইবে। মনুষ্য মাত্রেই আপনার সর্ব্ব অভিমান দূর করিয়া স্থির চিত্তে বিচার পূর্ব্বক এই বিষয় বুঝিয়া সকলের সার ভাব এক সত্য যিনি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান চৈতন্যময় তাঁহাকে গ্রহণ করুন যাহাতে জগতের সকল অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়, জীবসমূহ শান্তিময়ের ক্রোড়ে শান্তি পায়, ইহাই এক মাত্র প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় গুরু মাতা পিতা জগতের আত্মা নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ আপনি পূর্ণরূপে প্রকাশমান। আপনাকে পূর্ণরূপে নমস্কার বা প্রণাম করি, আপনার পূর্ণরূপে জয়ধ্বনি করি, আপনার পূর্ণরূপে জয় হউক! হে পূর্ণ অন্তর্যামী নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া জীবসমূহের শান্তিবিধান করুন। আপনি শান্ত হউন। হে জগতের মাতা পিতা আপনি ত শান্তিময়, জগৎময় জীবসমূহের শান্তিবিধান করুন যাহাতে জগতের জীবনসমূহের মধ্যে হিংসা দ্বেষ না থাকে, জীবসমূহ আপনাকে পূর্ণভাবে চিনিয়া আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করে ও পরস্পরের মঙ্গল চেষ্টা করে—এই ভাবে চরাচর জীবের অন্তরে প্রকাশ হউন বা করুন। হে মাতা পিতা, আমরা বিষয়-ভোগে আসক্ত হইয়া আপনাকে ভুলিলেও আপনি আমাদিগকে ভুলিবেন না, আপনি আমাদের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি না করিলে দ্বিতীয় আর কে আছে যে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে? আমরা আপনাকে যাহাই বলি না কেন আপনিত জানিতেছেন সকলই আপনার আত্মা ও রূপ। জগতের সর্ব্বদোষ ভুলিয়া এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। জগতে অখণ্ড শান্তি স্থাপিত হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপদেশ।

কুশী নগরের নিকটবর্ত্তী কাননে ধর্ম্মবীর শাক্যসিংহ শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ান। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত, তাহাতে মৃত্যুযন্ত্রণার কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ। এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন, ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদের ধর্ম্মবিষয়ে কোন সংশয় থাকে, তবে এ সময়ে তাহা ভঞ্জন করিয়া লও। শিষ্যেরা কেহই কিছু বলিল না। তাহাতে বুদ্ধদেব বলিলেন,

আমি তোমাদিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি, যে পৃথিবীর সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় জীবন ক্ষেপ কর।

তিনি যখন ধ্যানস্থ থাকিতেন, তখন পৃথিবীর ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী বস্তু সকলকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিতেন না। তিনি প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম পদার্থের চিন্তা হইতে বিরত হইতেন, ক্রমে মহাকাশের সহিত স্বীয় আত্মাকে ব্যাপ্ত করিতে অভ্যাস করিতেন। এইরূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে আপনাকে মিলিত করিয়া জীবিত অবস্থায় ক্ষণস্থায়ী নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতেন এবং মৃত্যুর পরও চিরস্থায়ী নির্ব্বাণের আশা রাখিতেন। এই রূপে তিনি জীবিতাবস্থায় যেন মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, এখানকার দুঃখ সকল নির্ব্বাণ করিয়া, আপনি নিভিয়া যাইতেন। এই তাঁহার সকল কঠোর সংযম অভ্যাসের ফল ও পরিণাম। শিষ্যদিগকেও তিনি এইরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্তির উপদেশ দিতেন। কঠোর সংযমই তাঁর নির্ব্বাণ লাভের উপায়। এমন কি মাতাও যদি জলে নিমগ্ন হন—পুত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া উদ্ধার করিতে পারিবেন না। নিকটে যদি কোন যষ্টি থাকে তাহা দ্বারাই তাঁহাকে অবলম্বন দিতে হইবে, না থাকে, তিনি ডুবুন। কঠোর হইতে কঠোরতর সাধন ও সাবধানতাই তাঁহার উপদেশের সার তত্ত্ব। হংস যেমন জলমিশ্রিত ক্ষীর হইতে জলভাগ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরাংশ গ্রহণ করে, আমরাও তেমনি তাঁহার উপদেশের সারাংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সংযমের ফল কেবল ইহলোকে শান্তি ও পরে নির্ব্বাণ তাহাতে আমাদের আত্মা সায় দেয় না। দুঃখনিবৃত্তিই কি কেবল সংযমের ফল? আর কিছুই নয়? সত্য বটে সংযমে দুঃখনিবৃত্তি হয়, কিন্তু আমাদের আত্মা আরো কিছু চায়। তাহা পার্থিব সুখের উপরিস্থ—ব্রহ্মানন্দ। আত্মা দুঃখশূন্য হইল, এই কি তার চরম অবস্থা? ইহা যদি প্রেমে—আনন্দে—ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ না হয়, অনন্তকালের জন্য এই অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার আর কি হইল? ঘোরতর সংযমাভ্যাসের পর আত্মা একটা কৃত্রিম মৃত্যুর মধ্যে বা চির-মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করিবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এ প্রকার নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন,

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

"এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকল জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ যিনি সকলি জানিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।" ঈশ্বর হৃদয়-গ্রন্থে যে উপদেশ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, উপনিষদের এই উপদেশের সঙ্গে তার মিল আছে। ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃতময়। কি জীবিত অবস্থায়, কি মরণোত্তর, আমরা তাঁহাতে স্বাধীন ইচ্ছার সহিত জানিয়া শুনিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যোগযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে পারিলেই অজ্ঞান হইতে মুক্ত ও অমৃতভাবাপন্ন হই। আমরা কোন কালে নিভিয়া যাইব না। চিরদিন চেতনাবান ও জাগ্রত থাকিয়া আনন্দলোক হইতে আনন্দলোকে অবস্থিতি করিয়া অমৃতানন্দ ভোগ করিতে থাকিব—ও তাঁহার সহবাস-সুখে পরিতৃপ্ত হইব। পরিশেষে তাঁহারি সঙ্গে থাকিয়া, আপনার অস্তিত্ব না হারাইয়া, অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিব।

অতএব আমরা যেন কঠোর সংযম অভ্যাস করিয়া চিত্তকে প্রশান্ত ও ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইতে প্রাণগত যত্ন করি। সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদিগকে দুঃখ শোক হইতে উত্তীর্ণ করিয়া, আনন্দের উপর আনন্দে ও অমৃতরসে অভিষিক্ত করিবেন। একারণ অনুক্ষণ আপনার আত্মার অন্তরতম প্রদেশে তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইবার জন্য বল প্রার্থনা কর। তাহা হইলে তিনি তোমার এমন বুদ্ধিবল দিবেন, যে তদ্দারা তুমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইবে।

গীতায় আছে,

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥"

যে ব্যক্তি সতত যোগযুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে এমন বুদ্ধিযোগ দান করি, তদ্দারা সে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য উপদেশ, সুধু যোগযুক্ত নয়, প্রীতির সহিত যোগযুক্ত হইলে তবে সে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। জগতে ভালবাসাই সার জিনিস। ভালবাসায় জগৎ বশীভূত হয়। এমন কি জিনিস আছে যাহা ভালবাসার বিনিময়ে না পাওয়া যায়। ভগবানও ভালবাসায় হৃদয়ে চির আবদ্ধ। ভালবাসা যে কি তাহা কেমনে প্রকাশ করিব। আমরা এখানে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ও বন্ধুকে ভালবাসি, মনে তাহা অনুভব করি, কিন্তু ঠিক্ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারি না। ঈশ্বরের করুণা ও প্রেমে পরাস্ত হইয়া সাধক তাঁহাকে কি চক্ষে দেখেন, তাহা তিনিই অনুভব করেন—প্রকাশ করিতে পারেন না। কি প্রেমোচ্ছ্বাসেই বলিয়া উঠেন,

"কেমনে কহিব কি সুধাময় শোভা
হেরিলাম, হৃদয় দুয়ার খুলিয়ে,
ধন্য দরশন লাভ হোলোরে জীবনে,
ধন্য তোমার করুণা।"

এইরূপে অন্তরে সেই অন্তরতম পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার স্পর্শসুখে সুখী হইয়া অনন্ত জীবন ধারণ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ। ইহাই প্রকৃত মুক্তি।

হে দেব! জীবনে মরণে, ইহলোক ও পরলোকে তোমার সহিত থাকি, এই আমাদের কামনা। শিশু যেমন নিদ্রা আসিলে তাহার মায়ের অভেদ্য দুর্গস্বরূপ ক্রোড় অন্বেষণ করে, মহানিদ্রা আসিবার সময়, আমরা যেন তেমনি করিয়া তোমার স্নেহময়, প্রেমময়, অমৃতময় ক্রোড়ে নির্ভয়ে শয়ান থাকিতে পারি। তোমার ক্রোড়ই জুড়াইবার একমাত্র স্থান, সেখানেই তুমি আমাদিগকে চিরদিনের জন্য স্থান দিও। কোথা তুমি অনাথনাথ! দুর্ব্বলের বল! ডাকি তোমায় দেখা দেও।

"কাতর আমারই প্রাণ সংসারে,
ওগো পিতা দাও তব চরণে স্থান।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নববর্ষের চিন্তা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্ম্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্য্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। এই যে কর্ম্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্র-

ক্ষের পথে, ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাহাকে "ফ্রীডাম্" বলে, সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্ব্বল, ভীরু, তাহা স্পর্দ্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর,—তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্ম্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে! তাহা কেবলি অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্ম্মে-চর্ম্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে—তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে—তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় "ফ্রীডাম্" কোন কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না—কারণ আমাদের জনসাধারণ অন্যসকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীনতর ছিল। এখনো আধুনিক কালের ধিক্কারসত্ত্বেও এই "ফ্রীডাম্" আমাদের সর্ব্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল—এই ফ্রীডামের চেয়ে উন্নততর—বিশালতর যে মহত্ত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি,—অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়-বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।

এইখানেই নববর্ষের চিন্তা আমি সমাপ্ত করিলাম। আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ, পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিসলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসববস্ত্র পরিয়াছেন, এ বস্ত্রখানি আজিকার নহে—যে ঋষিকবিরা ত্রিষ্টুভ-ছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহারাও এই মসৃণ-চিক্কণ পীতহরিৎ বসনখানিতে বনশ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন—উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে এই সমীরকম্পিত কুসুমগন্ধি অঞ্চলপ্রান্তটি নবসূর্য্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণজীবন স্নান করিতে পায়। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের বহুসহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, তবেই আমাদের দুর্ব্বলতা, আমাদের লজ্জা, আমাদের লাঞ্ছনা, আমাদের দ্বিধা দূর হইয়া যাইবে। ধার-করা ফুলে-পাতায় গাছকে সাজাইলে তাহা আজ থাকে, কাল থাকে না। সেই নূতনত্বের অচির-প্রাচীনতা ও বিনাশ কেহ নিবারণ করিতে পারে না। নববল, নবসৌন্দর্য্য, আমরা যদি অন্যত্র হইতে ধার করিয়া লইয়া সাজিতে যাই, তবে দুই দণ্ডবাদেই তাহা কদর্য্যতার মাল্যরূপে আমাদের ললাটকে উপহসিত করিবে; ক্রমে তাহা হইতে পুষ্প-পত্র ঝরিয়া গিয়া কেবল বন্ধন-রজ্জুটুকুই থাকিয়া যাইবে। বিদেশের বেশভূষা—ভাবভঙ্গী আমাদের গাত্রে দেখিতে দেখিতে মলিন, শ্রীহীন হইয়া পড়ে—বিদেশের শিক্ষা, রীতি-নীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নির্জ্জীব ও নিষ্ফল হয়, কারণ, তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই—তাহা অসংলগ্ন, অসঙ্গত, তাহার শিকড় ছিন্ন। অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব—সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না, তখন সেই অম্লানগৌরব মালাখানি আশীর্ব্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবলহৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই

জয় হইবে! যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্ব্বাক্, তা-হারই জয় হইবে,—আমরা—যাহারা ইং-রাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস্ করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

"মিলি মিলি যাওব সাগরলহরীসমানা"

তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হ-ইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্র-কন্যাগণকে কোট্-ফ্রক্ পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্র-দের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যা-সীর সম্মুখে করযোড়ে আসিয়া কহিবে—"পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন—

"ওঁ ইতি ব্রহ্ম।"

তিনি কহিবেন—

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

তিনি কহিবেন—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

কিমাশ্চর্য্যং।

এই দৃশ্যমান বিশ্বের সমস্তই বৈচিত্র্য-পূর্ণ, প্রহেলিকাময় ও অদ্ভুত! নীলানন্ত মহাসাগর ও কঠিনতম এভারেষ্ট্ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গোষ্পদ ও কোমলতম লজ্জা-বতী লতাটি পর্য্যন্ত জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুই এক দুরধিগম্য রহস্যের আভাসে লীলায়িত। ঐ যে নগণ্য কঙ্করকণা যুগ-যুগান্তব্যাপী নৈসর্গিক ভ্রূকুটিভঙ্গে পরিত্রস্ত, কালের পরিবর্ত্তন-চক্রে নিষ্পেষিত ও রথ্যা-প্রবাহী জীবকুলের দৃপ্ত-পদতলে অবিরাম বিদলিত হইয়া হীয়মান অবস্থায় আজও পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে; আবার ঐ যে জগৎ সৃষ্টির উচ্চস্তরবাসী মানব, সহযোগি-গণের কঠোর নিয়তি প্রত্যক্ষ করিয়াও অনু-দিন সংসার-আসক্তির পঙ্কিল প্রবাহে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া আমিত্বের কর্ণভেদী কো-লাহলে অভ্রস্তর বিদীর্ণ করিতেছে, এই অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ব-প্রহেলিকার সমাধান করি-বার জন্য জলবিম্বের মত কত শত বুদ্ধচৈতন্য কতবার কালসাগরে ভাসিয়াছে, কিন্তু এই বিরাট রহস্যের শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে অক্ষম হইয়া পরক্ষণেই আবার সেই অনন্ত কালসিন্ধুর প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক মনুষ্যজীবন যে-রূপ কুহেলিকাচ্ছন্ন বৈপরীত্যের আধার এমন আর কিছুই নহে। দুই দিন পূর্ব্বে যে ভর্ত্তার ক্ষণিক বিচ্ছেদে সহধর্ম্মিণীর মর্ম্মপী-ড়ার সীমা থাকিত না, এই সৌন্দর্য্যপ্লাবিত জগৎ মহাপ্রলয়ের অন্ধকারগর্ভে নিমজ্জিত বলিয়া বোধ হইত, যাহার সুষমা-উদ্ভাসিত কমনীয় বদনের রমণীয় কন্দর্পকান্তিতে আত্মহারা হইয়া যে একদিন এই সংসার-সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গে সুখে সন্তরণ করিয়া-ছিল, আজ সেই প্রাণপতির জীবনের রেখা নিয়তির তরঙ্গ-প্রহারে কালের শিলাবক্ষ হইতে অপসৃত। ঐ দেখ, সেই সহধর্ম্মিণী অঙ্গনশায়ী শবের কটিদেশ হইতে চাবি উ-ন্মোচন করিয়া, পতির সেই বহুক্লেশলব্ধ ধনরত্নপূর্ণ লৌহপেটিকা উত্তমরূপে বন্ধ ক-রিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। বলিতে কি, স্বামীর সেই শবদেহ ভস্মীভূত করিবার সময়ও উক্ত অর্থচিন্তা অর্দ্ধাঙ্গিনীর হৃদয়মন্দির পরিত্যাগ করে নাই। সেই চক্ষু, সেই বুক, সেই হৃদয় সমস্তই এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু সেই প্রেমাশ্রু, সেই সোহাগ, সেই প্রণয় এই

এক মুহূর্ত্তে কোথায় গেল? ইহার তুল্য আশ্চর্য্য রহস্য কি আছে জানি না।

এইরূপ এক গভীর মোহান্ধকারে সমগ্র জগৎ সমাচ্ছন্ন। "হতভাগ্যগণই মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হয়; শমনের সাধ্য কি যে আমার একগাছি কেশও স্পর্শ করিতে পারে? আমার আহার-প্রণালী যখন এরূপ সুব্যবস্থিত এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক যখন আমার পুস্তকাগারে বিদ্যমান, তখন আমার নিকট প্রকৃতির চিরন্তন সাধারণ নিয়ম যে বিপর্য্যস্ত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?" এইরূপ একটা মোহকরী আশা বোধ হয় মানুষকে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন স্মরণ করিতে দেয় না। হায়! হতভাগ্য দেখিয়াও দেখে না যে জগতের প্রত্যেক বস্তুই মৃত্যুর করাল অঙ্কে অঙ্কিত। কুসুম প্রত্যুষে বিকসিত হইয়া প্রদোষে ঝরিয়া পড়ে; ইন্দীবরনয়ন শিশুর কমলমুখের অমল হাসি পীড়াজনিত যন্ত্রণার অনল শ্বাসে দুই দিনেই অন্তর্হিত হইয়া যায়; শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলা যুবতীর ঢল ঢল রূপ লাবণ্য দুই একদিন মাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্যবিভাগে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া দেখিতে দেখিতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কালের রঙ্গমঞ্চে নিয়তির এই চূড়ান্ত অভিনয় আশার অঞ্চলদশাপরিবদ্ধ বাসনাক্লিষ্ট মানব স্বীয় চিত্তদৌর্ব্বল্য নিবন্ধন দেখিয়াও দেখে না; মনে করে এই ধরাধাম বুঝি আর পরিত্যাগ করিতে হইবে না।

"ভেকো ধাবতি তঞ্চ ধাবতি ফণী সর্পং শিখী ধাবতি
ব্যাধো ধাবতি কেকিনম্ বিধিবশাদ্ব্যাঘ্রোঽপি তং ধাবতি।
স্বস্বাহারবিহারসাধনবিধৌ সর্ব্বে জনা ব্যাকুলা
কালস্তিষ্ঠতি পৃষ্ঠতঃ কচধরঃ কেনাপি ন দৃশ্যতে॥"

এই অমোঘ কবিবাক্যও তখন তাহার পক্ষে উন্মাদ কল্পনা বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা কাল অবিরাম দুন্দুভিনির্ঘোষে মানুষকে বলিতেছে, "দেখিতেছ কি বিভ্রান্ত মানব! নিয়তি তোমার শিরঃপ্রান্তে উপস্থিত, ধন বল, রত্ন বল, আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনরোল বল কেহই তোমাকে এই মায়ার কাননে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবে না।" কিন্তু কালের কথা শুনিবার অবসর মানুষের কোথায়? তাহার দশনপাঁতি গলিত, কেশ কার্পাস-ধবলিত, তথাপি ঐ দেখ সে কেমন শেষের সেই ভীষণ দিন বিস্মৃত হইয়া প্রসাধন কার্য্যে নিরত রহিয়াছে! মৃত্যুর শাসনভ্রূকুটীকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ অনুদিন সংসারের দুর্নিবার প্রলোভন-স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাহার হৃদয় মৃত্যু-ভীতি-পরিশূন্য? তাহা কখনই নহে। কুটীরবাসী দরিদ্র হইতে সৌধবাসী নরেশ্বর পর্য্যন্ত অল্প বিস্তর ভাবে শমনের বিকট ভ্রূভঙ্গী ও অঙ্গুলিহেলনে অবসন্ন। সুগন্ধি-নবনীত-পরিপূর্ণ হৈমপাত্র মুখে লইয়া যে এই বিশাল ভব-রঙ্গালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছে, বিলাসের পুষ্পিতাবরণে অঙ্গ ঢালিয়া যে আশৈশব সৌভাগ্যের কুসুমাস্তৃত পথে বিচরণ করিয়াছে, সুখৈশ্বর্য্যের জ্বলন্ত বর্ত্তিকালোকে যাহার জীবননাটকের প্রত্যেক গর্ভাঙ্কই পরিদীপ্যমান; আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা, প্রণয়িনীর বুকভরা সোহাগ ও আত্মজগণের আনন্দ কোলাহলে আজ যাহার মোহাচ্ছন্ন হৃদয়দর্পণে স্বর্গের ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া এই জ্বালাময় সংসারকে মায়ার মনোহর কুসুমোদ্যানে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে, দুই দিন পরে তাহাকে এই সোণার সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এমন কাম-বিনিন্দি দিব্য কান্তি শ্মশানের বিদগ্ধ মৃত্তিকায় লীন হইবে; এত সাধের শান্তিনিকেতন, লালসার রঙ্গভূমি, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে

হইবে। যে সন্তান আজ আনন্দের জীবন্ত ও ভ্রাম্যমান প্রতিমূর্ত্তি রূপে সংসারকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে, যাহার সুমধুর 'মা' সম্বোধনে জননী জগতের সত্তা ভুলিয়া গিয়া ত্রিদিবের সুখকম্পন অনুভব করেন, এক কথায় যে বর্ত্তমান প্রীতির অমৃতখনি, ও ভবিষ্য সান্ত্বনার স্পর্শমণি, এমন স্নেহের পুতলিকেও ছাড়িয়া যাইতে হইবে, জগতে এমন কোন্ সংসারী আছে যে, এই সকল ভয়ঙ্করী চিন্তার বিকট বিভীষিকা স্মরণ করিয়া চিত্তাবেগ সংযত রাখিতে পারে? তাহা হয় না! তাহা কেহ পারে না! পারে না বলিয়াই মানুষ অন্তিমচিন্তায় উদাসীন থাকিতে ভাল বাসে।

মানবের এরূপ মৃত্যুভীতির কারণ কি? এবিষয় অনুধাবন করিলে জানা যায় যে আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাস ও পারলৌকিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা সন্দেহসমাকুল জ্ঞানই মানব-হৃদয়ের উক্ত পরিত্রস্ত অবস্থার একমাত্র নিদানভূত কারণ। জন্মমৃত্যুতেই মনুষ্যজীবন সীমাবদ্ধ; জন্মে উহার উৎপত্তি এবং মৃত্যুতেই উহার পরিসমাপ্তি। ইহজগতের অপর প্রান্তে আর কোন স্থান আছে কি না তাহা কাহারও অধিগম্য নহে। কেন না এমন কোন কলম্বস্ কিম্বা ম্যাগালিন্ সেই অপরিজ্ঞাত জনপদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, যাঁহাদের নিবেদিত পর্য্যটন-কাহিনী সেই অপরিচিত দেশের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে কিয়ৎপরিমাণেও অভিজ্ঞ করিতে পারে। ইহ জগতের অপর প্রান্তে অপর কোন বিভিন্ন জগতের অস্তিত্ব সম্ভব কি না, তথায় কোন পুরস্কার কিম্বা শাস্তি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে কি না, সেখানকার রাজা কেমন, প্রজা কেমন, ভেদ কেমন, দণ্ড কেমন, রাজনীতি ও সমাজনীতিই বা কি প্রকার, এইরূপ যুক্তিতর্কজাত একটা বিসংবাদী সন্দিগ্ধ জ্ঞান মানব-হৃদয়ে পারলৌকিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ স্থায়ী অভিজ্ঞান বদ্ধমূল হইতে দেয় না। "বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে" এই লইয়াই মানবসমাজ চিরকালই বাদবিতণ্ডার খরতরঙ্গে পরিভাসমান। মানুষের মানসক্ষেত্র হইতে উক্ত ভ্রান্ত-বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে পারলৌকিক সংস্কারের বীজ রোপণ করিবার জন্য কতবার কত শত মহা যতির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের অভ্রান্ত ও অকাট্য যুক্তির নিকট মানুষের অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক প্রতিবাদ কেবলমাত্র বাঙ্নিষ্পত্তিহীন মস্তক-কণ্ডুয়নে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা মানবের উক্ত হৃদ্বিকৃতির নিরাকরণে সমর্থ হন নাই। সন্দেহের কুহেলিকা শতসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ নীরদনিবিড় ও ঘনীভূত ছিল, আজও সেইরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

আত্মা ও পরলোকের অস্তিত্ব লইয়া ইহসংসারে মানবমণ্ডলীর মধ্যে বহুবিধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও মত-পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন আত্মা আছে, পরলোক আছে, আবার কোন সম্প্রদায় উহার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। কেহ কেহ আত্মাকে চৈতন্য আখ্যা প্রদান করিয়া বলিতেছেন—

"জীব চৈতন্য অনন্ত চৈতন্যের অংশ, মানুষ সেই অনন্ত চৈতন্যের পরমাণু মাত্র লইয়া জীবনের খেলা আরম্ভ করে, আবার ক্রীড়াবসানে সেই ক্ষুদ্র কণিকা চৈতন্যসিন্ধুর অনন্তগর্ভে লীন হইয়া যায়।"

বৈজ্ঞানিক বলেন,—"জীবদেহ একটী যন্ত্রবিশেষ; যন্ত্রের ন্যায় দেহও নিয়মিত রূপে আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যন্ত্রের অতীত কোন পদার্থ দেহে নাই।" বাস্তবিক উপরিউক্ত মত সকল নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণার

সামগ্রী সন্দেহ নাই। উহার প্রভাবে সাধারণতঃই মানব-হৃদয় পাপাসক্তির পঙ্কিল প্রবাহে ভাসিয়া যাওয়াই সম্ভব; দুষ্ক্রিয়া ও নারকীয় প্রবৃত্তির ন্যক্কারজনক ঘৃণিত অভিনয়ে জগতের উন্নতিস্রোত একেবারেই প্রতিরুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না উক্ত জুগুপ্সিত জঘন্য মত হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে মানুষ স্বভাবতঃই মনে করে যে যদি জন্মেই জীবনের আরম্ভ, ও মৃত্যুতেই উহার চিরসমাধি হইল, তবে এই দিব্য সুন্দর মানব জীবন সুখসম্ভোগে অতিবাহিত না করি কেন? ইহকাল পরকাল, পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি বিচার করিতে গিয়া অনর্থক বিলাসবিরহিত ভাবে কঠোর তপশ্চর্য্যায় আত্মসমর্পণ করিয়া এই চলবিকল দেহকে ক্লেশ-কশাঘাতে জীর্ণ করি কেন? ইন্দ্রিয় পরিতর্পণ ও বিলাসজৃম্ভিত ভোগসুখের অমৃত নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া এক অনির্দ্দিষ্ট তামস মলিন শুষ্ক সন্দিগ্ধ শূন্য ভবিষ্যতের জন্য এমন কমলফুল্ল অমল যৌবনকে কঠোর সমাধির উষ্ণ নিশ্বাসে ক্লিষ্ট করি কেন? কি ভয়ঙ্কর আত্মবিভ্রম! কি সৃষ্টি-বিপর্য্যয়কারী প্রলয়ঙ্করী পরিকল্পনা! বলা বাহুল্য যে ঐ সকল আপাতরম্য মত-পথবর্ত্তী ব্যক্তিগণের পক্ষে মৃত্যুচিন্তা ভয়ানকেরও ভয়ানক। কিন্তু যাঁহারা আত্মা ও পারলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মস্তক পাপপুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের নিকট আপনা আপনি অবনত হইয়া পড়ে। ইহকালকৃত পাপপুণ্যের নিয়মিত ও সম্যক্ পরিপাক পরকালে অনিবার্য্যরূপে ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ একটা অকাট্য ও অভ্রান্ত বিশ্বাস স্বতঃই তখন তাঁহাদের মানসমন্দির অধিকার করে। এইরূপ অবস্থায় মানুষ জ্ঞানতঃ কখনই পাপের নরকপথ আশ্রয় করিতে চাহে না। মৃত্যুর নাম শুনিলে তখন উপেক্ষার হাসি হাসিয়া স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা করে,—

> "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
> নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
> ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

মৃত্যুই যদি জীবনের চরমা পরিণতি ও সুখদুঃখের চিরসমাধিই হইল, তবে সেই বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তি অনন্তজ্ঞানের চলপ্রভায় জগতের চক্ষু ঝলসিত করিলেন কেন? এতদিন উৎকট বাসনা ও জ্বলন্ত কৌতূহলের সহিত যে মহানাটকের প্রথম গর্ভাঙ্ক পাঠ করিলাম, ঐহিক লীলার পর্য্যবসানের পর আর কি তাহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে না? যদি পূর্ণ বিকাশের মনোমদ সৌন্দর্য্যে নয়ন-মনের তৃপ্তিসাধন করিতে না পারিলাম, তবে কেবল মাত্র কোরক দর্শনে অতৃপ্তির তুষানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া কেন এই আবর্ত্তভীষণ ভবসিন্ধুর বিশাল বক্ষে ঝম্প প্রদান করিলাম? যে অমৃত বীজ একদিন জীবনের মধুর প্রভাতে বাসনার উর্ব্বরক্ষেত্রে যত্নের সহিত উপ্ত, আশার স্নিগ্ধ শীতল প্রাণময় সলিলপ্রক্ষেপে অঙ্কুরিত, ক্রমবর্দ্ধিত, ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল কে আজ সেই কল্পপাদপের মূলোৎপাটন করিয়া শূন্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে? নৈতিক ও মানসিক আকাঙ্ক্ষার শেষ সমাধি কি কেবল মাত্র সেই দগ্ধভীষণ মরুময় শূন্য ভবিষ্যৎ? ইহা স্মরণ করিতেও গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠে। বলিতে পার ইহলোকে তুমি অনেক পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, জীবন-সংগ্রামে, জগতের কঠোর তিরস্কার, অন্তর্দাহকর নিন্দাবাদ, ও দুর্ব্বিসহ নিগ্রহ সহাস্যবদনে সহ্য করিয়া লোকহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলে;

তুমি বলিবে "যেখানে তোমার ন্যায় মহা-পাপীর প্রবঞ্চনা, শঠতা, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের লোমহর্ষণ অভিনয় সেখানে আমার মোহন পাঞ্চজন্যের সুগম্ভীর পুণ্য নির্ঘোষ। যেখানে তোমার মত বিষয়লিপ্সু সংসার-কীটের অবিদ্যার অমানিশি, সেখানে আমার নির্ম্মল জ্ঞান ও পবিত্র সাত্ত্বিক ভাবের পৌর্ণমাসী; যেখানে তোমার ন্যায় শোকজীর্ণ ও জরাভারগ্রস্ত ব্যাধিতের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, সেখানে আমার শুশ্রূষার মঙ্গলময়ী সুব্যবস্থা ও সহানুভূতির সুগভীর সান্ত্বনা; যেখানে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল জিহ্বা বিস্তারে জীবজগত্‌কে গ্রাস করিতে উদ্যত, সেখানে আমার অপরিমেয় দানকর্ম্মের মঙ্গলময় মুক্তহস্ত। স্বীকার করি, তোমার এই রাশি রাশি সুকীর্ত্তি নিচয়ের উপযুক্ত পুরস্কার ইহজীবনে দুর্লভ, তাহা বলিয়া কি তুমি পুরস্কারের জন্য ভবিষ্য পারলৌকিক জগতের প্রত্যাশাও রাখিবে না? অন্ততঃ এই সুবিচার ও ন্যায়পরতার জন্য কি পরলোকের আবশ্যক হইতেছে না? একজন সংকীর্ণ স্বার্থের পথ পরিস্কার করিবার জন্য অসংখ্য দেবাধিকরণ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তদুপরি স্বীয় ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিল; বিগ্রহশিলায় প্রাসাদের সোপান প্রস্তুত করিয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের নাম জগতের অভিধান হইতে মুছিয়া দিল; হে সাধুশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষ! তুমি কি বলিতে চাও যে, আমার ও তোমার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান নাই? বলিতে চাও কি যে তপোরত যোগী ও তৃষ্ণাদগ্ধ ভোগীর একই আখ্যা? একই অভিধান? ঐ যে প্রতিভাসম্পন্ন দেবোপম কবি, "ক্ষিপ্তগ্রহ সম ধরাতে আসিয়া জ্বলিয়া শেষ হইলেন," অতি নগণ্য জঘন্য অবস্থায় জগতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে স্বীয় কাব্যময় জীবন অতিবাহিত করিলেন; ঐ যে ক্রুশকাষ্ঠবিলম্বিত ধর্ম্মবীর উদার বিশ্বজনীন প্রেমে প্রমত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারী বিরুদ্ধবাদিগণের দৃপ্ত পদতলে আজীবন নিষ্পেষিত হইলেন, কণ্টকের কিরীট মস্তকে লইয়া জীবনসংগ্রামে অশেষ ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করতঃ অবশেষে শোনিতের অক্ষরে প্রেম ও পুণ্যের জয় সংসারপটে লিখিয়া গেলেন; উঁহাদের পুরস্কারের জন্য কি একটা বিভিন্ন জগতের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে না? তাহা যদি না হয়, তবে জানিব দেবতা মিথ্যা! সংসার মিথ্যা! সমস্তই মিথ্যা!

প্রীতি-সাধন।

আজকাল এদেশে ধর্ম্ম ও সমাজ লইয়া বিবিধ আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। আত্মার চিরকল্যাণ কিরূপে সাধিত হইতে পারে, গতিমুক্তির দ্বার কোন্ সাধনায় সহজে অনাবৃত হইতে পারে, কোন্ বন্ধনে জনসমাজকে গ্রথিত করিতে পারিলে অধিকতর সুখসৌভাগ্যের সংস্কার হইতে পারে তাহার মীমাংসায় অনেকেরই মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর আমাদের এতই প্রাণের ধন যে সহস্র সুখ সম্পদে বেষ্টিত থাকিলেও আত্মার ব্যাকুলতা কিছুতেই নির্ব্বাণ হইবার নহে। আরণ্যক ঋষিগণ বজ্র বিদ্যুতের ভয়ে ঈশ্বরের অমোঘ আশ্রয়ের একান্ত ভিখারী থাকিলেও, ধনীর উত্থান পতন রোগ শোক বিচ্ছেদ বিরহের মধ্যে যে ঈশ্বরের অভাব অনুভূত হয় না একথা হইতেই পারে না। যদি তাহা না হইত শাক্যসিংহ রাজসুখের মমতা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টতর সুখের উদ্দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন না, গৌরাঙ্গদেব সংসারের আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া পথের কাঙ্গাল হইতেন না। সর্ব্ব-

দেশে সর্ব্বকালে অগণ্য অসংখ্য নরনারী আপনাদের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে পারিত না।

পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রস্রবণ যেমন সহজে প্রমুক্ত হইয়া সহস্রধারে শীতল ও নির্ম্মল বারি উদ্গীরণ করিয়া অসংখ্য জীবের শ্রান্তি ও পিপাসা উপশান্ত করে, তেমনি আর্য্য ঋষিগণের অকপট হৃদয়কন্দর হইতে জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি-বিমিশ্রিত যে ধর্ম্মধারা মন্দাকিনীর ন্যায় বিগলিত হইয়া শত সহস্র বৎসর ধরিয়া এখনও এই পুণ্যভূমি ভারতের প্রত্যেক নরনারীর মন প্রাণকে কোমল ও আর্দ্র রাখিয়াছে, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখ দেখি। তাঁহারা জ্ঞানে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া প্রেমে তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া যে সকল মহাসত্য উপনিষদের প্রতিপত্রে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানগর্ব্ব লাঞ্ছিত হয়, হৃদয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। এই মৃত্যুময় সংসারে দাঁড়াইয়া হাহুতাশ ক্রন্দনরোল মর্ম্মযাতনার ভিতরে থাকিয়া আমাদের চক্ষু নিয়ন্তার কেবল রুদ্রমূর্ত্তিরই পরিচয় পায়, কর্ণ সর্ব্বসংহারক কালের ভীতি-পূরিত অট্টহাস্য শ্রবণ করে। কিন্তু তাঁহারা আমাদের ন্যায় মরণসঙ্কুল সংসারে থাকিয়া সাধনাপ্রভাবে এতই উন্নত অবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন যে সন্দেহবিকম্পিত কণ্ঠে নহে কিন্তু দৃঢ়তা ও ধীরতার সহিত বলিলেন "রসো বৈ সঃ। আনন্দই ঈশ্বরের রূপ; সনো'বন্ধু র্জনিতা।" সেই যে বিধাতা তিনি আমাদের বন্ধু, তাঁহার মত প্রিয়তম সুহৃদ আমাদের আর কেহ নাই। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি কখন বা আদিত্যে কখন অগ্নিতে কখন বায়ুতে কখন বা পর্ব্বতপাথারে কখন সপ্তম স্বর্গে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিফলে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তাঁহাদের দৈবদৃষ্টি জড়-আবরণ ভেদ করিয়া শরীরস্থ আত্মার মধ্যে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিল, প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে সর্ব্বাচ্ছাদক রূপে তাঁহার দর্শন পাইল। সকল উপকরণ সকল আড়ম্বর ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র ধ্যানযোগে ব্রহ্মসংস্পর্শে তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলেন।

যাঁহারা জ্ঞানে ও সাধনে আপ্তকাম হইয়াছিলেন তাঁহারা আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল সন্তানগণের জন্য কল্যাণগর্ভ-ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন উষর ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থকে স্বার্থ করিতে না পারিলে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না। আত্মসংপ্রসারণ ভিন্ন ঈশ্বর-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয় না। প্রীতি কৃতজ্ঞতার অনুশীলন ভিন্ন হৃদয় কোমল হয় না। তাই এদেশের সামাজিক প্রতি অনুষ্ঠানের ভিতরে প্রীতিভাব বিকাশের উপায় সকল অন্তর্নিহিত দেখা যায়। দেবতাবোধে পিতামাতার অর্চ্চনা, পরলোকবাসী হইলে প্রেতার্থে না হউক প্রীত্যর্থে দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান, অতিথি ও অভ্যাগতের সেবা, মধ্যে মধ্যে জ্ঞাতি কুটুম্ব ও প্রতিবেশী মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজহস্তে ভোজ্য পেয় পরিবেশন এ সকল হইতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, প্রীতিভাব বদ্ধমূল হইয়া আইসে, হৃদয় বিনয়নম্র হয়। প্রকৃত ভ্রাতৃভাব যে বিবর্দ্ধিত হয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

যে পরমপিতা পরমমাতার রাজ্যে থাকিয়া আমরা তাঁহার অপার উদার করুণা সম্ভোগ করিতেছি, তাঁহার চরণে প্রীতি কৃতজ্ঞতার পূর্ণাঞ্জলি অর্পণ করিবার সামর্থ্য ও অধিকার বাস্তবিকই এই সকল বা এইরূপ অনুষ্ঠান বা কার্য্যে জন্মিবার সম্ভাবনা।

সকলের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হও, আজকালকার দিনের ভ্রাতৃভাবের কথা কি! "ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ" শত্রুর প্রতিও পাপাচরণ করিও না। জগতে সকলের কল্যাণ কামনা কর। এমন কি যখন তাঁহাদের দেহান্ত হইবে, তখনও যেন প্রীতির উষ্মা তাঁহাদের উদ্দেশে উত্থিত হয়। তখনও যেন সমস্ত হৃদয়ের সহিত বলিতে পার—

"যেহ বান্ধবাবান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু।"

যাঁহারা আমাদের শত্রু মিত্র সকলেই তৃপ্তি-সুখ উপভোগ করুক। প্রীতিবৃত্তিকে আরও জাগ্রত ও সমুন্নত করিয়া যেন বলিতে ইচ্ছা কর—

"মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ বৃক্ষাঃ দৃষ্টা অদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।"

সখা মিত্র এমন কি পশু বৃক্ষ সকলও সুতৃপ্ত হউক। প্রীতির কি গভীর উচ্ছ্বাস! শত্রু মিত্র পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম এ সকলের সহিত মৈত্রীবন্ধন না করিলে বুঝি আমাদের প্রীতি ভক্তি ঈশ্বরের চরণতল স্পর্শ করে না! পঞ্চযজ্ঞাত্মক এই সকল কঠোর কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ছিল বলিয়াই এই হিন্দু-সমাজ এত রাজবিপ্লবের মধ্যেও তিরোহিত হয় নাই। তাহার হৃদয়ের অমায়িক কোমলতা এখনও নির্ব্বাসিত হয় নাই। এখনও এ দেশের লোক তড়াগ মন্দির ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ও অন্নদানে মুক্তহস্ত। এখনও পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধ সময়ে যজমান প্রার্থনা করে "দাতারো নো হভিবর্দ্ধন্তাং" "বহুদেয়ঞ্চ নোস্ত্বিতি" দেয়-দ্রব্যে গৃহ পরিপূরিত হউক "যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু" আমাদের নিকট প্রার্থীগণ আগমন করুক। কিন্তু বলিতে কষ্ট হয় যে এই সকল হৃদয়-ব্যাপার আমাদের দেশ হইতে না হউক সভ্যতার আকরস্থান নগর-উপনগর হইতে ক্রমিকই চলিয়া যাইতেছে। তাহার স্থান বিলাসিতা ও আত্মাভিমান আসিয়া পূর্ণ করিতেছে। ধনীর গর্ব্বিত দৃষ্টির ভিতরে কারুণ্যভাব আজকাল তিরোহিত, দয়াস্রোত ক্রমিকই রুদ্ধমার্গ। প্রীতি দয়া কারুণ্য বিনয় বিসর্জ্জন দিয়া জানি না কোন্ সাহসে সেই বিশ্বজননীর অনুকম্পা ভিক্ষা করিব। মুক্তির ভিখারী হইয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে দাঁড়াইবার কিরূপে যোগ্য হইব। ভোগের অনুকূল করিয়া সমাজ গঠন করিতেছি, জানি না কোন্ ভরসায় সেই আর্য্যকুলদেবতার সিংহাসন আমাদের মধ্যে রচনা করিব। এত নিরাশা এত প্রতিকূলতার ভিতরে তাঁহার অপার করুণাই আমাদের একমাত্র সম্বল "স দেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দিন যে আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়া মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট হই।

প্রান্তরে।

(সন্ধ্যায়।)

ভাব কি নীরব কি নীরব
এই প্রান্তরে;
জাগে শান্ত অনাহত রব
মম অন্তরে।
নীলাকাশে দূরে নীলবন—
সান্ধ্য তপন।
চিত্র মর্ম্মরে আনে পবন
সান্ধ্য স্বপন।
সূর্য্য ডুবে যায় অস্তাচলে
পশ্চিম দিকে;
চাঁদ ওঠে পূবে তারা জ্বলে
হলুদে ফিকে।
আকাশের কথা কাণে আসে
কেমন ফাঁকা;

শূণ্যে রবি শশী তারা হাসে
কি ছবি আঁকা!
হেথা ব'সে আছি ব'সে থাকি
মুক্ত হৃদয়,
এ অনন্তে কে রেখেছে আঁকি
এ সমুদয়?

প্রেরিত।

শুভ পুণ্যাহের উৎসব।

গত ২৭ আষাঢ় শুক্রবার পরম পুণ্যবান পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পরগণে কালী গ্রামের জমিদারী কাছারির শুভ পুণ্যাহ কার্য্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তথায় প্রাতঃকাল হইতে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়াছিল এবং কাছারীবাটী নানা প্রকার পত্র ফল ও ফুলের দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। ধূপধূনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন-কালে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির পর ব্রহ্মোপাসনা হয়। তৎপরে অন্ধ, খঞ্জ, বধির ও কাঙ্গালি-দিগকে কাপড় ও অর্থ প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল। তৎপরে বহুসংখ্যক প্রজাকে ও কাঙ্গালিদিগকে উত্তম রূপে ভোজন করান হইয়াছিল এবং অপরাহ্নে লাঠিখেলা পাথর খেলা প্রভৃতি হয়। তথায় ব্রহ্মোপাসনা হইয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল।

যাঁহার কৃপায় আমরা সম্বৎসরকাল সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অদ্য এই নববর্ষে উপনীত হইয়াছি, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা এবং মুক্তিদাতা বিধাতা, যিনি এই বিশ্বরাজ্যের রাজা, যিনি আমাদের জন্য ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ নি-য়ত প্রেরণ করিতেছেন, যাঁহার কৃপায় আমরা প্রতিদিন অন্ন জল লাভ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছি, আইস, আজ আমরা সকলে একত্র হইয়া সেই মঙ্গলময় পিতার চরণে বারবার নমস্কার করি, তাঁহাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। আইস, আজ আমরা সকলে মিলিয়া এই শুভ দিনে শুভ মুহূর্ত্তে এই শুভ পুণ্যাহের প্রথমে সেই সত্যসুন্দর মঙ্গল-স্বরূপকে প্রীতি-উপহার দিয়া জীবন সার্থক করি।

হে মঙ্গলময় পিতা, তুমি অনন্ত দয়ার সাগর, তুমি পরিপূর্ণ প্রেমানন্দময়। তো-মার মঙ্গলময় রাজ্যে অমঙ্গল কখনই চির-স্থায়ী হইতে পারে না। ধন্য তোমার করুণা। ধন্য তোমার দয়া। হে করুণা-নিধান, তোমার দয়ার সীমা নাই। তোমার অপার করুণাবলে এবার সুবৃষ্টি হওয়ায় বিপৎপাতের আশঙ্কা আর নাই। কৃষকগণ হৃষ্টচিত্তে কাজকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আমাদের হৃদয়েও আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে।

হে কৃষকনিচয়! তোমরা এই অসার ও অনিত্য সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সেই মঙ্গলময় পিতাকে ভুলিয়া থাকিও না। তাঁহার কোনরূপ অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিও না। তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম্ম করিও না। তিনি তোমাদের মঙ্গলের জন্য সময়ে সময়ে যদিও বিপদের ভয় প্রদর্শন করেন কিন্তু যখনই তোমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হও তিনি তখনই তোমাদের উপর অজস্র করুণাবারি বর্ষণ করিয়া থা-কেন। তিনি তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয়কে সুশীতল করিয়া থাকেন। তিনি তোমাদি-গকে তাঁহার অভয় ক্রোড়ে লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকেন। হে প্রজাবর্গ! তোমরা নিশ্চিত জানিও যে মঙ্গল বিধাতার মঙ্গল হস্ত তোমাদের জন্য নিয়তই প্রসারিত আছে। অতএব তোমাদের সুখের সময় যদি তোমরা তাঁহার প্রসাদ স্মরণ না কর,

যদি অন্ন পানে পুষ্ট হইয়া সেই অন্নদাতাকে মনে না কর তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল কোথায়।

হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পিতা! আজ নববর্ষের এই শুভ পুণ্যাহের দিনে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কায়-মনোবাক্যে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি এখানকার এই দীনহীন প্রজাগণের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন করিয়া দাও। ইহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা বিধান কর। ইহাদের প্রত্যেকের গৃহে সুখ শান্তি বিধান কর। ইহাদের ধর্ম্মে মতি দাও। তোমার সত্যধর্ম্ম ইহাদিগের নিকট প্রেরণ কর। এখানকার কর্ম্মচারীগণ সুস্থ শরীরে থাকিয়া যাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। আর আমাদের সত্যনিষ্ঠ দয়াবান প্রজাপালক রাজার দীর্ঘায়ু প্রদান কর, এবং তাঁহার পরিবারবর্গের কল্যাণ বিধান কর। তোমার নিকট এই আমাদের প্রার্থনা ও ভিক্ষা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, জ্যৈষ্ঠ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৫২৷০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬০১।/৯
সমষ্টি	...	৮৫৩॥/৯
ব্যয়	...	৩০৩/৯
স্থিত	...	৫৫০॥০

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৫০॥০

৫৫০॥০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯৮৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বসু ৫৲

পুরাতন বাতিল কাগজ বিক্রয়ের মূল্য ৩৲

১৯৮৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২০৸০
পুস্তকালয়	...	২৷০
যন্ত্রালয়	...	২৯৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		২৲
সমষ্টি		২৫২৷০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯১৶৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২০৲
পুস্তকালয়	...	/৯
যন্ত্রালয়	...	৯১৸৯
সমষ্টি		৩০৩/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ১ আশ্বিন বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাক মাশুল।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অখণ্ড সত্য-বস্তু কি ?

পরমার্থ তত্ত্ব বা সত্য লইয়া বহুকাল হইতে জগতে মতভেদের স্রোত প্রবাহিত হইয়া, বিবাদ বিসম্বাদ অশান্তিরূপ ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই স্রোত শতমুখী হইয়া লোকসমাজে বিশেষ কষ্টের হেতু হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পুরাকালে ইদানীন্তনের ন্যায় মতভেদের এত প্রসার ছিল কি না সন্দেহ। যদি মত গ্রহণ বা ত্যাগের দ্বারা শান্তি লাভের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে একটা না একটা মত অবলম্বন করিয়া প্রত্যেকেরই শান্তি লাভের উপায় হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাহার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। সম্পূর্ণ বিপরীত ফলই লক্ষিত হয়। এক মতামতের বিরোধ জন্য কষ্ট, আর এক গৃহীত মতের অতৃপ্তিকর অপূর্ণতা হেতু কষ্ট। মতামত যেন পোষাকী সামগ্রীর ন্যায় আবশ্যক অথচ প্রতিদিনের অভাব মোচনে অক্ষম। সমাহিতচিত্তে সংযতভাবে কান পাতিলেই বোধ হয় যেন চারিদিক আর্ত্তনাদে পূর্ণ, জগৎ যেন মরুভূমির যাত্রীর ন্যায় নিরাশ্রয়। অথচ মতামতের সীমা নাই। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, স্বভাববাদ, একেশ্বরবাদ, অনেকেশ্বরবাদ নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি অসংখ্য বাদে জগৎ আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সকলেই আপন মতের শ্রেষ্ঠতা ও অপরাপর মতের নিকৃষ্টতা প্রচার করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়পুষ্টির জন্য যত্নবান। ফলে মান অপমান জয় পরাজয় দ্বেষ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই দুঃখ ভোগ করিতেছেন। প্রীতিপূর্ব্বক সকলে সম্মিলিত হইয়া শান্তিভোগের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা যায় না। দুঃখে জন্ম গ্রহণ করিয়া দুঃখেই মৃত হইবে এই উদ্দেশেই কি মনুষ্যের জীবন, না, শান্তিলাভের কোন উপায় আছে, যাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক অবলম্বন করিলে জীব সুখে শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

সকলেই বলেন সত্য লাভে শান্তি এবং সকলেই নিজ নিজ মতকে সত্য বলেন অথচ জগতে শান্তি নাই ইহার কারণ কি? ইহার কারণ হইতে পারে দুইটী। হয় সত্য লাভে শান্তি নাই, না হয় সত্য লাভ হয় নাই। ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণের জন্য বিচারের প্রয়োজন। মনুষ্যমাত্রেই

বিচারের অধিকারী, চেতনের কার্য্যই বিচার। যে পদার্থ যাহা তাহাকে সেই পদার্থ বলিয়া গ্রহণের যে চেষ্টা তাহারই নাম বিচার। বিচার না করিয়া যে ধারণা অর্থাৎ কোন্ পদার্থ কি তাহা নিজে অনুভব না করিয়া বংশপরম্পরাগত বা অপরের নিকট শুনিয়া যে বিশ্বাস তাহার নাম সংস্কার। এই সংস্কারই বিচার-প্রবৃত্তির বিরোধী। যেমন বিচারের ফলে সত্য লাভ তেমনি সংস্কার প্রকৃত সত্যলাভের অন্তরায়। সত্য শব্দের দ্বারা যে বস্তু লক্ষিত বিচারের দ্বারা অন্তঃকরণ সেই বস্তুর অভিমুখী হইলে আপনা হইতে সত্যলাভ বা বস্তুবোধ ঘটে, যেহেতু যে বস্তু সত্য তাহা স্বতঃপ্রকাশ অর্থাৎ নিজে যাহা তাহাই, মতামত, বোধাবোধের জন্য তাহার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অনুভব না করিয়া সেই বস্তু ইত্যাকার এই যে ধারণা বা বিশ্বাস তাহাই সংস্কার। সংস্কারকেই সত্য-বস্তু বলিয়া ধরিলে সত্য-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য থাকে না এবং সত্যলাভের চেষ্টা নিরস্ত হয়।

যাঁহারা সংস্কার বা বিশ্বাসকেই সত্য বলিয়া ধরেন তাঁহারা বিচার-প্রবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য বলেন যে বিচারের দ্বারা সত্য লাভ হয় না, নতুবা বলেন, যে বিচারের দ্বারা সত্য লাভ হয় তাহা মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি নহে। ক্ষণজন্মা ঋষি মুনি মহাত্মা অবতারগণই সেই বিচার-শক্তি-সম্পন্ন। এইরূপ বিশ্বাসের আশ্রয় লইলে আমাদিগকে বিশ্বাস-সর্ব্বস্ব হইয়া অনুভবের দ্বারা সত্যলাভের আশা পরিত্যাগ করিতে হয় এবং সত্য লাভ বিনা শান্তি নাই ইহা সত্য হইলে সেই সঙ্গে শান্তির আশাও বিসর্জ্জন দিতে হয়! কিন্তু মনুষ্যের বিচারশক্তি নাই ইহা কাহারো অভিমত নহে, কেবল সত্য নির্দ্ধারণের যোগ্য বিচারশক্তি সাধারণ মনুষ্যের আছে কিনা ইহাতেই সংশয়। এ সংশয় নিবৃত্তির জন্য দেখিতে হইবে যে সত্য শব্দের দ্বারা কি লক্ষিত হয়—মতামত লক্ষিত হয় কি মতামত-নিরপেক্ষ কোন বস্তু লক্ষিত হয়? যাহা আছে অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও যাহা আছে, তাহাই কি সত্য, না অলৌকিক অদ্ভুত যাহা কোন কালে নাই তাহারই নাম সত্য? যাহা নাই তাহারই নাম যদি সত্য হয় তবে তাহা প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি না এবং থাকিলেও তদ্দ্বারা শান্তি হইতে পারে কি না? যাহা আছে তাহারই নাম যদি সত্য হয় তবে দেখিতে হইবে যে আমরা অনুভবের দ্বারা কি বস্তু আছে বলিয়া পাইতেছি। আমাদের ভিতরে পাঁচ ইন্দ্রিয় পাইতেছি ও তাহার অনুযায়ী বাহিরে পাঁচ তত্ত্ব পাইতেছি, ইহার অতিরিক্ত ভিতরে মনোবুদ্ধি অহঙ্কার পাইতেছি, আপাততঃ বাহিরে তাহার অনুযায়ী কিছু পাইতেছি না। মনোবুদ্ধিযুক্ত যে অহঙ্কার বা আমি এই আমার জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তিন্ন অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের আলোচনায় আরো দেখিতেছি যে পাঁচ ইন্দ্রিয়, পাঁচ তত্ত্ব, মনোবুদ্ধি অহঙ্কারের ব্যাপার এক শ্রেণী যাহাকে প্রকাশ বলা যায় ও সর্ব্বব্যাপার-রহিত সুষুপ্তি অপর এক শ্রেণী যাহাকে অপ্রকাশ বলা যায়। প্রকাশ ও অপ্রকাশ এই দুই ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাবে বস্তু অর্থাৎ যাহা আছে তাহা কাহারো জ্ঞানগোচর হয় বা হইতে পারে কি না? প্রকাশ ও অপ্রকাশ কি বস্তু ছাড়া অপর কিছু কি বস্তুরই প্রকাশ অপ্রকাশ!

যিনি বা যে বস্তু প্রকাশ ও অপ্রকাশ শব্দের দ্বারা লক্ষিত অথচ প্রকাশ বা অপ্রকাশ ভাব বা শব্দ বা অবস্থার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, প্রকাশ ও অপ্রকাশ যাঁহার

অন্তর্ভূত—প্রকাশ এবং অপ্রকাশ যাঁহা হইতে বিভিন্ন সত্তাবিহীন—এবং প্রকাশ ও অপ্রকাশ যাঁহারই শক্তি তাঁহারই সত্য এই এক নাম কল্পিত হইয়াছে কি না? সত্তার সহিত সমস্ত শক্তি রূপ গুণ ক্রিয়া নিরাকার সাকার প্রকাশ অপ্রকাশ ভাব লইয়া সত্যের বা পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান অসীম অখণ্ডাকার নির্ব্বিশেষ পূর্ণ হওয়াই সম্ভব কি না? এক কথায় আমরা যাহা কিছু জানি বা জানি না, দৃশ্য অদৃশ্য যাহা কিছু আছে আমাদিগকে লইয়া সেই সকলের সমষ্টির নামই এক সত্য বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কি না?

অপ্রকাশে লাভালাভ নাই প্রকাশেই লাভালাভ। সত্য এই নামের দ্বারা যাঁহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে প্রকাশ ভাবেই লাভ করিতে হইবে বা করা যাইবে অর্থাৎ নিজে প্রকাশমান হইয়া প্রকাশমান সত্যকে লাভ করিতে হইবে। প্রকাশমান ভাবে ভিন্ন সত্য লাভ হয় না এবং প্রকাশমান সত্যকে লাভ করিলে প্রকাশ অপ্রকাশ উভয়াত্মক পূর্ণ অখণ্ডাকার সত্যকে লাভ করা হয় কেননা সত্য প্রকাশেও পূর্ণ অখণ্ড অপ্রকাশেও পূর্ণ অখণ্ড! অতএব পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে প্রকাশ অপ্রকাশের বিরোধ না ঘটাইয়া যাহাতে পূর্ণভাবে তাঁহাতে আশ্রয় লাভ করিতে পারি ও তাঁহাতে নিষ্ঠাবান হইয়া বিচার পূর্ব্বক জগতের হিতানুষ্ঠান রূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে ব্রতী হইতে পারি ইহাই আমাদের সকলের কর্ত্তব্য এবং মনুষ্য জীবনের ইহাতেই একমাত্র তৃপ্তি শান্তি ও কল্যাণ।

হে মাতা পিতা আত্মা জগদ্‌গুরু, আপনি নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। আমরা অজ্ঞান-আচ্ছন্ন হইয়া জগতে মতামত প্রকাশ করিয়া ও আপনার মধ্যে নানা প্রকার উপাধি কল্পনা করিয়া জগতে যে বিরোধ অশান্তি বিস্তার করিতেছি তাহা ক্ষমা করুন। আপনি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে যে ক্ষমা করিবে। হে দয়াময়, আমরা নিরাশ্রয় আপনার দয়াই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। হে স্বতঃপ্রকাশ, আমাদের সমস্ত অজ্ঞানতা ঘুচাইয়া আপনি পূর্ণরূপে প্রকাশ হউন এবং আপনার কি প্রিয়কার্য্য তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া তৎসাধনে যত্নশীল করুন। আপনার কৃপা ব্যতীত আপনার প্রিয়কার্য্য সাধনে সামর্থ্য হওয়া দূরে থাকুক রুচিও হয় না। আপনি জগতের প্রতি এই দয়া করুন যাহাতে জীব মাত্র আপনাকে পূর্ণরূপে চিনিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভবানীপুর পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮২৪ শক, ৯ই আষাঢ়।

আনন্দ।

কতকাল পূর্ব্বে ভারতীয় ব্রহ্মর্ষিরা যে মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, আজি আমরা এই পবিত্র স্থানে তদ্বিনির্গত মধুপান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। কত কাল পূর্ব্বে সেই তপোবনে বসিয়া তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন,

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি, আনন্দরূপমমৃতং, আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।"

আজি আমরা সেই সকল সুধাময় মহামন্ত্র উৎসাহ সহকারে উচ্চারণ করিতেছি।

পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ, তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি আপনার মহিমাতেই আপনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, আপনার আনন্দে

আপনি বিভোর ছিলেন! তাঁর ইচ্ছা হইল, আর সমুদয় জগৎ তাঁহার চরণতলে উদ্ভাসিত হইল! তিনি জগতের মাতা সবিতা, জগৎ প্রসবিতা। সেই আনন্দময় ঈশ্বর জগৎ স্থষ্টি করিয়া জগতের অণুপরমাণুতে ওতপ্রোত হইয়া রহিলেন। কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে আনন্দময়, তিনি মনুষ্যকে আপন সাদৃশ্যে স্থষ্টি করিলেন। জগতে তাঁহার শোভা তাঁহার আনন্দরূপ ফুটিয়া পড়িল। তাঁর কি এই ইচ্ছা হইতে পারে যে পৃথিবী ক্রন্দনে পূর্ণ হউক, সকলে বিষাদ ও নিরানন্দে থাকুক? এমন কখনই হইতে পারে না। তাহা হইলে, তাঁহার দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে। তিনি সূর্য্যকে জগৎ-প্রাণ করিয়া স্থষ্টি করিলেন। সূর্য্য না থাকিলে, কোথায় উদ্ভিদ্ আর কোথায় বা জীবজন্তু। কেহই জন্মিত না, কেহই জীবিত থাকিত না। কেবল এই মাত্র করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। সূর্য্যকে তিনি এমন জ্যোতিঃ এমন রূপ দিলেন, যদ্দর্শনে জগতের যাবতীয় জীব তাহাদের অজ্ঞাতসারেই আনন্দিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের প্রখর জ্যোতি চন্দ্রে পাতিত করিয়া তিনি কি স্নিগ্ধ জ্যোতিরই স্থষ্টি করিলেন। সে জ্যোৎস্না দেখিয়া কাহার না হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করে? অন্ধকার নিশীথে যখন প্রাসাদের উচ্চ ছাদে বসিয়া অযুত অগণ্য তারকাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে হয়, যেন তাহারা সেই গুরুর গুরু মহাগুরুর নিকট হইতে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ধরণীতলস্থ লোকদিগকে তাহা শিক্ষা দিতেছে। বৃক্ষ সমুহের মধ্য দিয়া তৎকালে দক্ষিণানিল বহিতে থাকিলে, মনে হয়, কে যেন তাহার মধ্য হইতে বলিতেছে, "আমি সেই করুণাময়ের নিকট হইতে তোমাদের শান্তির জন্য আসিতেছি।" হরিৎবর্ণ দুর্ব্বাদলপূর্ণ প্রশস্ত ক্ষেত্র, তরু-সমন্বিত উন্নত পর্ব্বত, তুষারাবৃত সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত ধবলগিরি, সরোজশোভিত সরোবর, বিকসিতকুসুম কানন, নদ হ্রদ প্রস্রবণ, এমন কি বিস্তীর্ণ তৃণহীন মরুভূমি দেখিবামাত্র মনে কি আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। এই জগৎ তাঁহার রঙ্গ-ভূমি। এখানে দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন—শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া কেমন শোভা বিস্তার করিতেছে! কেমন চিত্ত প্রফুল্ল করিতেছে! তিনি এখানে কত ফলের স্থষ্টি করিয়াছেন, কেবল মাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তি ত তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কেমন সুমিষ্ট রসে তিনি তাহাদিগকে পূর্ণ করিয়াছেন! আমাদের মনে আহ্লাদ সঞ্চার করাই কি তাঁর অভি-প্রেত নয়? আবার অন্তর্জ্জগতের বিষয় আলোচনা করিলে আরো বিস্মিত হইতে হয়। ইহাতে তিনি শত শত আনন্দের খনি দিয়াছেন। দয়া প্রেম স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি উজ্জ্বল রত্ন সকল তথায় শোভা পাইতেছে। তাহারা এই অন্ধকার জগতের আলোক। কি আনন্দই তাহারা এই আত্মায় আনিয়া দেয়! আপনার আহারের কষ্ট করিয়া যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি যখন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন ও তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে কি অনুপম সুখেরই উদয় হইয়া থাকে। দহ্যমান গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সাহসী ধার্ম্মিক ব্যক্তি যখন অন্যকে তথা হইতে বাহির করিয়া আনেন তখন তাঁহার মনে কি অসীম আনন্দেরই আবির্ভাব হয়! হৃদিস্থিত প্রেমের কি দুর্জ্জয় প্রতাপ! সাধ্বী স্ত্রী যখন স্বামীর জন্য দুঃখে শোকে রোগে বিপদে প্রাণপণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেই দারুণ বিষাদময় হৃদয়ের অন্ধকার মধ্যে যে আন-

ন্দের আলোক প্রচ্ছন্নভাবে জ্বলিতে থাকে, ঈশ্বর ভিন্ন কে আর তাহা দেখিতে পায়? সীত সাবিত্রী ও ডেস্‌ডিমনাকে দেখ— দেখিবে দুঃখ দুর্দ্দিনেও তাঁহাদের হৃদিস্থিত প্রেম আরো কত উজ্জ্বলতররূপে দীপ্তি পাইয়াছিল। দুঃখই তাঁদের আনন্দ! সে অতি উচ্চতর আনন্দ।

সন্তানের প্রতি মাতার কি প্রগাঢ় স্নেহ; এই স্নেহের জন্য কত মাতা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছেন; তাহাতেই তাঁহাদের আনন্দ! ভক্তি হইতে কি আনন্দই না আত্মা অনুভব করিয়া থাকে। পিতা মাতা গুরু ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে মনুষ্য দেবতুল্য হয় এবং দেবতাদের সঙ্গে সমানরূপে আনন্দ ভোগ করেন। ভক্তিতে তদ্গতচিত্ত হইয়া যখন এই অনিত্য সংসার ভুলিয়া যান, যখন প্রেমাশ্রুতে তাঁর হৃদয় ভিজিয়া যায়, তখনকার আনন্দ কে পরিমাণ করিবে? ধর্ম্মের প্রতি শিখদিগের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহারা জীবনে মরণে ধর্ম্মের আনন্দ ভোগ করিয়া ছিলেন! যখন দিল্লীর মোগল সম্রাট তাঁহাদের প্রতি ঘোরতর পীড়ন করিয়া বলিলেন, ছাড় তোমাদের ধর্ম্ম, তোমাদের স্বধর্ম্ম ছাড়। তাঁহারা অটল রহিলেন। তাঁহাদের শিরশ্ছেদন হইল। তবুও তাঁহারা ধর্ম্মের আনন্দ ছাড়িলেন না। তাঁহারা প্রাণের প্রাণকে লইয়া আনন্দধামে চলিয়া গেলেন। রোগ শোক লজ্জা অযোগ্য তিরস্কার দারিদ্র্য এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত পবিত্র মনের আনন্দকে দূর করিতে পারে না। অতিবড় দুঃখের দিনেও দেখা গিয়াছে—ভক্তের মনে স্বর্গীয় আনন্দ ও স্বর্গীয় গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। এ সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গ তুফান তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না; কারণ, তিনি জানেন যে, তরঙ্গ তাঁহাকে অনুকূল বন্দরেই লইয়া যাইবে। একমাত্র অপবিত্রতা একমাত্র পাপই এই আনন্দভাবকে নষ্ট করিতে পারে। আমরা মনুষ্য সহজেই দুর্ব্বল। দুর্ব্বলতা আমাদের আসিতেই পারে। তার জন্য অনুতপ্ত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ সকল তিনি কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। পুনর্ব্বার হৃদয়ে বিমলানন্দের উদয় হয়। কিন্তু দুর্ব্বলতা এক আর ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপ করা আর। সেই বিশ্বাসঘাতক ম্যাক্‌বেথ স্বীয় প্রভু বৃদ্ধ রাজা ডন্‌কানকে নিজবাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার কি সর্ব্বনাশই করিল! অর্থলোভে রাজ্যলোভে ঘোর অন্ধকার নিশীথে যখন পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হইতেছিল, তখন ঐ দুর্বৃত্ত নিস্তব্ধ ভাবে, মহারাজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিল। রাজা যে পার্শ্বে ছিলেন, সেই পার্শ্বেই রহিলেন। তাঁহার চিরনিদ্রা উপস্থিত হইল। কিন্তু যিনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং তিনি ম্যাক্‌বেথের নিদ্রা চির জীবনের নিমিত্ত হরণ করিলেন। ঈশ্বরের বজ্র তাঁহার হৃদয়ে পড়িল। মৃত্যু অপেক্ষা শতগুণে প্রচণ্ড যে হৃদয়ের অশান্তি, হৃদয়ের জ্বালা তাহা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। এ সংসারে সকল ম্যাক্‌বেথেরই এই গতি।

ধন প্রাণ অপেক্ষা যশ কি মহত্তর নহে? যাহারা পরের সুচরিত্রকে কুচরিত্ররূপে প্রচার করিয়া হৃদয়ে আঘাত দেয় তাহারা নরহন্তা অপেক্ষাও অধম। ঈশ্বর তাহাদের জন্য যে কি শাস্তি রাখিয়াছেন, তাহা তাহারাই জানে। অতএব পরের ধনে, পরের রাজ্যে পরের শ্রীতে, পরের যশে, পরের কোন কিছুতে আঘাত করিলে কিছুতেই নিস্তার নাই। ঈশ্বর পরপীড়নকারীকে সকল আনন্দে বঞ্চিত করেন। এবং পরলোকে তাহাদের জন্য যে কি অসদ্গতি অপেক্ষা

করিতেছে তাহা অন্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন্। অতএব যদি আমরা এখানে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া থাকি—তাঁর ইঙ্গিত ধরিয়া চলি, আনন্দের কোন অভাবই হইবে না। হে আনন্দময়! তোমার মঙ্গল স্বরূপে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় রাখ। যদিও তুমি এখানে সুখের সঙ্গে সাংসারিক দুঃখের বিধান করিয়াছ, সে কেবল এই জন্য যে আমরা এখানকার সুখে অতৃপ্ত হইয়া মহত্তর সুখের ব্রহ্মানন্দের জন্য পিপাসু হইব। এ সংসার হইতে আনন্দধামে লইয়া যাইবার তোমার কৌশলই এই। হে দেব! তোমার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া যদি সহস্র দুঃখ সহ্য করিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি যেন পাপযন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়। তুমি আমাদের দুর্ব্বলতা দূর কর—পাপ সকল দগ্ধ কর, হৃদয়ে শান্তি দাও; ব্রহ্মানন্দে আমাদিগকে আপ্লাবিত কর। এই আমাদের তোমার নিকট প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ওম্।

চলিছে বিশ্বের মাঝে মহা জজ্ঞ হোম
অনন্ত অনলমাঝে ওঠে ধ্বনি ওম্
ও ... ...ম্ ব্রহ্মাগ্নির শব্দ
শব্দহীন মহাশব্দ গভীর নিস্তব্ধ!

বট বৃক্ষতলে

আকাশে বিস্তৃত করি' শাখা প্রশাখা
বৃদ্ধবট রহিয়াছে দণ্ডায়মান;
তাহে ব'সে কত পাখী ঝাপটে পাখা
কত পাখী কত প্রকার করে গান।
তলে তার ছোট ছোট শিলা অনেক
র'য়েছে প'ড়ে সাদা কালো রাঙা রাঙা,
অদূরে দাঁড়ায়ে গিরি প্রকাণ্ড এক
চৌদিকে ভূমি অসমান ভাঙা ভাঙা।
একেলা বসিয়া আছি বটের তলে—
গাছটি কি স্তব্ধ কি ঘন কি প্রকাণ্ড!
মনে আসিছে উপনিষদ কি বলে—
'বৃক্ষ সম স্তব্ধ একে' পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড'
স্তব্ধ হ'য়ে করিছেন কত কি কাণ্ড!

ঈশ্বরের জ্ঞানাকাঙ্খা।

প'ড়ে আছি একপ্রান্তে
হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
দীন হীন অতি;—
ইচ্ছা হয় তাঁরে জান্তে,
কে দিবে সে জ্ঞান?
আমি মূর্খ অতি।

চারিধারে দেখি চেয়ে
যেন অন্ধকার
সব মনে হয়;
অন্ধকারে আছে ছেয়ে
পরাণ আমার,
মনে কি সংশয়!

এ অজ্ঞান অন্ধকারে
জাগিবে আমার
কি সুখ স্বচ্ছন্দ?
তাঁরে যে জানিতে পারে
কি আনন্দ তার?
তার কি আনন্দ?

পর্ব্বতে যোগী।

নির্ম্মল নীলিমা জাগে, নাহি বায়ু বেগ,
শরদ আকাশে শুধু একখণ্ড মেঘ

ভাসিছে আপন মনে যেন উদাসীন,
শূন্য জলে, গিরিপরে র'য়েছে আসীন
আঁখি মুদি' জটাধারী এক যোগীবর ;
পর্ব্বতের সানুদেশে স্বচ্ছ সরোবর,
বন্য হংসীদল তাহে করে সুখে খেলা,
কোন কোলাহল নাই, কেমন একেলা
যোগীবর সঁপি নিজে অনন্তের পদে
ধ্যানমগ্ন লভিবারে অসীম সম্পদে।

সার সত্যের আলোচনা।

সত্য-জগৎ এবং ভাব-জগৎ।

ব্রহ্মাণ্ড আশ্চর্য্য এবং তাহার আদি, অন্ত এবং মধ্য, সকলই আশ্চর্য্য। ব্রহ্মাণ্ড এক বই দুই নহে; অথচ তাহাই, এক-ব্রহ্মাণ্ডই, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। একই সূর্য্য, যাহা উদিতও হয় না—অস্তমিতও হয় না, তাহা একই সময়ে পৃথিবীর একস্থানে নবোদিত প্রাতঃসূর্য্য, আর-এক স্থানে প্রখর মধ্যাহ্ন-সূর্য্য, আর-এক স্থানে অস্তোন্মুখ দিনান্ত-সূর্য্য। মূলে যাহা একই অভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, ফলে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। একই ব্রহ্মাণ্ড সুখী ব্যক্তির সুখের পুষ্পোদ্যান, দুঃখী ব্যক্তির দুঃখের কণ্টক-বন; কর্ম্মীর কর্ম্ম-ক্ষেত্র, জ্ঞানীর আলোচনা-ক্ষেত্র; কবির নাট্য-শালা, উদাসীনের পান্থ-শালা; শুষ্ক তার্কিকের মরুভূমি, দুরাকাঙ্ক্ষের মৃগ-তৃষ্ণা; সাধকের গুরুগৃহ, ভক্তের পিতৃগৃহ; সাধু-সজ্জনের পুণ্যতীর্থ, মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মধাম। গোড়া'র সেই-যে এক অভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, তাহাই সত্য-জগৎ; আর, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ঐ-যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড, তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগৎ।

ভাব কি? এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা ভাবনার বীজ; এবং আর-এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা ভাবনার ফল। ভাবনা-শব্দ ভূ-ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভবন-শব্দের অর্থ হওন; ভাবন-শব্দের অর্থ হওয়ানো। আমি যদি আমার মনের মধ্যে একটা আম্রফল হওয়াই, তবে আমার সেই মানসিক হওয়ানো-ক্রিয়ার নাম আম্র-বিষয়ক-ভাবন-ক্রিয়া, সংক্ষেপে—আম্র-ভাবনা; আর আম্রের যে একটা আদর্শ-লিপি বা নক্সা * আমার মনের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা আছে, অর্থাৎ প্রলম্ব-গোলাকৃতি পাণ্ডুরচ্ছবি উদ্ভিজ্জ পদার্থ এইরূপ যে-একটি নক্সা পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া রাখা আছে, তাহাই আম্র-ভাবনার বীজ, তাহারই নাম আম্রের ভাব। কিন্তু একটু পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, এক দিক্ দিয়া দেখিলে যাহা ভাবনার বীজ, আর-এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা ভাবনার ফল। মনে কর, দেবদত্ত-নামক এক ব্যক্তিকে অনেক-দিন পূর্ব্বে আমি জাদু-ঘরে দেখিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে তাহার মূর্ত্তির একটা নক্সা আমার মনোমধ্যে জাগিতেছে। মাঝে মাঝে সেই নক্সা দৃষ্টে তাহার সেই মূর্ত্তিটি আমি আমার মনের মধ্যে উদ্ভাবনা করি অর্থাৎ ভাবনা করি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তাহাকে রাস্তার ধারে অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে দেখিলাম; কিন্তু চেনো-চেনো করিয়াও চিনিতে পারিলাম না। গতকল্য আমি তাহাকে একটা সভার মাঝখানে দেখিতে পাইয়া কিয়ৎকাল তাহার মুখের প্রতি ঠাহর করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিলাম যে, ইনি দেবদত্ত। দেবদত্তের সেই পুরাতন নক্সা, যাহা এ-যাবৎকাল ভাবনার বীজরূপে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তাহা এক্ষণে ফলরূপে আ-

---

* নক্সা স্বতন্ত্র, ছবি স্বতন্ত্র, এটা যেন মনে থাকে। বাড়ীর নক্সা বাড়ীর ছবি নহে।

মার বুদ্ধিতে আরূঢ় হইল; সে ফলের দার্শনিক নাম প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ দোমেটে রকমের জানা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Recognition, প্রত্যভিজ্ঞানই Recognitionই বীজ-জ্ঞানের Cognition এর ফলাভিব্যক্তি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ভাবনার গোড়া'র সূত্র বা আদর্শলিপি বা নক্সা, যাহার নাম দেওয়া হইয়া থাকে ভাব, তাঁহা বস্তু একই—কেবল অবস্থাভেদে কখনো বা বীজরূপে লুকায়িত থাকে, কখনো বা ফলরূপে আবির্ভূত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা বলি ভাব, তাহা বিবিক্ত (abstract) অবস্থায় ভাবনার বীজ, এবং 'মূর্ত্তিমান' (Concrete) অবস্থায় ভাবনার ফল।

আমরা যাহাকে যে-ভাবে দেখি, সে প্রকৃত পক্ষে সে ভাবের মনুষ্য না হইলেও, আমরা তাহাকে আমাদের মনোমধ্যে সেই ভাবের মত করিয়া ভাবন করি অর্থাৎ হওয়াই। দেবদত্ত আমার পরম বন্ধু, তাই আমি তাহাকে সদ্ভাবে দেখি; তোমার সহিত তাহার বিষয়-ঘটিত বিবাদ চলিতেছে, তাই তুমি তাহাকে অসদ্ভাবে দেখ। দেবদত্তের উকিল ধনঞ্জয় দেবদত্তের সোণার কাটি রূপার কাটি। ধনঞ্জয় যখন দেবদত্তকে সাধুবাদ দিয়া স্বর্গে তোলে, তখন দেবদত্ত আপনাকে নরোত্তম মনে করে; যখন ধিক্কার দিয়া পাতালে নাবায়, তখন দেবদত্ত আপনাকে নরাধম মনে করে। দেবদত্ত আমার নিকটে দেবতাবিশেষ, তোমার নিকটে দৈত্য-বিশেষ; এবং তাহার আপনার নিকটে কখনো বা নরোত্তম, কখনো বা নরাধমঃ—ধনঞ্জয় যখন স্বর্গে তোলে তখন নরোত্তম—যখন পাতালে নাবায় তখন নরাধম। দেবদত্ত কিন্তু—তুমি তাহাকে দৈত্য বলিলেও দৈত্য হয় না, আমি তাহাকে দেবতা বলিলেও দেবতা হয় না; আপনি আপনাকে নরোত্তম মনে করিলেও নরোত্তম হয় না—নরাধম মনে করিলেও নরাধম হয় না; দেবদত্ত যাহা আছে, তাহাই আছে। দেবদত্ত তোমার, আমার এবং তাহার আপনার নিকটে হইয়া দাঁড়াইতেছে ইহা, উহা, তাহা, সাত সতেরো; আছে কিন্তু যে দেবদত্ত সেই দেবদত্ত। হওয়া'র মূলে 'আছে' রহিয়াছে; ভবতি'র মূলে 'অস্তি' রহিয়াছে; ভাবের মূলে সত্য রহিয়াছে। সত্যই ভাবের ভিত্তিমূল এবং সর্ব্বস্ব।

সত্য কি? না যাহা আমাদের কাহারো ভাবন-ক্রিয়ার অর্থাৎ হওয়ানো-ক্রিয়ার—ভাবনার—অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্ব হইতেই আছে। সত্য সমুদ্র; ভাব সমুদ্রের দৃশ্যমান উপরি-তল; ভাবনা সমুদ্রের তরঙ্গলীলা। সত্য-শব্দ সৎশব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা আজও আছে, কালও আছে, চিরকালই আছে, তাহাই সৎশব্দের বাচ্য; আর যাহা সতের অন্তঃপাতী অর্থাৎ সৎসম্পর্কীয়, তাহাই সত্য-শব্দের বাচ্য। যাহা সত্য, তাহা আমি ভাবিলেও আছে—না ভাবিলেও আছে; পক্ষান্তরে, যাহা শুধু কেবল আমার একটা মনের ভাব, তাহা আমি ভাবিলেই আছে—না ভাবিলে নাই। দুয়ের এইরূপ আভিধানিক প্রভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, গোড়া'র সেই যে এক অভিন্ন জগৎ, যাহা আমি ভাবিলেও আছে—না ভাবিলেও আছে, তাহার নাম দেওয়া হইল সত্য-জগৎ; আর, সেই একই সত্য-জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ, যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহার নাম দেওয়া হইল, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগৎ।

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভাব-জগতের অধি-

ষ্ঠাতা যে রাজা, চাসা, পণ্ডিত, মূর্খ, বণিক্, কারীকর প্রভৃতি সেই সেই জীবাত্মা, তা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাস্য এখন এই যে, ভাব-জগতেরই কি কেবল অধিষ্ঠাতা আত্মা আছে? সত্য-জগতের অধিষ্ঠাতা কেহ কি নাই? সত্য-জগতের অধিষ্ঠাতা অবশ্যই কেহ আছেন। কেন না, এক-অদ্বিতীয় সত্য-জগতে যদি এক-অদ্বিতীয় আত্মা না থাকেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ-জগতে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা আসিবে কোথা হইতে? যদি কোনো এক রাজসভার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শুভ্র, মলিন, ভিন্ন ভিন্ন দর্পণের মধ্যগত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব-সভায় স্পষ্টাস্পষ্ট ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার রাজমূর্ত্তি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাতেই যেমন প্রমাণ হয় যে, একই রাজ-সভায় একই রাজা অধিষ্ঠান করিতেছেন; তেমনি এটা যখন সুনিশ্চিত যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগতে বা প্রতিরূপ-জগতে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা অধিষ্ঠান করিতেছে, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, একই অদ্বিতীয় সত্য-জগতে একই অদ্বিতীয় আত্মা অধিষ্ঠান করিতেছেন। ভাবিয়া দেখিলে সত্য-জগৎ এবং ভাব-জগৎ দুই জগৎ নহে—প্রত্যুত একই জগৎ। একই জগৎ একদিকে সৎস্বরূপের অধিষ্ঠানে সনাথ এবং তাঁহার শক্তিতে সত্তাবান্, সুতরাং সত্য অর্থাৎ সৎসম্পর্কীয়; আর-এক দিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত—সুতরাং ভিন্ন-ভিন্ন-ব্যক্তিগত ভাব।

ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান।

একই সত্য-জগৎ এক ব্যক্তির নিকটে সুখের সংসার সাজিয়া উপস্থিত হয়, আর-এক ব্যক্তির নিকটে দুঃখের অরণ্য সাজিয়া উপস্থিত হয়। সত্য-জগৎ যাহার নিকটে যে-সময়ে যে-বেশে উপস্থিত হয়, সে আপনিও আপনার নিকটে সেই সময়ে সেই বেশেরই দেখিয়া-শেখা-সদৃশ বেশে উপস্থিত হয়। সত্য-জগৎ যাহার নিকটে সুখের সংসার সাজিয়া উপস্থিত হয়, সে আপনার নিকটে আপনি সুখী সাজিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মনে ভাবে যে, আমি সুখী। সত্য-জগৎ যাহার নিকটে দুঃখের অরণ্য সাজিয়া উপস্থিত হয়, সে আপনার নিকটে আপনি দুঃখী সাজিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ মনে ভাবে যে, আমি দুঃখী। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপনার আপনার নিকটে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাজ সাজিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পরে চিন্তাভ্যস্ত সংস্কারের রঙ্গশালাটিকে কল্পনার বিচিত্র চিত্রসজ্জায় এবং সদসৎ-বিবেচনার তাড়িত প্রদীপে সজ্জিত করিয়া আপনার আপনার নির্দ্দিষ্ট পালা আপনার আপনার নিকটে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে; আরম্ভ করিয়া কখনো বা আপনাকে হাসায়, কখনো বা কাঁদায়, কখনো বা আপনাকে নাচাইয়া তোলে, কখনো বা দমাইয়া দ্যায়, কখনো বা আপনার নিকট হইতে সাধুবাদ পাইয়া ফুলিয়া দ্বিগুণ হয়, কখনো বা ধিক্কার খাইয়া কুঁকড়িয়া অর্দ্ধেক হয়। তাহার পরে বিশ্রামের যবনিকা-পতনের সময় হইলে, দিনের সঙ্গে যখন দিনগত পাপ ক্রমে অলক্ষিতভাবে সরিয়া পড়ে, আর সেই সঙ্গে যখন অভিনেতৃগণের রঙ্গের বেশ-ভূষা স্ব স্ব গাত্র হইতে শিথিল হইয়া খসিয়া পড়ে, তখন রাজা অরাজা হয়, দীন অদীন হয়, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ হয়, মুর্খ অমুর্খ হয়, ইত্যাদি; তখন সকলেই একই অভিন্ন বেশে—সর্ব্বপ্রথমে যে-বেশে মাতৃগর্ভে লুক্কায়িত ছিল, সেই আদিম তমসাচ্ছন্ন বেশে—অগাধ সুষুপ্তির গর্ভে নিলীন হইয়া যায়।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে যখন আমরা সুখ-

নিদ্রার মাতৃগর্ভ হইতে পূর্ব্বপরিচিত ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমরা আপনাকে আপনাকে কর্ত্তা এবং ভোক্তা বলিয়া স্ব স্ব জ্ঞানে উপলব্ধি করি। রাত্রিকালের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বেশ্ আমি বুঝিতে পারি যে, আমি আপনিই নিশ্বাস টানিতেছি, প্রশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছি; ও-দুই কার্য্যের আমি আপনিই কর্ত্তা। এটাও তখন বুঝিতে পারি যে, আমার আপনারই ঐ দুই কার্য্যের গুণে আমি আপনিই প্রাণ পাইয়া সুখী হইতেছি; আমার আপনার স্বাস্থ্য-সুখের আমি আপনিই ভোক্তা। জাগ্রৎকালে যখন আমি আপনাকে কর্ত্তা এবং ভোক্তা বলিয়া জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তখন আপনাকে আপনি ঐরূপে জ্ঞানে উপলব্ধি-করা-সূত্রে (কর্ত্তা এবং ভোক্তা তো আছিই—অধিকন্তু) জ্ঞাতা হইয়া দাঁড়াই। আর, তখন আমি সেই কর্ত্তা, ভোক্তা এবং জ্ঞাতা পুরুষের নাম দিই আত্মা। এটা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, কি জাগ্রৎকালে, কি সুষুপ্তিকালে, উভয় কালেই আমি একই কর্ত্তা—একই ভোক্তা। তার সাক্ষী—সুষুপ্তিকালের অচেতন অবস্থাতেও আমি যথাক্রমে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ এবং বিসর্জ্জন করি, সুতরাং তখনও আমি নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জনের কর্ত্তা; তা ছাড়া, আমার মন বলিতেছে যে, তখনও আমি আরাম উপভোগ করি—তখনো আমি আরামের ভোক্তা। কিন্তু তুমি চাও প্রমাণ! তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্মরণের জাদুঘরে প্রবেশ করিয়া সুষুপ্তির কোটার অন্ধি-সন্ধি হাতড়াইতে লাগিলাম। প্রমাণের মধ্যে পাইলাম—পুরাতন তালপত্রের লিপিতে দেবনাগর অক্ষরে লেখা একটি বেদবাক্য। বাক্যটি শুধু এই যে, "সুখমহমস্বাপ্সম্"—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। আমি হর্ষোৎফুল্ল নয়নে সেই লিপিখানি সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি তোমাকে যখন তাহা দেখাইতে গেলাম, তখন দেখি যে, বেলা তখন দ্বিপ্রহর, আর, তুমি ভোজনান্তে খস্‌খসের টাটির দুর্গের অভ্যন্তরে দোদুল্যমান পাখার বাতাসের সুস্নিগ্ধ হিল্লোলে শিয়রের বালিশে মাথা দিয়া হাত-পা ছড়াইয়া নিদ্রায় অচেতন। সবা'রই যেমন—আমারও তেমনি শরীরে মায়ামমতা আছে, সুখনিদ্রা যে কি সুদুর্লভ বহুমূল্য সামগ্রী সে-বিষয়েও আমি ভুক্তভোগী; কিন্তু তথাপি—এত কষ্টে যাহা আমি সংগ্রহ করিলাম, তাহা কাল-বিলম্বে বাসী হইয়া যাইতে পারে এই ভয় এবং প্রমাণ-প্রদর্শনের জন্য ব্যগ্রতা, এই দুই নছোড়-বন্দ পদাতিকের পাল্লায় পড়িয়া আমি তোমার কাণের কাছে চীৎকার-ধ্বনি করিয়া এবং তোমার বাহুমূলে পুনঃপুন ধাক্কা প্রদান করিয়া তোমাকে অনেক কষ্টে জাগাইয়া তুলিলাম! ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের আলিঙ্গন-পাশ হইতে অর্দ্ধভুক্ত মৃগ সিংহকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে সে যেমন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, তোমার আলিঙ্গন-পাশ হইতে আমি তেমনি-একটা ভোগের সামগ্রী অপহরণ করা'তে তুমি ঠিক তেমনি-তর অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া "অসভ্য! বর্ব্বর! কোনও কাণ্ডজ্ঞান নাই!" প্রভৃতি গর্জ্জনধ্বনি আরম্ভ করিলে। অতএব প্রমাণ হইল যে, তোমার নিদ্রাবস্থায় তুমি সুষুপ্তির পরমানন্দ ভোগ করিতেছিলে। আরেকটি কথা এই যে, নিদ্রাকালে কফকাশের উপদ্রবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথরোধ হইলে নিদ্রিত বালক ক্রন্দন করিয়া জাগিয়া ওঠে, এটা যখন সকলেরই দেখা কথা, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, নিদ্রাকালে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার কোনোপ্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে নিদ্রিত ব্যক্তির সুখভোগের ব্যাঘাত

হয়; ইহারই অভিন্নার্থ পাঠান্তর এই যে, নিদ্রাকালে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া যথানিয়মে চলিতে থাকিলে, নিদ্রিত ব্যক্তির সুখভোগ অব্যাহত থাকে। অতএব এটা স্থির যে, কি জাগ্রৎকালে, কি সুষুপ্তিকালে, উভয়-কালেই আত্মা কর্ত্তা এবং ভোক্তা। নিশ্বাসের আকর্ষণ তথৈব প্রশ্বাসের বিসর্জ্জন, এই দুই কার্য্যের কর্ত্তা; এবং তজ্জনিত স্বাস্থ্য-সুখের অর্থাৎ প্রাণগত আরামের ভোক্তা। এ যেন মানিলাম—মানিলাম যে সুষুপ্তির অচেতন অবস্থাতেও আমি কর্ত্তা এবং ভোক্তা দুইই; কিন্তু এটাও তো দেখা উচিত যে, জাগ্রৎকালে একদিকে আমি যেমন কর্ত্তা এবং ভোক্তা, আর-এক দিকে তেমনি আমি জানিতে পারি যে, আমি কর্ত্তা এবং ভোক্তা; জানিতে যখন পারি, তখন কাজেই তৎকালে আমি জ্ঞাতা। সুষুপ্তি-কালে আমি তো জানিতে পারি না যে, আমি কর্ত্তা বা ভোক্তা; জানিতে যখন পারি না—তখন সে সময়ে আমি যে, সত্যসত্যই কর্ত্তা বা ভোক্তা, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সুষুপ্তিকালেও নিদ্রিত ব্যক্তির জ্ঞান তলে তলে কার্য্য করে—সুষুপ্তি-কালেও আত্মা জ্ঞাতা পুরুষ। যদি বল যে, তাহার প্রমাণ কি? তবে বেদান্তদর্শন তাহার যেরূপ প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, তাহা বলিতেছি;—তাহা একে আমাদের দেশের ঘরের সামগ্রী, তাহাতে এমনি নিখুঁত, পরিষ্কার এবং সুসঙ্গত যে, তাহার উপরে কাহারো কোনো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না।

সৌষুপ্তজ্ঞানের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বৈদান্তিক প্রমাণ।

(১.) মূল কথা অর্থাৎ

Major premise।

যে-কোনো বিষয় হউক্ না কেন, তাহার উপস্থিতি-কালে তাহা যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞানে প্রতিভাত না হয়, তাহার অনুপস্থিতি-কালে তাহা সে-ব্যক্তির স্মরণে আবির্ভূত হইতে পারে না। তা'র সাক্ষী—শনিবারে যে-দর্শক নাট্যাভিনয়-দৃষ্টে সাক্ষাৎ জ্ঞানে আনন্দ উপলব্ধি না করে, পরদিন রবিবারে সে-দর্শকের স্মরণে "আমি গতকল্য নাট্যাভিনয় দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছি," এ কথাটি আবির্ভূত হইতে পারে না।

(২) দেখা কথা অর্থাৎ

Minor premise।

সুখ-নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিবার সময়, "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" এই বৃত্তান্তটি সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির স্মরণে আবির্ভূত হয়।

(৩) ফল কথা অর্থাৎ

Conclusion।

অতএব প্রমাণ হইল যে, সুষুপ্তি-সুখের উপস্থিতি-কালে সে সুখ সুষুপ্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়।

আলোচকের মন্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, সুষুপ্তি-কালেও আত্মা কর্ত্তা এবং ভোক্তা দুইই; বেদান্তদর্শনের উপরি-উক্ত যুক্তি অনুসারে অধিকন্তু প্রমাণ হইল এই যে, সে সময়ে আত্মা ভোক্তা তো আছেই তা ছাড়া সে জানিতেছে যে, আমি ভোক্তা—জানিতেছে যে, আমি সুখ-ভোগে নিমগ্ন আছি। কেন না, যে-সুখের ভোগের সময় যে ব্যক্তি না জানে যে আমি সুখ-ভোগ করিতেছি, সে-সুখের ভোগের পর্য্যবসান-কালে সে ব্যক্তির স্মরণ হইতে পারে না যে, আমি সুখ-ভোগে নিমগ্ন ছিলাম। অতএব, এটা স্থির যে, সুষুপ্তি-কালে আত্মা জানিতেছে যে, "আমি ভোক্তা।" তবেই হইতেছে যে, সুষুপ্তি-কালেও আত্মা শুধু কেবল

কর্ত্তা এবং ভোক্তা হইয়াই ক্ষান্ত নহে, অধিকন্তু আত্মা জ্ঞাতা।

এই তো দেখা গেল যে, সুষুপ্তি-কালেও আত্মার জ্ঞান সমূলে বিলুপ্ত হয় না—সুষুপ্তি-কালেও আত্মা জ্ঞাতা। এই সঙ্গে এটাও কিন্তু দেখা উচিত যে, জাগ্রৎকালের জ্ঞান, স্বপ্নকালের জ্ঞান এবং সুষুপ্তিকালের জ্ঞান, তিন কালের জ্ঞান তিন-প্রকার-লক্ষণাক্রান্ত। সে তিনপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি; সে প্রভেদের গোড়া'র কথাই বা কি অর্থাৎ সে প্রভেদ কিসের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এবং তাহার দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত; এ সমস্ত বিষয় আগামী বারের আলোচনার পথের সম্বল হইবে—এক্ষণে তাহা ভাণ্ডারে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইল।

বৈজ্ঞানিক-প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান কাল বিজ্ঞানের কাল। বিজ্ঞানের উন্নতি বর্ত্তমান কালের প্রধান লক্ষণ। পৃথিবীর প্রধান সভ্যজাতি মাত্রেই বিজ্ঞানানুশীলনের প্রতি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। দীন, হীন, পরাধীন ভারতবর্ষেও মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধায়ী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের উদয় হইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত মানব জাতির যে কেবল সাংসারিক উন্নতি জড়িত রহিয়াছে তাহা নহে; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও নৈতিক উন্নতির সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে ততই জগৎপাতা জগদীশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণা উজ্জ্বলতররূপে আমাদের প্রতীতি হইতেছে। বিজ্ঞানের পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হইলে মানুষ যেমন জ্বলন্তভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগতের প্রতি তাঁহার প্রেম বোধগম্য করিতে পারিবে, তেমন বোধ হয় আর অন্য কোন উপায়ে পারিবে না; কেননা বিজ্ঞান জগৎ-নিয়ন্তা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক নিয়মের জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার নিয়ম সকল যতই জানিতে পারিব ততই আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারিব। যে সকল সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বভাবসিদ্ধ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন এবং আবার অনুশীলন দ্বারা সে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মের জ্ঞান লাভ করিয়া এবং সে সকল নিয়ম-পালন-জনিত পরমানন্দ উপভোগ করিয়া ঈশ্বরকে বিশেষ রূপে জানিতে ও প্রীতি করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু এরূপ দেবপ্রসাদ ও আত্মপ্রভাবের সৌভাগ্য অতি অল্প লোকের পক্ষেই সুপ্রাপ্য। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে বাহ্য জগতের প্রকৃতি এবং বাহ্যজগত যে সকল নিয়ম দ্বারা শাসিত হইতেছে তাহার জ্ঞানই ঈশ্বরজ্ঞান লাভ ও ঈশ্বর প্রীতি অনুশীলনের প্রধান উপায়। এই জন্য আশা করা যায় যে বিজ্ঞানের সম্যক উৎকর্ষ সাধিত হইলে যখন ভৌতিক জগতে ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের করুণা, সকল সময়ে ও সকল স্থানে, প্রতি নিমেষে ও প্রতি পরমাণুতে, মানবের জ্ঞান-চক্ষু সমক্ষে সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকিবে তখন পৃথিবীতে অবিশ্বাসী ও অল্পবিশ্বাসীর আর অস্তিত্ব থাকিবে না।

বর্ত্তমান কালে তাড়িৎ বিজ্ঞানের প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের বিশেষ মনোযোগ অর্পিত হইয়াছে এবং দিনে দিনে বিজ্ঞানের এই প্রধান শাখা উন্নত আকার ধারণ করিতেছে। তারের সাহায্য ব্যতিরেকে তাড়িৎ

বার্ত্তা প্রেরণের যে উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আকাশই তাড়িৎবাহক, অর্থাৎ কোন বস্তু মধ্যবর্ত্তী চালক স্বরূপ না থাকিলেও একস্থান হইতে অন্যস্থানে তাড়িৎ শক্তি প্রেরণ করা যায়। বিনা তারে সংবাদ প্রেরণে এই তত্ত্বের কার্য্যকারিতা ক্রমে বৈজ্ঞানিকগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে বড় গৌরবের কথা যে একজন ভারতবাসী ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু—এই মহা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অবধারণে বিশেষ সহকারিতা করিয়াছেন। মার্কনি নামক ইটালী দেশীয় একজন বৈজ্ঞানিক আজকাল এই নবতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাতা, এবং তিনিই তারবিহীন তাড়িৎবার্ত্তাবাহী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও কার্য্যকারী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে যে স্থলে তার ব্যবহার করিবার উপায় নাই, বা তার ব্যবহার করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, তত্তৎস্থলে এই যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িৎবার্ত্তা প্রেরণে সুবিধা হইবে। মহাসমুদ্রে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে সংবাদ প্রেরণ জন্য এই অভিনব উপায় অতি প্রকৃষ্ট উপায়। সমুদ্রের তলদেশে তার নিক্ষেপ করিয়া সমুদ্র উপকূলস্থ দেশসমূহের মধ্যে তাড়িৎ বার্ত্তাবহের বন্দোবস্ত করা বহুল ব্যয়সাধ্য, সুতরাং এরূপ স্থলে স্বল্পব্যয়ে নিষ্পন্ন তারবিহীন বার্ত্তাবহের সুবিধা পরম সুবিধা বলিতে হইবে। প্রবল ঝটিকাহত হইয়া তাড়িৎবার্ত্তাবাহী তার কত সময় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তখন সংবাদ প্রেরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে; তারবিহীন তাড়িৎবার্ত্তাবাহী যন্ত্রের ব্যবহার হইলে এরূপ অসুবিধা অসম্ভব হইবে। যুদ্ধস্থলে শত্রুদল যখন বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সেনা ও সেনাপতিগণের মধ্যে সংযোগ বিনষ্ট করিয়া দিবে, তখন তারবিহীন তাড়িৎবার্ত্তাবাহী যন্ত্রযোগে অনায়াসে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারিবে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃষ্টি করাইতে পারা যায় কি না, এ প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকদিগের আলোচনা ও পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতেছে দেখিয়া আশা হয় যে এক সময়ে মানুষ অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পারিবে! অধ্যাপক গেটস্ নামক আমেরিকার একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন যে বৃহদাকার তাড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহার সাহায্যে শীতল বায়ু প্রবাহে তাড়িৎ সঞ্চারিত করিয়া প্রয়োজনমত বৃষ্টি করান অসম্ভব নহে। বায়ুমণ্ডলস্থ শৈত্য ঘনীভূত হইয়া জলকণায় পরিণত হয় এবং তাহা হইতেই বৃষ্টির উৎপত্তি হয়। বৃষ্টি পতনের ইহাই এক্ষণে সর্ব্বজনসম্মত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, কিন্তু অধ্যাপক গেটস্ বলেন যে বায়ুমণ্ডলস্থ বৈদ্যুতিক অবস্থার সহিত বৃষ্টি পতনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কতকগুলি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের সম্মুখে নিজ মতের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি তাড়িৎউৎপাদক যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত আগারের যে অংশে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল সেই অংশে তাড়িৎপ্রবাহ প্রবাহিত করাইয়া দেখাইলেন যে গৃহমধ্যে অচিরাৎ কুজ্‌ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু জলকণা পতিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে ক্ষুদ্র তাড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র দ্বারা যাহা ক্ষুদ্র আকারে সম্পন্ন হইল, বিশাল আকাশের নিম্নে বৃহৎ তাড়িৎউৎপাদক যন্ত্র দ্বারা তাহা বিস্তৃত আকারে সম্পন্ন করা অসম্ভব নহে।

"শতায়ুর্ব্বৈঃ পুরুষঃ" ইহা একটী শ্রুতি বচন। পুরুষত্বের সহিত ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও দীর্ঘায়ুর ভাব অবিচ্ছেদ্য রূপে জড়িত আছে। যিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্মান্বিত হইয়া দীর্ঘজীবী হয়েন তাঁহাতেই মনুষ্যত্ব বা পুরুষত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। অতএব পুরুষ যিনি তিনি শতায়ু হইবেন। এই ভাব হিন্দুধর্ম্মের একটী মুখ্য ভাব। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ মানুষের আয়ুর যে পরিমাণ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকগণও সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। শত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াও জীবিত রহিয়াছে এরূপ নরনারী দেখা যায় বটে, কিন্তু শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে সাধারণতঃ শত বৎসরই মানবের পক্ষে সুদীর্ঘ পরমায়ু, এবং সুস্থ ও সবল শরীরে শত বৎসর জীবন রক্ষা করা, যাহারা সাংঘাতিক রোগের বীজ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাহারা ব্যতীত আর সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। এই বিষয়ে প্রাচীনকালের ঋষিগণ ও বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ একমত হইয়াছেন দেখিয়া আর্য্য ঋষিদিগের জ্ঞানগরিমার জয়োচ্চারণ করিতে হয়। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ, সুতরাং যে সকল আচার রক্ষা ও নিয়ম পালনে ইংলণ্ডে দীর্ঘজীবন লাভ করা যাইতে পারে এদেশে যে সে সকল নিয়মই উপযোগী হইবে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে যাহা সকল দেশেই পালনীয় ও দীর্ঘায়ুর পক্ষে অনুকূল। সম্প্রতি একজন ইংরাজ শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত শতায়ু লাভ পক্ষে যে সকল নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন তন্মধ্যে যে গুলি ভারতবর্ষের পক্ষেও উপযোগী হইতে পারে আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি;—প্রথম, কুত্রাপি বিচলিত না হইয়া স্থির ও ধীর চিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে; দ্বিতীয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশমিত করিবে; এরূপ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিবে না যাহা পূর্ণ করিতে তোমার পক্ষে অপরিমিত পরিশ্রম ও আয়াস আবশ্যক করে; তৃতীয়, বিষয়-কর্ম্ম হইতে মধ্যে মধ্যে অল্প দিনের জন্য অব্যাহতি লইয়া বিশ্রাম করিবে; চতুর্থ, যতদূর সম্ভব একই প্রকার কার্য্যে লিপ্ত না থাকিয়া বিভিন্ন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবে; পঞ্চম, যতদূর সম্ভব সহর পরিত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রামে বাস করিবে; ষষ্ঠ, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না কেননা প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই শরীরকে রোগপ্রবণ করে; সপ্তম, নিয়মিত ও পরিমিত রূপে শরীর চালনা করিবে; অষ্টম, তোমার শরীরের উত্তাপানুরূপ জলে প্রত্যহ স্নান করিবে; নবম, শয়নকালে শয়নাগারে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে; দশম, আট ঘণ্টাকাল নিদ্রা যাইবে।

আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন যে তিনি এমন এক বিশেষ উপায়ে মানবশরীরে তাড়িৎসঞ্চার করিতে পারেন যে তাহাতে শরীরস্থ যে কোন স্থানের এরূপ অসাড়তা সম্পাদন করা যায় যে সে স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র বেদনা বোধ হয় না। এইরূপ বিশেষ ভাবে তাড়িৎ-শক্তি শরীরে সঞ্চারিত করিবার জন্য উক্ত বৈজ্ঞানিক সকলের ব্যবহার্য্য একটী যন্ত্রের উদ্ভাবনে ব্যাপৃত আছেন। শরীরে অস্ত্র প্রয়োগে রোগীর যাহাতে বেদনা বোধ না হয় তজ্জন্য চিকিৎসকগণ এক্ষণে রোগীকে ঔষধের সাহায্যে সংজ্ঞাশূন্য করেন, কিম্বা যে স্থানে অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে ঔষধ দ্বারা সে স্থান অসাড় করিয়া দেন।

এই উভয়বিধ প্রক্রিয়া নিরাপদ বা দোষশূন্য নহে। তাড়িৎপ্রয়োগে শরীরের অসাড়তা সম্পাদনের চেষ্টা সফল হইলে মানবজাতি একটী নবসম্পদের অধিকারী হইল বলিতে হইবে।

একটী বৈজ্ঞানিক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলেই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহার কার্য্যকারিতা অবধারণে প্রবৃত্ত হয়েন। নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের একটী প্রধান কার্য্য ; পুরাতন ও নূতন তত্ত্ব গুলি কার্য্যে পরিণত করা অর্থাৎ মানুষের বিবিধ প্রয়োজন সাধনে তাহাদিগকে ব্যবহার করা তাঁহার আর একটী প্রধান কার্য্য। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এইরূপ ব্যবহারের একটী আশ্চর্য্যকর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ কোন যন্ত্রের পীড়া হইলে চিকিৎসক যদি সেই যন্ত্রটী চাক্ষুষ দেখিতে পান তাহা হইলে চিকিৎসার বড় সুবিধা হয়। এ পর্য্যন্ত কেবল লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসকগণ বিবিধ যান্ত্রিক রোগের অবস্থা নির্ণয় করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে রঞ্জেন আলোক নামক যে বৈদ্যুতিক আলোক আবিষ্কৃত হইয়াছে উহার সাহায্যে শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহ দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রঞ্জেন আলোকের সাহায্যও যথেষ্ট মনে করেন না। রোগীর পাকস্থলীর অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য তিনি একটী অতিক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ-যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার মধ্যে একটী অতি ক্ষুদ্রকায় বৈদ্যুতিক প্রদীপ রক্ষিত থাকে। সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম তারযোগে বহির্দ্দেশ হইতে ঐ প্রদীপে তাড়িৎ সঞ্চারিত হয়। রোগীকে এই যন্ত্রটী গলাধঃকরণ করিতে হয়। দুই চারি মিনিট পরেই উক্ত তাড়িৎ সঞ্চালক তারটীর সাহায্যে যন্ত্রটী বাহির করিয়া লইতে হয়। যন্ত্রটী অতি ক্ষুদ্র হওয়াতে এই প্রক্রিয়ায় রোগীর কোন কষ্ট হয় না। যন্ত্রটী বাহির করিলে তম্মধ্যে পাকস্থলীর একটী ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়। এই ফটোগ্রাফ অতি ক্ষুদ্রাকার, সুতরাং উহা স্পষ্টরূপে দেখিবার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবশ্যক হয়। পাকস্থলীর এইরূপ চিত্র পাইলে পাকস্থলী সম্বন্ধীয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঔষধ ব্যবস্থার জন্য চিকিৎসককে অনুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না, সুতরাং রোগীর শীঘ্র রোগমুক্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয়।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মানবদেহ ও মানবমনের উপর বর্ণের প্রভাব আছে। দেখা গিয়াছে যে লোহিত বর্ণ স্নায়ুপুঞ্জকে উত্তেজিত করে এবং হরিদ্বর্ণ স্নায়ুপুঞ্জকে শান্তভাবাপন্ন করে। পারিস্ নগরের এক প্রধান ফটোগ্রাফ-চিত্রকরের কার্য্যালয়ের একটী প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিক যখন লোহিত বর্ণের কাচ দ্বারা আবৃত ছিল তখন ঐ প্রকোষ্ঠে দিবাভাগে যাহারা কাজ করিত, দেখা যাইত যে তাহারা সর্ব্বদাই যেন উত্তেজিত অবস্থায় রহিয়াছে ; কেহ গীত করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছে, কেহ মুখভঙ্গী করিতেছে। কিছুকাল পরে ঐ প্রকোষ্ঠ যখন হরিদ্বর্ণের কাচ দ্বারা বেষ্টিত হইল তখন দেখা গেল যে সেই কর্ম্মচারীগণই অতি শান্তভাবে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, গীত করিবার ও উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্ত্তা কহিবার তাহাদিগের সে পূর্ব্বপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং আরও দেখা গেল যে সন্ধ্যাকালে তাহাদিগের শরীর ক্ষণিক স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচময় গৃহের মধ্যে রাখিয়া কাচের বর্ণের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রোগ আরোগ্য বা তাহার উপশম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জার্ম্মনির একখানি বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে হার্ কৈসার্ নামক একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ক্ষয়কাশ রোগীর বক্ষোপরি Arc Lamp নামক প্রদীপের আলোক নীল কাচের মধ্য দিয়া বর্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, উক্ত দুরারোগ্য রোগের স্পষ্ট উপশম হইয়াছে। ছয় দিন এই প্রকারে নীল কাচের আলোক গ্রহণ করিয়া কয়েকটী রোগী বিশেষ উপকার লাভ

করিয়াছে। আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিবিধ বর্ণের শিশির মধ্যে পরিস্কার জল রাখিয়া শিশিগুলি কিছুকাল রৌদ্রে রক্ষা করিয়া সেই জল সেবন করাইয়া নানা রোগ আরোগ্য করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। Chromopathy বা বর্ণ-চিকিৎসা একটী বিশেষ চিকিৎসাপ্রণালীর মধ্যে ক্রমে পরিগণিত হইতেছে।

বাষ্প একটী প্রধান ভৌতিক শক্তি। প্রধানতঃ ইহারই বলে বিবিধ প্রকার কলের কাজ চলিতেছে। খনিজ অঙ্গারই বাষ্প উৎপাদনের জন্য প্রধান অবলম্বন। বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত এবং নানা প্রকার মানব-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-প্রস্তুতকারী কল অঙ্গার ব্যতীত অচল হইয়া পড়ে। কিন্তু এত অধিক পরিমাণে অঙ্গারের ব্যয় হইতেছে যে পৃথিবীতে যত অঙ্গার-খনি আছে, অন্যূন এক শত বৎসর কাল মধ্যে তাহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকদিগের এই আশঙ্কা বাস্তবিকই যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে উপায় কি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই বলিতেছেন যে, সমুদ্রের জোয়ার ভাটায় যে শক্তি কার্য্য করে আমাদের প্রয়োজন সাধনে সে শক্তির ব্যবহার করা কঠিন হইবে না, সূর্য্যালোকের উত্তাপে যে শক্তি নিহিত আছে তাড়িৎ-বলে তাহা ব্যবহার করা অসম্ভব নহে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে উত্তাপ আছে তাহার যে শক্তি তাহাও মানবের স্বার্থ সাধনে নিয়োগ করা যাইতে পারিবে এবং ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর মেরুদণ্ডে যে শক্তি বর্ত্তমান তাহাও এরূপ তাড়িৎশক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে যে তাহার সাহায্যে মানুষ অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারিবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, শ্রাবণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬৭৫৸০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৫০॥০
সমষ্টি	...	১২২৬৷০
ব্যয়	...	৬৫৪॥৴৯
স্থিত	...	৫৭১॥৶৩

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৭১॥৶৩

৫৭১॥৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৩১৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৲

„ „ বনমালী চন্দ্র ১৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব বাহাদুর, ময়ুরভঞ্জ ২০৲

His Highness Maharaja Bahadoor C. I. E. Sanbarsa, ২৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন রায় ২৲

„ „ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৲

„ „ প্রমোদনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৲

২৩১৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৩৷৶০
পুস্তকালয়	...	।৶০
যন্ত্রালয়	...	৩৯০৸৶০
সমষ্টি		৬৭৫৸০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪৪৯ ৻৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৫ ৻৬
পুস্তকালয়	...	১০৸৶০
যন্ত্রালয়	...	১৫৪৸৴৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৪॥৶০
সমষ্টি		৬৫৪॥৴৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

পঞ্চদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩।

৭১১ সংখ্যা — ১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ১ কার্ত্তিক শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্য ও মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

নাম	স্থান	মূল্য
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১২৲
মহারাজা মনিন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	কাশিমবাজার	৪৯।৵
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	কলিকাতা	১০৲
„ „ সতীশচন্দ্র মল্লিক	ঐ	৩৲
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী,	পুঁটিয়া	৩।৵০
„ রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর	কাকিনা	২৩।৵০
„ বাবু যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী	চট্টগ্রাম	৬৸০
„ „ ক্ষেত্রমোহন মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
„ „ কেদারনাথ রায়	ঐ	৩৲
„ „ চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	পাণ্ডুয়া	৩।৵০
„ „ বৃন্দাবন দাস	কাঁপা	২।৵০
„ „ অধরচন্দ্র পাল	ক্ষীরপাই	৫৲
„ „ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	সৈদাবাদ	৩।৵০
„ রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর	দিনাজপুর	৩।৵০
„ কৃষ্ণদয়াল সিংহ চৌধুরী	দিনাজপুর	৩।৵০
শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর	কলিকাতা	৯৲
„ বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ	ঐ	৩৲
„ „ রাজেন্দ্রলাল সিংহ	বৰ্দ্ধমান	১৸৵০
„ সম্পাদক মানিকদহ ব্রাহ্মসমাজ		১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীশঙ্কর রায়	কটক	৩।৵০
„ „ মনোহর মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	৩।৵০
রায় বলাইচাঁদ পাইন বাহাদুর	কলিকাতা	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	৩৲
„ সব্‌ম্যানেজার ঠাকুর জমিদারীকাচারী	সিলাইদহ	৩।৵০
„ বাবু গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
„ „ মহেন্দ্রনাথ বসু	ঐ	৩৲
রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	নাড়াজোল	৩০।৵০
শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
„ „ বনমালী চন্দ্র	ঐ	৩৲
„ „ নীলকমল মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
„ „ প্রসন্নকুমার বসু M. A. B. L.	কৃষ্ণনগর	১৲
„ „ প্রমথনাথ মল্লিক	কলিকাতা	৩৲
„ „ বিপিনবিহারী ঘোষাল	বন্দীপুর	১০৵০
„ „ সত্যচরণ রায়	কলিকাতা	৩৲
„ „ হরকুমার সরকার	রাজসাহী	১০৲
ডাক্তার ডি, এন্, চাটার্জি	কলিকাতা	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সিং	ঐ	৩৲
„ „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	ঐ	৩৲
„ „ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ	৩৲
„ „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৩৲
„ „ চন্দ্রশেখর বসু	ঐ	৩৲
„ „ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	১০৵০
ডাক্তার পি. কে, রায়	ঐ	১২৲
শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব ভড়	ঐ	৩৲
„ „ যাদবকৃষ্ণ দাস	ঐ	৩৲
„ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৩৲
ডাক্তার হরনাথ রায়	ঐ	৩৲
ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়	ঐ	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ মিত্র	ঐ	৩৲
„ কালীপ্রসন্ন ঘোষ	ঐ	৩৲
মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর	ঐ	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন সেন	ঐ	৩৲
মৌলবী বিলাইত হোসেন সাহেব	ঐ	৩৲
৺ মতিলাল পাল	ঐ	২৲
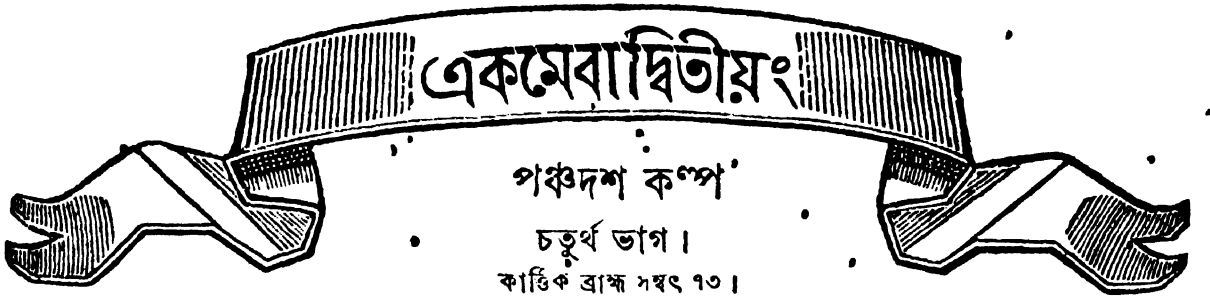
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সত্যলাভের উপায় কি?

জগতের মধ্যে পরস্পর বিরোধী নানা মত, নানা সম্প্রদায়, নানা শাস্ত্র প্রচলিত আছে। প্রত্যেকে নিজ মতের সত্যতা, নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজ শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিতে যত্নশীল অথচ সকলেই বলেন যে সত্য স্বতঃপ্রকাশ, তাহার স্বভাবই প্রকাশ, সত্য কাহারো উপর নির্ভর করিয়া প্রকাশমান নহেন। যাঁহারা সত্যকে স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া স্বীকার করেন অথচ নিজের মতকে সত্য ও অপরের মতকে মিথ্যা বলেন তাঁহাদের কথায় আত্মবিরোধ আছে কি না? সত্য কোন বস্তু কিনা? ভাব ও নাম এবং সত্য এই তিন কি এক শ্রেণীর? মত, সম্প্রদায় ও শাস্ত্র, ভাব নাম ও সত্য এই তিনের কোন্‌টী? বস্তুরই নাম সত্য কি না? যাহা আছে, যাহার স্বভাবই থাকা, না থাকা যাহার পক্ষে অসম্ভব, যাহা মানিলেও আছে, না মানিলেও আছে, সহস্র পরিবর্তন স্বত্বেও যাহার লোপ হয় না তাহারই নাম সত্য কি সত্য অপর কিছু আছে? যাহার স্বভাবই থাকা, যাহার সত্তা অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না তাঁহার প্রকাশই স্বতঃপ্রকাশ কি স্বতঃপ্রকাশ অপর কিছু আছে? সত্য যদি স্বতঃপ্রকাশ হন তবে সত্যলাভের জন্য মতামতের কি প্রয়োজন? "ইহা এই, ইহা এই" এইরূপ বলা ভিন্ন মতামতের দ্বারা আর কি হইতে পারে? যাহার সম্বন্ধে "ইহা এই, ইহা এই" বলা হইতেছে তাহাকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ জানিলে তাহার সম্বন্ধে "ইহা এই, ইহা এই" বলার আর কি প্রয়োজন থাকে? অপরকে বুঝাইবার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে মতে আবদ্ধ থাকিতে বলা ন্যায় কি অন্যায়? যদি কোন মত গ্রহণ না করিয়া সত্য লাভ হয়, আর লোকে যাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত বলে তাহা গ্রহণ করিয়াও যদি সত্য লাভ না হয় তবে এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রার্থনীয়? যদি জগতের সমস্ত মত খণ্ডন হইয়া যায় তাহাতে কি বস্তুর অর্থাৎ সত্যের খণ্ডন হয়? সত্যের নির্দ্দেশক বলিয়া যদি মতের আদর হয় তবে সত্য লাভ হইলে মতে আর কি প্রয়োজন? এবং সত্যলাভ না হইলে মতে আর কি ফল?

সত্য স্বতঃপ্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও সকলের সত্য লাভ হইতেছে না কেন? যাহার সত্যে প্রীতি নাই, যাহার সত্য না পাইয়া কোন অভাব বোধ নাই ও যাহার সত্য না পাইয়াও পাইয়াছি বলিয়া ধারণা ইহাদের কাহারো পক্ষে সত্যলাভ সম্ভবপর কি না? যাহাদের সত্যে প্রীতি নাই ও যাহার সত্যে ঔদাসীন্য, তাহাদের সত্যপ্রিয় ও সাধক ব্যক্তিদিগের সঙ্গ ভিন্ন অভাব মোচনের অন্য কোন উপায় আছে কি না? কিন্তু যিনি সংস্কারে আবদ্ধ অর্থাৎ না জানিয়া জানিয়াছি এইরূপ যাঁহার ধারণা অধিকন্তু নিজে সংস্কারবদ্ধ হইয়া অপরকে সংস্কারবদ্ধ করিতে প্রয়াসী তাঁহার কি উপায়? যিনি নিজে সংস্কারবদ্ধ তাঁহার অনুকূল সংস্কার-সম্পন্ন লোকের সঙ্গই প্রীতিকর হয়, ফলে সংস্কার আরো বদ্ধমূল হইতে থাকে এবং সত্যলাভের প্রতিবন্ধক আরো দুরপণেয় হইয়া উঠে।

মনুষ্য মাত্রেই চেতন, চেতনের ধর্ম্মই বিচার। বিচার না করিলে বুদ্ধিশক্তি মার্জ্জিত হয় না। যে শক্তি দ্বারা সত্য গ্রহণ হয় তাহারই নাম বুদ্ধি। যেমন দৃষ্টি-শক্তির কার্য্য দৃশ্য পদার্থ গ্রহণ করা সেইরূপ বুদ্ধির কার্য্য সত্য গ্রহণ করা। সংস্কার-বর্জ্জিত বুদ্ধি সহজেই সত্য গ্রহণ করে। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, আপনার স্বভাব গুণে বুদ্ধিতে প্রকাশ হন। বুদ্ধি সংস্কারের দ্বারা মলিন থাকিলে সত্য যে স্বতঃপ্রকাশ ইহা উপলব্ধি হইয়া ব্যবহার কার্য্যের উপযোগী হয় না। এজন্য বিচারের দ্বারা বুদ্ধির মার্জ্জনা প্রয়োজন। ইহাও সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে সত্য অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই একমাত্র সিদ্ধিকর্ত্তা, সর্ব্বফল-দাতা। যে নামেই হউক বা সর্ব্বপ্রকার নাম পরিত্যাগ করিয়াই হউক প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইয়া বিচার না করিলে বিচার নিষ্ফল।

মনুষ্য মাত্রেরই মিথ্যা মান অভিমান ও তুচ্ছ সামাজিক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সরল অন্তরে যথার্থ সত্যান্বেষী হইয়া স্থির চিত্তে বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখা উচিত যে, আমরা যখন শরীর ধারণ করি নাই তখন আমাদের সত্য মিথ্যা, দ্বৈত অদ্বৈত, শূন্য স্বভাব, নিরাকার সাকার, জীব ঈশ্বর সৃষ্টিআদি জ্ঞান ছিল না, কোন শাস্ত্র বা ভাষা জ্ঞানও ছিল না, সম্প্রদায় জ্ঞানও ছিল না যে আমি অমুক সম্প্রদায়ভুক্ত বা আমার সম্প্রদায়ের এই মত ও বিশ্বাস এবং আমি গরীব বা ধনী, মুর্খ বা পণ্ডিত, স্ত্রী বা পুরুষ ইত্যাদি কোন বোধাবোধ বা জ্ঞানই ছিল না। আমরা স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখনও সকলেই মূর্খ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কেহ সংস্কৃত ইংরাজি ফার্সি উর্দ্দু আদি ভাষা বা কোন শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। বাল্যাবস্থা হইতে সেই জ্ঞানে যে সংস্কার জন্মিয়াছে তাহাকেই সত্য বোধে বিশ্বাস করিয়া অপরের সংস্কারকে মিথ্যা বোধে পরিত্যাগ করিতেছি। ফলে, কেহ কাহারো সহিত মিলিতে না পারিয়া বহু সম্প্রদায় ও মতামত সৃষ্টি দ্বারা সত্যের বা পরমাত্মার বিদ্রোহাচরণ করিয়া অশেষ দুর্গতিকে প্রাপ্ত হইতেছি—ইহা প্রত্যক্ষ কি না?

সামান্য বিচারে ও সহজ বুদ্ধিতেই চেতন মনুষ্য বুঝিতে পারেন কি সত্য, কি মিথ্যা। যাহা আছে তাহাই সত্য, যাহা নাই তাহাই মিথ্যা। যদি কেহ বলেন যে এই পৃথিবীতে চাষ করিয়া অন্নাদি উৎপন্ন করিয়া জীব প্রতিপালন হয় না, বস্তুতঃ যে পৃথিবী দেখা যায় না ও নাই, সেই পৃথিবীতে, অথবা পৃথিবী

নাম বা শব্দ বা পৃথিবী বিষয়ক জ্ঞান বা সত্তা মাত্রেতে চাষ করিয়া অন্নাদি উৎপন্ন করিয়া, তাহারই দ্বারা জীব প্রতিপালন হয়, এবং জলের দ্বারা আলো ও স্থূল পদার্থ ভস্ম হয় ও অগ্নির দ্বারা জলের কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে চেতন মনুষ্য ঠিক বুঝিতে পারিবেন যে ইহা মিথ্যা কথা, এই পৃথিবীতেই অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীব প্রতিপালন হয়, হইতেছে, হইবে এবং এই পৃথিবীই না থাকিলে জীব অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এইরূপ বুঝিতে হইবে যে মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞান মুক্তি আদি যাঁহার দ্বারা অনাদি কাল হইয়া আসিয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা ধ্রুব হইতেই থাকিবে, দ্বিতীয় কেহ নাই যে ইহা নিবারণ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে।

পৃথিবী হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীব যে পালন হইতেছে এই পৃথিবী তত্ত্ব মিথ্যা জীব তত্ত্ব সত্য? এবং সেই মিথ্যা পৃথিবী তত্ত্ব হইতে সত্য জীবতত্ত্ব পালন হইতেছে? বা জীবতত্ত্ব মিথ্যা পৃথিবীতত্ত্ব সত্য এবং সত্য পৃথিবীতত্ত্ব হইতে মিথ্যা জীবতত্ত্ব পালন হইতেছে, কিম্বা উভয় তত্ত্বই মিথ্যা বা উভয় তত্ত্বই সত্য? এই উভয় তত্ত্ব সত্য বা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্তারই প্রকাশ, কি ইহার মধ্যে একটী সত্য হইতে প্রকাশিত একটী মিথ্যা হইতে প্রকাশিত? কিন্তু মনুষ্যগণ জানেন যে মিথ্যা মিথ্যাই, যাহা নাই তাহারই নাম মিথ্যা, মিথ্যা হইতে কোন কিছু হওয়া বা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। সত্য হইতেই যাহা কিছু হইতে বা প্রকাশ পাইতে পারে। পৃথিবীতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব উভয়ই যদি সত্য বা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়া থাকেন, তবে মিথ্যা হইলে উভয়ই মিথ্যা হইবেন, সত্য হইলে উভয়ই সত্য হইবেন কিনা? আমরা বিচার করিয়া এই স্থূল তত্ত্ব পৃথিবীর ভাবই ভাল করিয়া বুঝি তবে যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, পরমাত্মা আদি যাঁহার নাম কল্পনা করা হইয়াছে, জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হইলে ক্রমশঃ তাঁহাকে বুঝিব।

যেমন এই স্থূল পৃথিবীতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন স্থূল শরীর স্থূল পৃথিবীতত্ত্ব দ্বারাই প্রতিপালিত হইতেছে এবং স্থূল শরীরে বিকৃতি বশতঃ নানা রোগ জন্মাইলে স্থূল পৃথিবীতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ঔষধির দ্বারা স্বভাবতঃ অর্থাৎ পরমাত্মার নিয়মানুসারে তাহা নিবারণ হইতেছে; সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীর, যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ও যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা শক্তির দ্বারা তাহার প্রতিদিন জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ অবস্থান্তর বা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে (সুষুপ্তিতে জ্ঞান চৈতন্যের সঙ্কোচ জাগ্রতে জ্ঞান চৈতন্যের প্রকাশ) সেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা শক্তির দ্বারাই তাহার অজ্ঞানাবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞানাবস্থা হওয়া সম্ভব কি না? এবং এইরূপই পরমাত্মার নিয়ম ইহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে কিনা? যাহা দ্বারা যাহা হইবার তাহা দ্বারাই তাহা হইবে। কেহ ইহার অর্থাৎ পরমাত্মার স্বভাবের বিপরীত চলিতে চেষ্টা পাইলে কার্য্য সফল না হইয়া অনর্থক কষ্ট ভোগই সার হয় কি না? এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব কি তাহা যথার্থরূপে না জানিয়া জগতে জ্ঞান মুক্তি লাভের উপায় প্রচার করিতে গেলে মনুষ্যকে ভ্রান্ত সংস্কারে বদ্ধ করিয়া অজ্ঞান হইতে আরো অজ্ঞানে নিক্ষেপ করা হয় কিনা?

এক পূর্ণ সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় কেহই নাই, যাহা কিছু করিবেন সেই এক পূর্ণ সত্যই করিবেন যেরূপেই করুন না কেন। সত্যের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেই পারে না, তাহাতে কেবল রূপান্তর ঘটাই সম্ভব। মাতা পিতা সত্য থাকিলে তাহা হইতে সত্য পুত্র কন্যা হয়, মাতা পিতা বস্তু না থাকিলে

মিথ্যা মাতা পিতা হইতে সত্য পুত্র কন্যা হইতেই পারে না। পুত্র কন্যা দেখেন, যখন আমি সত্যই আছি, তখন অবশ্য আমাদের মাতা পিতা সত্য আছেন তবে আমরা হইয়াছি, আমরাও সত্য আমাদের মাতা পিতাও সত্য এবং মাতা পিতা আছেন এ বিশ্বাসও সত্য। পুত্রকন্যারূপী চরাচর জীব সমূহ, মাতা পিতারূপী এক সত্য, যিনি নিরাকার সাকার অসীম অখণ্ডাকার নির্ব্বিশেষ চরাচর জীব সমূহকে লইয়া পূর্ণরূপে বিরাজমান। সেই এক সত্যই উপাধি ভেদে জীব সমূহের মাতা পিতা গুরু আত্মা। স্বরূপ পক্ষে নিরুপাধি, মাতা পিতা পুত্র কন্যা আত্মা পরমাত্মা পূজ্য পূজক ভাব তাঁহাতে নাই। সে ভাবেতে তিনি বা বস্তু যাহা তাহাই পূর্ণরূপে প্রকাশমান। এই ভাবে বস্তু প্রকাশ পাওয়াকেই বস্তুর পূর্ণ প্রকাশ বলে।

এই পূর্ণ সত্য বা বস্তুকে ব্যবহারে আনিতে গেলে কোন্ ভাবে ব্যবহার পাওয়া যায় কোন্ ভাবে ব্যবহার নাই জানা প্রয়োজন। এই পূর্ণ শব্দ মধ্যে শাস্ত্রে দুইটী নাম বা শব্দ প্রচলিত আছে এক নিরাকার নির্গুণ এক সাকার সগুণ। বস্তু বা সত্য বা ব্রহ্মকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলে এই দুই ভাবে বস্তুর ধারণা হইবে। ইহার মধ্যে যাহা নির্গুণ ভাব তাহা নিরাকার নির্ব্বিকার গুণাতীত জ্ঞানাতীত শব্দাতীত ও যাহা সগুণ ভাব তাহা গুণময় জ্ঞানময় সাকার প্রকাশমান প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর। এই সাকার বা প্রকাশ ভাবেই বস্তু বা ব্রহ্ম অনন্ত শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত প্রকার কার্য্য করেন ও করান। এই সাকার বা প্রকাশ ভাবকেই বেদাদি শাস্ত্রে বস্তুর বা সত্যের বা ব্রহ্মের রূপ ও স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করা আছে। এখানে বিশেষ রূপে বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে কোন এক গুণ বা শক্তি বা কার্য্য বা রূপকে পরিত্যাগ করিয়া বস্তুর বা সত্যের বা ব্রহ্মের পূর্ণ এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান হওয়া সম্ভব কি না? একটী বৃক্ষ তাহার মূল শাখা প্রশাখা পাতা ফল ফুল রূপ গুণ ক্রিয়া লইয়া পূর্ণ বৃক্ষ হয় কি না? বৃক্ষের কোন এক অংশ বা কার্য্য বা গুণ ছাড়িলে বৃক্ষের পূর্ণ সংজ্ঞা হওয়া সম্ভব কি না? এই প্রকার বৃক্ষরূপী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্তার সহিত সমস্ত শক্তি রূপ গুণ ক্রিয়া নিরাকার সাকার প্রকাশ অপ্রকাশ ভাব লইয়া পরিপূর্ণ এক অদ্বিতীয় সত্য কি না? সাকারকে নিরাকার হইতে পৃথক করিলে সাকার নিরাকার কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইয়া সীমাবদ্ধ হইবেন কি না, এবং সমুদায় সাকার প্রকাশ বা কার্য্যকে নিরাকার হইতে পৃথক করিলে নিরাকার সাকার কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইয়া সীমাবদ্ধ হইবেন কি না? সাকার নিরাকার উপাসকগণের বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে সাকার বা নিরাকারকে ত্যাগ করিয়া কাহারো আপনার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতার পূর্ণরূপে উপাসনা হওয়া সম্ভব হয় কি না? এক সত্যই প্রকাশ অপ্রকাশ সর্ব্বভাব লইয়া পূর্ণরূপে প্রকাশমান আছেন কেবল শক্তি ও গুণের তারতম্য অনুসারে রূপান্তর উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইতেছে ইহা যদি সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের জ্ঞান হইত তাহা হইলে আর পরস্পর বিরোধ করিয়া কাহাকেও অশান্তি ভোগ করিতে হইত না, সকলেই জানিতেন জীবসমূহ নিজ আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ—একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

মনুষ্য মাত্রেরই আপনার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতাকে যথার্থ রূপে চিনিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য বুঝিয়া উত্তম রূপে পালন করা উচিত

যাহাতে মঙ্গলকারী মাতা পিতা পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া জীবসমূহের সকল অমঙ্গল দূর করিয়া পূর্ণ মঙ্গল বিধান করেন।

হে পরমাত্মা, হে জগতের গুরু মাতা পিতা, এই দীন হীন জীবগণের প্রতি কৃপা করুন ও আপনাকে চিনিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনের সামর্থ্য দান করুন। আপনিই এই জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। আপনি ব্যতীত আর কাহারো সামর্থ্য নাই যে অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিতে পারে। হে জগদীশ্বর, আমাদের অমঙ্গলের কারণ নিজগুণে অন্তর্হিত করিয়া আমাদিগকে সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার অভিমান হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আপনার মহিমা ও আপনার নাম জীবনে জয়যুক্ত করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করুন। ভক্তিভরে সকলে মিলিয়া বারবার আপনার চরণে প্রণাম করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সার সত্যের আলোচনা।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি।

জাগ্রৎকালে আমরা বিজ্ঞান-রাজ্যে বাস করি; স্বপ্ন-কালে মনোরাজ্যে বাস করি। বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রদীপ বুদ্ধি; মনোরাজ্যের প্রদীপ কামনা। চেতন কিন্তু এক বই দুই নহে। একই চেতন বিজ্ঞান-রাজ্যের বুদ্ধি-প্রদীপ হইয়া বস্তু-সকলের ব্যাবহারিক সত্তায়* আলোক প্রদান করে, এবং মনোরাজ্যের কাম-প্রদীপ হইয়া বস্তু-সকলের প্রাতিভাসিক সত্তায় আলোক প্রদান করে। মনোরাজ্যের কাম-প্রদীপ একপ্রকার কামধেনু। মনোরাজ্যে, তাই, যে যাহা অজ্ঞাতসারে কামনা করে, সে সেই অযাচিত সামগ্রী চক্ষু মুদিত করিয়া করতলে প্রাপ্ত হয়;—

> "স্বপ্নের কৃপায়, অন্ধে আঁখি পায়,
> ঐশ্বর্য্যে ফাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা।"
>
> স্বপ্ন-প্রয়াণ।

কিন্তু কামনা-কামিনীটিকে সব সময়ে চেনা ভার। একপ্রকার কামনা আছে, যাহা আশঙ্কার কনিষ্ঠা ভগিনী। তার সাক্ষী;—একজন পথিক যদি পর্ব্বতের সানুমঞ্চের কিনারায় দাঁড়াইয়া গভীর নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবে তাহার মনোমধ্যে পতনের আশঙ্কা তো জাগিয়া ওঠেই; কিন্তু আশঙ্কা যেমন জাগিয়া ওঠে, তেমনি তাহার পিছন দিক্ হইতে পতনের জন্য একপ্রকার ব্যগ্রতা—একপ্রকার অধীর কামনা "ঝাঁপ দিয়া পড়ো" বলিয়া বিভ্রান্ত পথিকটিকে যমালয়ের সোজা রাস্তা দেখাইয়া দ্যায়। এই প্রকার শঙ্কানুজা কামনা হইতে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা জন্ম গ্রহণ করে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

স্বাপ্নিক বস্তু-সকলও জ্ঞানের বিষয়—এ কথা সত্য; কিন্তু তাহার গোড়ায় দোষ—তাহা অবাস্তবিক। মোটামুটি বলিলাম "অবাস্তবিক"; সূক্ষ্মরূপে ধরিতে গেলে—স্বপ্নের বস্তু-সকল দুই হিসাবে দুইরূপ। এক হিসাবে তাহা বাস্তবিক; আর-এক হিসাবে অবাস্তবিক। স্বাপ্নিক বস্তুর সত্তা যদি সর্ব্বাংশে অবাস্তবিক হইত, তবে তাহাকে "অবাস্তবিক" বলিলেই এক কথায় চুকিয়া যাইত। কিন্তু অত সহজে গোলযোগ চুকিবার নহে। এ কথা কাহারো অবিদিত নাই যে, অন্ধ মিল্‌টন আলোকের জাগ্রৎস্বপ্নে পুলকিত হইয়া উল্লাস-ভরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "Hail holy Light off-

---

* ব্যাবহারিক সত্তা = Concrete সত্তা = প্রাতিভাসিক সত্তা (Phenomenal existence) + বাস্তবিক সত্তা (Real existence)। Concrete সত্তাই লোকের ব্যবহারে আসে।

spring of heaven first-born"—অভিবাদন করি তোমায় পবিত্র আলোক—ব্রহ্মের প্রথম-জাত সন্তান! মিল্‌টন যখন নিমীলিতচক্ষে আলোকের এইরূপ সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, তখন বুঝিতেই পারা যাইতেছে যে, সেই যে স্বাপ্নিক আলোক যাহা তাঁহার মনশ্চক্ষুতে দেখা দিতেছে, তাহার বাস্তবিক সত্তা তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নাই; আছে তাহা তাঁহার স্মৃতিক্ষেত্রে—যদিচ অদৃশ্য-ভাবে। যে ক্ষেত্রে যে ভাবে থাকুক্ না কেন—আছে তো? তবেই হইতেছে যে, স্বপ্নের দৃষ্ট বস্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবাস্তবিক হইলেও, তাহা পরোক্ষ সম্বন্ধে বাস্তবিক—যে অংশে তাহা বাস্তবিক পদার্থের স্মৃতি-গর্ত্ত, সে অংশে অবশ্যই তাহা বাস্তবিক। এইজন্য বলিতেছি যে, স্বাপ্নিক বস্তু-সকলের সত্তাকে অবাস্তবিক না বলিয়া বলা উচিত প্রাতিভাসিক—দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেনও তাই।

স্বপ্ন-কালের মনোরাজ্য যেমন কামনা-মাতৃক, জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্য তেমনি বুদ্ধি-মাতৃক; আর, সেই বিজ্ঞান-রাজ্যের বস্তু-সকলের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা। সে সত্তা দ্বৈতগর্ত্তা। ব্যাবহারিক সত্তার দুই পৃষ্ঠে অপর দুইবিধ সত্তার সংশ্লেষ রহিয়াছে স্পষ্ট। বিজ্ঞান-রাজ্যের বস্তু-সকলের এ-পৃষ্ঠের সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা, ও-পৃষ্ঠের সত্তা বাস্তবিক সত্তা, এবং সমগ্র অবয়বের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা। সাবধানী পোদ্দার যেমন পরীক্ষিতব্য টাকার দুই পিট উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখে, এখানে তেমনি বিজ্ঞান-রাজ্যের বস্তু-সকলের ব্যাবহারিক সত্তার দুই পিট, এবং তাহার পরে তাহার সমগ্র অবয়ব, একে একে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা বিধেয়; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

(১) ব্যাবহারিক সত্তার
এ পিট।

আমি যখন আমার সম্মুখে ঐ থামটা দেখিতেছি, তখন দেখিতেছি, আর কিছু না—ঐ থামটা'র মধ্য হইতে উহার বাস্তবিক সত্তা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দেখিতেছি—উহার শ্বেতবর্ণ উন্নত স্থূলাকৃতি মাত্র দেখিতেছি। মনে কর, আমি ঐ থামটার বাস্তবিক সত্তা একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া শুদ্ধ কেবল উহার শ্বেতবর্ণ উন্নত স্থূলাকৃতির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছি; একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, মনে কর, আমার চক্ষে একপ্রকার তন্দ্রার ঘোর আসিল, আর সেই-গতিকে ঐ থামটা স্বপ্নের ন্যায় একটা প্রাতিভাসিক দৃশ্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। এখন দেখিতে হইবে এই যে, ঐ থামটার সত্তা যদি সত্যসত্যই সেইরূপ একটা প্রাতিভাসিক সত্তামাত্র হইত তাহা হইলে, উহা যে এক-মুহূর্ত্তে হাউই-বাজি হইয়া হুস্ করিয়া উড়িয়া যাইবে না, অথবা বাঘ হইয়া গাঁ গাঁ করিয়া খাইতে আসিবে না, তাহার কোন স্থিরতা থাকিত না। তা'র সাক্ষী—স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজ্যে সবই বে-আইন বে-কানুন্। সে রাজ্যে যে যাহা, সে তাহা নহে। সে রাজ্যে—এই দেখিতেছি ভারাবনত মুমূর্ষু গর্দ্দভ, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা গর্দ্দভ নহে—তাহা তেজঃস্ফীত অশ্ব; এই দেখিতেছি মাটি-ঘ্যাঁসা শূকর, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা শূকর নহে—তাহা বর্ম্মাবৃত খড়্গায়ুধ গণ্ডার; এই দেখিতেছি একরত্তি বিড়াল-ছানা, পরক্ষণেই দেখি যে, তাহা বিড়াল-ছানা নহে—তাহা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র। স্বপ্নের রাজ্যে এই সকল অঘটন-ঘটনা কেমন অবলীলা-ক্রমে আমাদের নয়ন-সমক্ষে হওয়া-যাওয়া করে! তখন তাহাদের বাস্তবিকতা-সম্বন্ধে সংশয়ের বিন্দু-

বিসর্গও আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে না। বুদ্ধি তখন কোথায়—যে, তাহাকে বিভ্রান্ত করিবে? বুদ্ধি তখন অগাধ নিদ্রায় নিমগ্ন! প্রকৃত কথা এই যে, যে সময়ে আমরা স্বপ্নের মনোরাজ্যে বাস করি, সে সময়ে বাস্তবিক-অবাস্তবিকের কথা আমাদের মনেই আসে না। তার সাক্ষী;—আমি যদি কোনো সময়ে আমার কোন মৃত বন্ধুকে স্বপ্ন দেখি, তবে সে সময়ে আমার সে বন্ধু বাস্তবিকই জীবিত আছেন, অথবা অনেক-দিন হইল মৃত হইয়াছেন, এ কথা জিজ্ঞাসার বিষয় বলিয়াই মনে হয় না। তা ছাড়া এক প্রকার জাগরণ-ঘ্যাঁসা স্বপ্ন আছে; তেমনি আবার, স্বপ্ন-ঘ্যাঁসা জাগরণও আছে; দুয়েরই নাম জাগ্রৎ স্বপ্ন। প্রকৃত স্বপ্ন এবং জাগ্রৎস্বপ্নের মধ্যে বিশেষ একটি প্রভেদ এই যে, প্রকৃত স্বপ্নের অবস্থায়—স্বপ্ন যে স্বপ্ন, তাহা জানিতে পারিবার কোনো উপায় নাই; পক্ষান্তরে জাগ্রৎস্বপ্নের অবস্থায়—স্বপ্নের স্বপ্নত্ব বোদ্ধার নিকটে ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় না। বিজ্ঞান-রাজ্যের ব্যাবহারিক সত্তার মধ্যেও যে মনোরাজ্যের প্রাতিভাসিক সত্তা (একপ্রকার জাগ্রৎ স্বপ্ন) তলে তলে কার্য্য করে, তাহার দিব্য একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে; সে প্রমাণ এইঃ—

চিত্র-বীক্ষণ যন্ত্রের দুই চোঙের মধ্য দিয়া তাহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর—দেখিবে যে, তাহার অন্তর্নিহিত আলেখ্য-পটে বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি যাহা যাহা চিত্রিত আছে সমস্তই যেন বাস্তবিক সত্য—এই ভাবের একটি প্রাতিভাসিক দৃশ্য তোমার চক্ষের সম্মুখে সাক্ষাৎ বিরাজমান। তখনকার সেই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, উদ্যান-কানন, গিরি-নদী প্রভৃতি বিচিত্র দৃশ্য যে-স্থানটিতে যাহা প্রতিভাসিত হইতেছে, সে স্থানটিতে তাহার বাস্তবিক সত্তা মূলেই নাই; আছে তবে কোথায়? উহাদের যেখানকার যত কিছু বাস্তবিক সত্তা, সমস্তই যন্ত্রাধিশ্রিত দুইখানি চিত্রলিপির মধ্যে সম্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্যের মধ্যেই মনোরাজ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; আর সেই যে মনোরাজ্য, তাহার প্রাতিভাসিক সত্তা বিজ্ঞান-রাজ্যের ব্যাবহারিক সত্তা'র দুই পৃষ্ঠের এক পৃষ্ঠ। বুদ্ধির বিষয়ীভূত বিজ্ঞানরাজ্যের বস্তু-সকলের দুই পৃষ্ঠে দুইরূপ সত্তা সংশ্লিষ্ট থাকা'তে বুদ্ধির পক্ষে দিব্য একটি সুবিধা হইয়াছে এই যে, বুদ্ধি ইচ্ছা করিলেই দুইকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া বিবেচ্য বস্তুর ব্যাবহারিক সত্তা কোন্ অংশে প্রাতিভাসিক এবং কোন্ অংশে বাস্তবিক, তাহার যথাসম্ভব ঠিকানা পাইতে পারে।

(২) ব্যাবহারিক সত্তার ও পিট।

আমি বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি যে, ঐ থামটার ব্যাবহারিক সত্তা উহার বাস্তবিক সত্তাতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আমার ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রে প্রাতিভাসিক সত্তা ছড়াইতেছে; তার সাক্ষী, উহা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ে শ্বেত-বর্ণ স্থূলাকৃতি এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ে সংঘাত-কাঠিন্য, দুই ইন্দ্রিয়ে এই যে দুইপ্রকার ভোগ-সামগ্রী বাঁটিয়া দিতেছে, দুয়েরই সত্তা ঐ থামটার প্রাতিভাসিক সত্তা। এখানে থামটার বাস্তবিক সত্তার সহিত তাহার ঐ দুইপ্রকার প্রাতিভাসিক সত্তার সম্বন্ধ যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা বস্তু-গুণের সম্বন্ধ। এই গেল একটা কথা। আর একটা কথা এই যে, কালে ঐ থামটার গাত্রে শেয়ালা জমিয়া উহার শুভ্র গাত্র মলিন হইয়া যাইতে পারে; উহা জরা-জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া খসিয়া পড়িতে পারে; উহা

জলে গুলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারে; সবই হইতে পারে—কিন্তু কিছুই হইতে পারে না বিনা কারণে। বিনা কারণে অত বড় ঐ থামটার একটি ক্ষুদ্রাৎ-ক্ষুদ্র বালু-কণাও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, ঐ থামটার বাস্তবিক সত্তা একদিকে যেমন উহার ভিতরে* বস্তু-রূপে স্থির রহিয়াছে, আর একদিকে তেমনি কারণ-রূপে কার্য্য করিতেছে। এই গেল দ্বিতীয় কথা; তৃতীয় আর-একটি কথা এই যে, এক-একটি কারণের অগ্রপশ্চাতে অ-সংখ্য কার্য্য-কারণের তরঙ্গ-মালা নিয়তির অদৃশ্য সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। সে সূত্র আবার দুই-মুখা;—এক দিক্ দিয়া যেমন কারণের ক্রিয়া কার্য্য-পরম্পরায় ভাঁটাইয়া চলিতে থাকে, আর এক দিক্ দিয়া তেমনি কার্য্যের প্রতিক্রিয়া কারণ-পরম্পরায় বাহিয়া উঠিতে থাকে। তার সাক্ষী; এক দিকে অনিল-হিল্লোল সরোবর-জলে তরঙ্গ-হিল্লোল উৎপাদন করে, তরঙ্গ-হিল্লোল পদ্মবন টল-মলায়মান করে; আর এক দিকে, পদ্মবন তরঙ্গ-হিল্লোলকে প্রত্যাঘাত করে, তরঙ্গ-হিল্লোল অনিলহিল্লোলকে প্রত্যাঘাত করে। এক দিকে যেমন ঐ থামটার উপরে চতুর্দ্দিক হইতে জল-বায়ু প্রভৃতির ক্রিয়ার পশ্চাতে ক্রিয়া আসিয়া পড়িতেছে, আর এক দিকে তেমনি থামটার স্বশক্তি হইতে প্রতিক্রিয়ার পশ্চাতে প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত হইয়া জল-বায়ু প্রভৃতির ঘেরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। ফল কথা এই যে, এক দিকে যেমন থামটার বাস্তবিক সত্তাকে লইয়া সমস্ত জগতের একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা স্থির রহিয়াছে, আর এক দিকে তেমনি থামটার বাস্তবিক সত্তা এবং অপরাপর সমস্ত বস্তুর বাস্তবিক সত্তা, এই দুই খণ্ড সত্তার পরস্পর বাধ্যবাধকতা-সূত্রে দুয়ের মধ্যে ক্রমাগতই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। ফল কথা এই যে, বিশ্বভুবনের মূলীভূত একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা স্থির রহিয়াছে বস্তুরূপে; খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্য দিয়া ধা-বমান হইতেছে কার্য্য-কারণের প্রবাহ-রূপে; বিধান-মতে কার্য্যপ্রবাহের রাশ ছাড়িয়া দি-তেছে এবং টানিয়া ধরিতেছে নিয়তি-রূপে। নিয়তি আর কিছু না—বিধাতা-পুরুষের নিয়ম। এমন অনেক রাজ-নিয়ম আছে, যাহা নিছক বল-গর্ত্ত; যাহা নিয়ম-কর্ত্তার গায়ের জোর মাত্র; যাহার ভিতরে কোনো পদার্থ নাই— না আছে প্রেম, না আছে জ্ঞান, না আছে কিছু। কিন্তু সমগ্র জগতের নিয়ম সে শ্রেণীর নিয়ম নহে। নিখিল জগতের অভ্রান্ত এবং অব্যর্থ নিয়মের ভিতরে বাহিরে বিধাতা-পুরুষের ত্রৈকালিক জ্ঞানের অনিরুদ্ধ দৃষ্টি এবং বিশ্বব্যাপী প্রেমের অপরাজিত বল এক সঙ্গে জাগিতেছে; এক কথায়—তিনি আপনি জাগিতেছেন। আর একটি কথা এই যে, বিশ্বভুবনের সেই যে নিয়ম—সে নিয়মের বলবত্তা-বিধায়িনী প্রবল-প্রতাপান্বিত মহতীশক্তি ন্যায় দয়া এবং মঙ্গল-ভাবে এরূপ ওতপ্রোত যে তাহার নিজমূর্ত্তি—শক্তির শক্তি-মূর্ত্তি— লোকের চক্ষে ধরা দ্যায় না; আর, চক্ষে ধরা দ্যায় না বলিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে অদৃষ্ট। এখানকার যাহা প্রকৃত মন্তব্য কথা—তাহা এই ঃ—

প্রথমত নিখিল জগতের কার্য্যকারণ-প্রবাহ নিয়তির* বাঁধে আট্‌কানো রহি-য়াছে। দ্বিতীয়ত নিয়তির বাঁধ এবং কার্য্য-

* ভিতর-বাহিরের অনেক-রূপ অর্থ আছে। (১) কলসীর ভিতরে জল; (২) চলমান বস্তুর ভিতরে গতিশক্তি; (৩) মনের ভিতরে অভিসন্ধি ইত্যাদি নানা অর্থ। এখানেও "ভিতরে"-শব্দের অর্থ সেইরূপ দেশ-কালপাত্রোচিত।

* নিয়-তি = নিয়-ম। নিয়তি-শব্দের অর্থ বিধাতা-পুরুষের নিয়ম, তা ছাড়া আর কিছুই নহে।

কারণের প্রবাহ, দুই-ই বিশ্বভুবনের মূলীভূত একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সেই যে একই অখণ্ড বাস্তবিক সত্তা, যাহা বিশ্বভুবনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই জাগ্রৎকালের বুদ্ধি-বিজ্ঞানের প্রধানতম ভরসা এবং অবলম্বন-যষ্টি। বিশ্ব-ভুবনে যদি বাস্তবিক সত্তার গোড়া-বাঁধুনি না থাকিত, তাহা হইলে তর্কচ্ছলে যদি স্বীকারও করা যায় যে, সে অবস্থায় জগতের একপ্রকার স্বপ্নবৎ প্রাতিভাসিক সত্তা সম্ভাবনীয়, তথাপি এটা স্থির যে, সেরূপ অরাজক স্বপ্ন-রাজ্যে বুদ্ধি-বিজ্ঞান মুহূর্ত্তকালের জন্যও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। তার সাক্ষী;—ঐ থামটা যদি সত্যসত্যই স্বপ্নের ন্যায় শুদ্ধ কেবল প্রাতিভাসিক দৃশ্যমাত্র হয়, অর্থাৎ এরূপ যদি হয় যে, ঐ থামটার ভিতরে বাস্তবিক সত্তা নাই—উহার গুণের ভিতরে বস্তু নাই—কার্য্যের ভিতরে কারণ নাই—উহার সহিত অপর কোনো বস্তুর কোনোপ্রকার বাধ্য-বাধকতা নাই; তাহা হইলে, এখন যেন তুমি উহাকে থাম বলিতেছ—কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে বিনা কারণে উহা যখন পক্ষী হইয়া উড়িয়া পলাইবে, তখন উহার থামত্ব কোথায় রহিবে? সোজা কথা এই যে, ধ্বনি না থাকিলে প্রতিধ্বনি থাকিতে পারে না; জাগরিতাবস্থা না থাকিলে স্বপ্নাবস্থা থাকিতে পারে না; বাস্তবিক সত্তা না থাকিলে প্রাতিভাসিক সত্তা থাকিতে পারে না। ফলে "সকল সত্তাই প্রাতিভাসিক সত্তা—বাস্তবিক সত্তা নাস্তি" এরূপ কথা অর্থহীন শব্দ বই আর কিছুই নহে। একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বুদ্ধির কার্য্যই হ'চ্চে বাস্তবিক সত্তার সহিত প্রাতিভাসিক সত্তার যোগ-সংঘটন। বাস্তবিক সত্তাই যদি নাই, তবে বুদ্ধি কাহার সহিত কাহার যোগ-সংঘটন করিবে? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বুদ্ধির বিষয়ীভূত বিজ্ঞান-রাজ্যের সত্তা ব্যাবহারিক সত্তা, আর সেই ব্যাবহারিক সত্তার এ পিটে প্রাতিভাসিক সত্তা এবং ও পিটে বাস্তবিক সত্তা, দুই পিটে দুইরূপ সত্তা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, বুদ্ধির কার্য্যই হ'চ্চে দুয়ের যোগ-সংঘটন। দেখা যা'ক্ কিরূপ সে যোগ-সংঘটন।

(৩) ব্যাবহারিক সত্তার দুই পিটের যোগ-সংঘটন।

"জাগ্রৎকাল আমাদের বুদ্ধির প্রাদুর্ভাব-কাল" এই কথাটি জন-সাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য অভিধানে জাগরিতাবস্থার আর-এক নাম দেওয়া হইয়াছে প্রবুদ্ধ অবস্থা এবং জাগ্রৎকালের আর-এক নাম দেওয়া হইয়াছে প্রবোধ-কাল। ফল কথা এই যে, জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্যেই বুদ্ধি নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। স্বপ্নকালের মনোরাজ্যে বুদ্ধির খেলা যত কিছু চলিতে দেখা যায়, সমস্তই খেলা-মাত্র, অভিনয়-মাত্র; একপ্রকার ছায়াবাজি! তা বই, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধির খেলা নহে। বুদ্ধির মুখ্যতম কার্য্য হ'চ্চে বস্তু চেনা। পণ্ডিতি ভাষায়—তাহারই নাম প্রত্যভিজ্ঞান (recognition)। বেদান্তদর্শনের "সোহয়ং দেবদত্তঃ" প্রত্যভিজ্ঞানের একটি চলন-সই উদাহরণ; তা ছাড়া, ইউরোপীয় দর্শন-রাজ্যের গোড়ার কথা একটি এই যে, All cognition is recognition অর্থাৎ জ্ঞান-নামাই প্রত্যভিজ্ঞান। এখন, বুদ্ধির ঐ যে মুখ্যকার্য্য প্রত্যভিজ্ঞান উহার মুখের প্রতি একটু স্থিরচিত্তে ঠাহর করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ও-টি বুদ্ধিমাতার এক প্রকার শ্যামদেশীয় (Siamese) যমক-সন্তান। প্রত্যভি-

জ্ঞানের সমগ্র শরীরে বাস্তবিক এবং প্রাতিভাসিক—এই দুইপ্রকার সত্তা পিঠাপিঠিভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। মনে কর, পুষ্করিণীতে একটা হংস খেলিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া—আমি বলিলাম "ও-টা রাজহংস" অর্থাৎ "ঐ হংস রাজহংস"। "ঐ হংস রাজহংস" এ কথাটি একটিমাত্র কথা—কিন্তু দুই খণ্ডে বিভক্ত। সে দুই খণ্ড হ'চ্চে—(১) ঐ হংস এবং (২) রাজহংস। এখন দেখিতে হইবে এই যে, যাহাকে আমি "ঐ হংস" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, সেই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হংসটির সত্তা বাস্তবিক সত্তা; আর, রাজহংসের একটা ভাব বা আদর্শ, যাহা অনেক দিন হইতে আমার মনের মধ্যে জিয়ানো রহিয়াছে এবং এক্ষণে যাহা আমি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বাস্তবিক হংসটার উপরে উপাধিচ্ছলে চাপাইয়া দিতেছি, তাহা আমার মানস-সরোবরের রাজহংস; সুতরাং তাহার সত্তা প্রাতিভাসিক। এই যে আমি হংসের একবিধ সত্তার সঙ্গে আর একবিধ সত্তা জুড়িয়া দিলাম—বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে প্রাতিভাসিক সত্তা জুড়িয়া দিলাম—ইহারই নাম বুদ্ধির খেলা। গুলি-ডাণ্ডা-খেলা'তে যেমন গুলি এবং ডাণ্ডার সংস্পর্শ-সংঘটন আবশ্যক হয়, বুদ্ধির খেলা'তে তেমনি বিচার্য্য বস্তুর বাস্তবিক সত্তা এবং বিচারকের মনোগত আদর্শের প্রাতিভাসিক সত্তা, এই দুই প্রকার সত্তার যোগ-সংঘটন আবশ্যক হয়। উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, বাস্তবিক সত্তা দক্ষিণ হস্ত; প্রাতিভাসিক সত্তা বাম হস্ত; বুদ্ধির খেলা করতালি-প্রদান। জাগ্রৎকালের বিজ্ঞান-রাজ্যে দুই হস্ত অনুক্ষণ একযোগে কার্য্য করিতে থাকে—কাজেই তালি বাজিতে থাকে অর্থাৎ বুদ্ধির খেলা চলিতে থাকে। আমি যদি আমার কুটুরী-ঘরে চৌকি হেলান দিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া ইংলণ্ড ভাবি, তবে সেরূপ ধোমপ্য ভাবনা স্বপ্নের অনেকটা কাছাকাছি যায়, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু আমি তখন সত্যসত্যই নিদ্রিত নহি; আমি তখন দিব্য সজাগ! আমি তখন বেশ্ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার শরীরের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে আমার আশ্রয়-চৌকির বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; আশ্রয়-চৌকির বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে বাড়ীর ভিত্তিমূলের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; বাড়ীর ভিত্তিমূলের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে কলিকাতা-পুরীর বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; কলিকাতা-পুরীর বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে পূর্ব্ব-সমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; পূর্ব্ব-সমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে মহা-সমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে; মহাসমুদ্রের বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে ইংলণ্ডের বাস্তবিক সত্তার যোগ রহিয়াছে। কিন্তু এই যে বাস্তবিক সত্তার অসংখ্য শ্রেণী-পরম্পরা, ইহার গোড়ার কাহিনী একরত্তি ক্ষুদ্র; কি? না, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কুটুরী-ঘরটির বাস্তবিক সত্তা; কেন না, তাহাই কেবল সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার চক্ষের সমক্ষে প্রকাশ পাইতেছে। তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু আমার চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সমস্তেরই সত্তা প্রাতিভাসিক সত্তা; কেননা তাহা প্রত্যক্ষ বিরাজমান দেখা সত্তা নহে; তাহা লোকের মুখে শোনা সত্তা, অথবা হঠাৎ মনে পড়া সত্তা; অথবা ভাবিয়া দাঁড় করানো সত্তা;—তাহা সত্তা নহে—তাহা সত্তা'র ভাব। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, সেই সকল চিন্তা-চর বস্তু-সকলের প্রাতিভাসিক সত্তার সহিত আমার এই কুটুরী-ঘরটির বাস্তবিক সত্তার সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশে

কোনোপ্রকার সম্পর্ক দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু তা বলিয়া, আমার বুদ্ধি পরোক্ষ-সম্বন্ধে দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক-পাতানো-কার্য্যের ঘটকতা করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। আমার বুদ্ধির নিকটে এ কথা অবিদিত নাই যে, আমার চিন্তা-চর প্রাতিভাসিক ইংলণ্ডের গোড়া'র কথা হ'চ্চে বাস্তবিক ইংলণ্ড; আর সেই বাস্তবিক ইংলণ্ড হইতে আমার এই ক্ষুদ্র কুটুরী-ঘর পর্য্যন্ত বাস্তবিক সত্তার যোগ-সূত্র নিরবচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে। আমার বুদ্ধি এটা বেশ্ জানে যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তা এবং সমস্ত জগতের বাস্তবিক সত্তা, একই বাস্তবিক সত্তা। ইহা জানিয়া আমার বুদ্ধি করিতেছে কি? না, প্রথমত আমার এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান কুটুরী-ঘরের বাস্তবিক সত্তাতেই সর্ব্বজগতের অখণ্ড এবং নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবিক সত্তা উপলব্ধি করিতেছে; দ্বিতীয়ত আমার এই ক্ষুদ্র কুটুরীর বাস্তবিক সত্তাতেই বিশ্বভুবনের বাস্তবিক সত্তা হস্তে পাইয়া সেই নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড বাস্তবিক সত্তার যোগে আমার চিন্তা-চর ইংলণ্ডের প্রাতিভাসিক সত্তার সহিত বাস্তবিক সত্তা জুড়িয়া দিতেছে। অতএব জাগ্রৎকালে আমি আমার মনোরথ-বিমানকে প্রাতিভাসিক সত্তার আকাশ-মার্গে যতই উচ্চে উড্ডীয়মান করাই না কেন—তাহার খুঁটি বাঁধা রহিয়াছে বাস্তবিক সত্তার সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে—যদিচ সে ভিত্তিমূল দেখিতে অতি যৎসামান্য ক্ষুদ্র। সে ভিত্তিমূল কি? না, আমার আপনার এবং আমার সন্নিধানবর্ত্তী প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিষয়-সকলের বাস্তবিক সত্তা। এইটি কেবল এখানে দেখা উচিত যে, বাস্তবিক সত্তা'র সাক্ষাৎকার-লাভ আমি যে-কোনো স্থানেই করি না কেন—তিল-পরিমাণ স্থানেই করি, আর পর্ব্বত-পরিমাণ স্থানেই করি, যে-কোনো স্থানেই তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করি না কেন—সেই স্থান হইতেই তাহা নিখিলবিশ্বময় নিরবচ্ছেদে পরিব্যাপ্ত।

অনতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎকালে বাস্তবিক এবং প্রাতিভাসিক, এই দুইরূপ সত্তা একযোগে কার্য্য করে বলিয়া বুদ্ধি রীতিমত খেলিতে পায়। স্বপ্ন-কালে মনেরই কেবল দুয়ার খোলা থাকে—বুদ্ধির দ্বারে কপাট পড়িয়া যায়। স্বপ্নের মনোরাজ্যে যাহার যাহা কিছু সত্তা, সমস্তই প্রাতিভাসিক সত্তা। পূর্ব্বে এক স্থানে উপমাচ্ছলে বলিয়াছি যে, বাস্তবিক সত্তা দক্ষিণ হস্ত, প্রাতিভাসিক সত্তা বাম হস্ত এবং বুদ্ধির খেলা করতালি-প্রদান। স্বপ্নের অর্দ্ধাঙ্গ-হীন শরীরে একাকী কেবল বাম হস্তই কার্য্য করে—প্রাতিভাসিক সত্তাই কার্য্য করে—কাজেই তালি বাজে না অর্থাৎ বুদ্ধি খেলে না। স্বপ্নাবস্থায় সিরাজুদ্দৌলার আমলের মৃত ব্যক্তি জীবিতের অভিনয় করিয়া দর্শকের চক্ষের সম্মুখ দিয়া অনায়াসে পার পাইয়া যায়; দর্শক ভুল-ক্রমেও একবার আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করে না যে, এ যাহা দেখিতেছি, ইহা বাস্তবিক কি অবাস্তবিক। অতএব পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি, তাহাই ঠিক; সে কথা এই যে, স্বপ্ন-কালে বুদ্ধির খেলা যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা খেলা-মাত্র, অভিনয়-মাত্র;—একপ্রকার ছায়াবাজি; তা বই, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধির খেলা নহে।

তবেই হইতেছে যে, বুদ্ধি জাগ্রৎ-কালের বিজ্ঞান-রাজ্যেরই অধিপতি। স্বপ্নকালের মনোরাজ্যের অধিপতি মন। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, সুষুপ্তিকালের

নিস্তব্ধতা-রাজ্যের* অধিপতি কে? ইহার উত্তর এই যে, প্রাণ। সুষুপ্তি-কালের নিস্তব্ধতা-রাজ্যে কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায় দুইটি মাত্র; কি-দুইটি? না, প্রাণ-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম-সংশোধন এবং শরীরের স্বাস্থ্যসাধন।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, স্বপ্ন-কালের নকল-বুদ্ধি-ক্রিয়াতে যেমন জাগ্রৎকালের আসল-বুদ্ধি-ক্রিয়ার প্রতিভাস বা ছায়া বা গন্ধ সংসক্ত থাকে, সুষুপ্তি-কালের প্রাণ-ক্রিয়াতে তেমনি মনঃক্রিয়া এবং বুদ্ধি-ক্রিয়া, দুয়েরই ছায়া সংক্রামিত হয়। সুষুপ্তি-কালের প্রাণ-ক্রিয়াতে মনের ছায়া পড়া'তে সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রা-সুখের উপভোগ হয়; আর, সেই নিদ্রা-সুখের উপরে বুদ্ধির ছায়া পড়া'তে সুষুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানে নিদ্রাসুখের অনুভব হয়। যাহাই হউক না কেন, সুষুপ্তি-কালের জ্ঞান জাগ্রৎকালের বুদ্ধির ন্যায় জাগ্রত জীবন্ত জ্ঞান নহে, ইহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। সে জ্ঞান তবে কিরূপ জ্ঞান? কিরূপ জ্ঞান, বলিতেছি—শ্রবণ কর;—

এ প্রকার ঘটনা কিছু বিচিত্র নহে যে, একজন কবি গড়ের মাঠের তরুতলে বসিয়া কবিতা-রচনা-কার্য্যে এরূপ তন্মন-ভাবে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং স্বরচিত-কবিতা-রস-মাধুর্য্যে এরূপ প্রগাঢ় নিমগ্ন রহিয়াছেন যে, তাঁহার সম্মুখ দিয়া একদল সিপাহী-সৈন্য রণবাদ্য করিতে করিতে চলিয়া গেল—তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। এরূপ অবস্থায়, কবির জ্ঞান কবিতা-রচনা-কার্য্যে ভরপূর নিমগ্ন থাকাতে আর কোনো দিকেই যে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। কবিতা-রচনা-কালে কবির জ্ঞান যেমন অনন্য-মনসে সেই কার্য্যেই নিমগ্ন থাকে—অথবা যেমন দুর্ব্বাসা-ঋষির শাপ-প্রদানের অব্যবহিত পূর্ব্ব-ক্ষণে শকুন্তলার জ্ঞান দুষ্মন্ত রাজার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল—সুষুপ্তি-কালে নিদ্রিত ব্যক্তির জ্ঞান তেমনি অতীব একটি প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিমগ্ন থাকে; এমনি ভরপুর নিমগ্ন থাকে যে, আর কোনো দিকেই তাহার দৃষ্টিপাত করিবার সামর্থ্য থাকে না। সে কার্য্য কি? না, প্রাণের কল-ম্যারামতি-কার্য্য। শকুন্তলা যেমন দুষ্মন্ত রাজাকে ভাল বাসিতেন, বুদ্ধি তেমনি প্রাণকে ভাল বাসে। সুষুপ্তি-কালে তাই নিদ্রিত ব্যক্তির বুদ্ধি প্রাণের আরোগ্য-সাধন-কার্য্যে একান্তঃকরণে নিমগ্ন থাকে। ঐ কার্য্যটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে চলিতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুষুপ্তির আরাম অটুট থাকে। ঐ কার্য্যটি সাঙ্গ হইলেই নিদ্রাসুখের ভোগ-মাত্রা পর্য্যাপ্তি লাভ করে; ভোগমাত্রা পূর্ণ হইলেই নিদ্রা-ভঙ্গ হয়।

এতক্ষণ ধরিয়া যে বিষয়ের আলোচনা করা হইল, তাহাতে জীবাত্মার জ্ঞানের তিন কালের তিন অবস্থার প্রভেদ বুঝিতে পারিবার পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়াছে, এরূপ ভরসা হয়। এখন আমরা এটা অন্তত বুঝিতে পারিতেছি যে,—

(১) সুষুপ্তি-কালের জ্ঞান প্রাণ-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম-সংশোধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং তজ্জনিত আনন্দ-ভোগে নিমগ্ন থাকে।

(২) স্বপ্নকালের জ্ঞান মনোরাজ্যের প্রাতিভাসিক সত্তাতে ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে।

(৩) জাগ্রতকালের জ্ঞান, বিজ্ঞান-রাজ্যের ব্যাবহারিক সত্তার দুই পৃষ্ঠের অপর দুইরূপ সত্তার (বাস্তবিক এবং প্রাতিভাসিক এই দুইরূপ সত্তার), একের সহিত অন্যের যোগ-সংঘটন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে।

---

* স্তব্ধতা-শব্দের মুখ্য অর্থ স্তম্ভিত-ভাব। নিঃশব্দতা, নিস্তব্ধতা-শব্দের, গৌণ অর্থ মাত্র। নিস্তব্ধতা-শব্দের মুখ্য অর্থ স্থৈর্য্য অথবা প্রশান্তি।

অতঃপর তিন কালের জ্ঞানের তিন অবস্থা একসঙ্গে স্ফূর্ত্তি পাইবার সময় কোথায় কি ভাবে স্ফূর্ত্তি পায় এবং পৃথক পৃথক ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবার সময় কোথায় কোথায় কি-কি-ভাবে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

তাঁর মহিমা চিন্তা।

পড়ে
মেঘের জল,
ফলে
গাছের ফল,
তাঁর
কত কৌশল!
তাঁর
এ মেঘ বৃষ্টি,
তাঁর
এ সব সৃষ্টি,
তাঁর
সবেই দৃষ্টি।

জিজ্ঞাসা।

তটিনী সাগর পর্ব্বত অরণ্য
এ সকল বল হ'য়েছে কি জন্য?
এ সব ধরায় যদি না রহিত
তাহ'লে হ'ত কি সংসারের হিত?
হ'ত কি না হ'ত কে বলিতে পারে?
যাঁর সৃষ্টি কর জিজ্ঞাসা তাঁহারে।

ঈশ্বরের স্তব।

তুমি মহেন্দ্র
ক্রিয়াকাণ্ড তোমার যে মহা ঐন্দ্রজালিক,
তুমিই কেন্দ্র
সমুদয় বিশ্বের,—তুমিই শুদ্ধ মালিক।
তুমি ঈশ্বর
তোমারি ঐশ্বর্য্য এই পার্থিব রত্নরাজি;
অবিনশ্বর
তুমি, কি আশ্চর্য্য তব লীলা এ ভোজবাজি!

ভণ্ড যোগীর প্রতি।

মোহে ডুবে চাও তুমি আত্মার শ্রীবৃদ্ধি,—
লভিতে যোগের সেই অনন্ত সমৃদ্ধি?
কখনো হয় কি তাহা? মোহের যে বশ
লাভ হয় কি তাহার সিদ্ধির সুযশ?
এ বিপণী শ্রেণী তুমি পার ভূষিবারে
কিন্তু পারিবে না কভু সিদ্ধি লভিবারে।
আপনারে যোগী ভাবো, ভাবো ক্ষতি নাই,
এটা জেনো দিন গেলে ফিরে নাহি পাই।
কেন হেন ছদ্মবেশ? হ'য়ে হেন ভণ্ড
কেন নিজে হীনতেজ কর লণ্ডভণ্ড?
ত্যাগ কর,—বৃথা এই সন্ন্যাসীর বেশে
প্রতারিয়া লোকে কেন ভ্রম' দেশে দেশে?
মিথ্যা ত্যজি, কর সত্য ধ্যান ও ধারণা,
কর গো যথার্থ যোগ ছাড়ি' প্রতারণা।

একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানগণের ধর্ম্মমত।

একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস কিরূপ, আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহার কতক পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মবীজ ধারাবাহিকরূপে একত্রে প্রকাশিত হইলে সাধারণের সহজে বুঝিবার সুবিধা হইবে এই বিবেচনায় খ্রীষ্টিয়ান লাইফ্ হইতে উহা উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া দিলাম।

১। এক ঈশ্বর যিনি পিতা তাঁহাতেই বিশ্বাস করি, ত্রিত্বে বিশ্বাস করি না।

২। যিশুর উপদেশ মতে পিতা ঈশ্বরকেই পূজা করি; কুমারী মেরী স্বর্গদূত বা যিশুর পূজা করি না।

৩। ঈশ্বর সকলেরই প্রতি দয়াবান্; তাঁহার করুণা সমুদায় সৃষ্টির উপরে প্রসারিত; ঈশ্বর কোন আত্মাকে এক কালে বিনাশ করেন না।

৪। যিশুই খ্রীষ্ট এবং তিনি ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু তিনি পুত্র-ঈশ্বর নহেন।

৫। আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যিশু পৃথিবীতে জন্মিলেন ও মরিলেন; কিন্তু আমাদের স্থানীয় হইয়া আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নহে।

৬। (Holy spirit) পবিত্র-আত্মাই ঐশী শক্তি, যাহা মনুষ্যকে জ্ঞান দিতে পবিত্র করিতে ও সান্ত্বনা দিতে অবতীর্ণ হয়, ঈশ্বরে উহার বিভিন্ন সত্তা নাই।

৭। মনুষ্য-প্রকৃতির জনক ঈশ্বর, আমরা নহি, আমরা নিতান্ত অপবিত্র হইয়া জন্মি নাই, আমাদের ভিতরে সাধুভাব আছে।

৮। যাহারা অন্যায় করে তাহারা অন্যায় কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই ভোগ করিবে এবং কায়িক সদসৎ-কর্ম্মের জন্য ফল পাইবে।

৯। পাপী বিপথে গমন করিলেও সে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষমা পাইবে; পরের অপরাধ ক্ষমা করিলে আমরা নিজেও ক্ষমা পাইব।

১০। ঈশ্বর কাহাকেও একেবারে পরিত্যাগ করেন না; তাঁহার সকল শাস্তিই শোধনের জন্য ও উন্নত করিবার জন্য।

১১। ঈশ্বরের অমূল্য করুণাতেই মনুষ্যের মুক্তি; উহা কেবল ধর্ম্মমত বা সৎকার্য্যের ফলে নহে।

১২। ঈশ্বরকে সমুদয় হৃদয়, সমুদয় আত্মা, সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত শক্তির সহিত প্রীতি করা এবং প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসাই তাঁহার বিধি পালন।

১৩। বাইবেলে ঈশ্বরের কথা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার সমস্ত কথা ঈশ্বরের নহে।

১৪। প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ও বিচার করিবার অধিকার আছে; একজনের হিতাহিত জ্ঞানের উপরে অপরের কোন অধিকার নাই।

১৫। ভবিষ্যতে মনুষ্যের জন্য অপার সুখ শান্তির অবস্থা নিশ্চয়ই আছে।

ইহুদিদিগের ধর্ম্মমত।

মাইমোনিডাস, সেনহেড্রিনের টীকায় যে ত্রয়োদশ ধর্ম্মমত বিবৃত করিয়াছেন এবং অধিকাংশ য়িহুদীগণ কর্ত্তৃক যাহা পরিগৃহীত, উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। আমি ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস করি, তাঁহার নাম ধন্য হউক, তিনি স্রষ্টা ও পাতা উভয়ই; তিনি যাবতীয় পদার্থ রচনা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন।

২। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর এক, তাঁহার নাম ধন্য হউক। সেই যে এক তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। তিনিই আমাদের ঈশ্বর, তিনি ছিলেন, আছেন ও চিরকাল থাকিবেন।

৩। আমি বিশ্বাস করি তিনি শরীরী নহেন, তাঁহার নাম ধন্য হউক, শরীরের কোন ধর্ম্ম তাঁহাতে নাই, এমন কোন পদার্থ নাই যাহার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য আছে।

৪। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি স্রষ্টা, তাঁহার নাম ধন্য, হউক, সর্ব্বপ্রথমে ছিলেন এবং সর্ব্বশেষেও থকিবেন।

৫। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি স্রষ্টা, তাঁহার নাম ধন্য হউক, তিনিই উপাসিতব্য এবং অন্য কেহই আমাদের উপাসনার যোগ্য নহেন।

৬। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যৎ (ধর্ম্ম) বক্তাদিগের বাণী সত্য।

৭। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি আমাদের প্রভু মোজেসের, তিনি শান্তিতে থাকুন, বাণী সত্য; ধর্ম্মবক্তাগণ যাঁহারা হইয়াছেন ও হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৮। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে ধর্ম্ম গ্রন্থ আমাদের নিকট আছে তাহা আমাদের প্রভু মোজেসের, তিনি শান্তিতে থাকুন।

৯। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, সে ধর্ম্ম নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইবেক না, বা অন্য কোন ধর্ম্ম-বিধান ঈশ্বর প্রেরণ করিবেন না, তাঁহার নাম ধন্য হউক, তিনি মনুষ্যের সমুদয় কার্য্য ও চিন্তা জানিতেছেন এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে "তিনি সকলের অন্তঃকরণের নির্ম্মাতা এবং সকল কার্য্যের বিচারক।"

১০। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর, তাঁহার নাম ধন্য হউক, আমাদের চিন্তা ও কার্য্য জানিতেছেন, এবং উক্ত হইয়াছে তিনি অন্তঃকরণের নির্ম্মাতা এবং সকল কার্য্যের বিচারক।

১১। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি ঈশ্বর, তাঁহার নাম ধন্য হউক, তাঁহার আদেশ পালনকারিগণের পুরস্কর্ত্তা, নিয়মভঙ্গকারীগণের দণ্ডদাতা।

১২। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, মেসায়া অবতীর্ণ হইবেন, বিলম্ব হইতে পারে, তথাপি আমি প্রত্যহ আশা করি তিনি আসিবেন।

১৩। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর, এক সময়ে যখন তাঁহার কৃপা হইবে মৃতগণকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন, তাঁহার নাম ধন্য হউক, যুগে যুগে তাঁহার নাম গৌরবান্বিত থাকুক।

যে কেহ ইহার কোন একটিতে অবিশ্বাস করে মাইমেনিডাসের মতে তিনি অবিশ্বাসী ও য়িহুদি সমাজের বহির্ভূত।

প্রেম।

প্রেমের নীরব বাগ্মিতার নিকট অন্য বাগ্মিতা পরাস্ত। একটী নিরক্ষর ব্যক্তির হৃদয়ের নিঃশব্দ বাগ্মিতায় কোটি কোটি নরনারী মুগ্ধ ও বশীভূত হয়। মহম্মদ প্রভৃতির জীবন ইহার প্রমাণ।

খাঁটি প্রেম নীরব,—মুখই উহার বাসস্থান নহে। ইহার বাসস্থান হৃদয়ে, কর্ম্মে, জীবনে। প্রকৃত জীবন, নিঃশব্দ কর্ম্মযোগ, প্রেমযোগ।

প্রেমের ভাষা সর্ব্বত্রই এক। আইসল্যাণ্ডেও যাহা, ভারতবর্ষেও তাহা,—শ্রীকৃষ্ণের সময়েও যাহা, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্যের সময়েও তাহা। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, সন্তানকে স্তন্য দান, জনক জননীর চরণার্চ্চনা, পতির প্রতি পাতিব্রত্য সর্ব্বত্রই এক ভাষাতে নিষ্পন্ন হয়। ইহার অনুবাদ নাই। বক্তৃতা তাহার অভাব পূরণ করিতে অক্ষম। উহার মল্লীনাথ নাই; অন্বয়, ব্যাখ্যা ও ভাষ্য নাই।

এই প্রেম-ভাষার একই বর্ণমালা,—জীব-হৃদয়রূপ গ্রন্থের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত,—মরমে মরমে গ্রথিত আছে। উহা কেবল অনুভবনীয়,—অলিখিত,—অনুচ্চারিত। উহা এক নিত্য নব বেদ,—নিত্য নব সংহিতা,—নিত্য নব পুরাণ,—নিত্য নব গীতা, কবিতা। উহা হৃদয়ের নিত্য নব বিধান। উহার অতুল সামগান, অন্যের হৃদয়ের সুখ দুঃখের সমবেদনা।

শকুন্তলার মধুর প্রেমের মধ্যে প্রগল্‌ভতা ছিল না। মৃদুতা ও নীরবতাই তাহাকে অলৌকিকত্ব, অপূর্ব্বত্ব প্রদান করিয়াছিল। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর মধুর ভাবের প্রধান অঙ্গ নীরব স্নেহশীলতা,—নীরব প্রিয় কর্ম্মানুষ্ঠান,—নীরব প্রেম।

সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের কালনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ভাদ্র মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কায়মনে কালনা ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁহারই যত্নে তথাকার সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইত। আমরা এতদিন পরে তাদৃশ উৎসাহী বন্ধুকে হারাইলাম। এক্ষণে ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৬১৫৸৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৭১॥৶৩
সমষ্টি	...	১১৮৭॥ ৯
ব্যয়	...	৫৫৯। ৬
স্থিত	...	৬২৮। ৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একঃকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ১২৮॥ ৩

৬২৮। ৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১০৲

২০০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৪৬।৶০
পুস্তকালয়	...	১১৸৶৬
যন্ত্রালয়	...	২৫৩।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৪।০
সমষ্টি		৬১৫৸৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩০৪ ৻৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৩ ৶৬
পুস্তকালয়	...	। ৯
যন্ত্রালয়	...	১৯৮৸ ৯
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	৩৩৲
সমষ্টি		৫৫৯। ৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

পঞ্চদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩।

৭ ৯ সংখ্যা　　　　　　　　　　　　১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ১ অগ্রহায়ণ সোমবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

সার সত্যের আলোচনা।

জাগরিত অবস্থার বিশেষত্ব।

জীবাত্মার অবস্থা অনেক; তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক অবস্থা তিনটি—(১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন এবং (৩) সুষুপ্তি। অবস্থা-শব্দের মুখ্য অর্থ অবস্থিতি। অবস্থিতি দুইরূপ—(১) দেশে অবস্থিতি, (২) কালে অবস্থিতি। অবস্থা-শব্দের প্রচলিত ভাবার্থ—কালে অবস্থিতি। যাহা আবির্ভূত হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে এবং তৎপরে তিরোহিত হয়, তাহারই নাম অবস্থা। সাধারণত, অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে, মনুষ্যের জাগরিতাবস্থার স্থিতিকাল দিবাভাগ; স্বপ্নাবস্থার স্থিতিকাল পূর্ব্বরাত্রি এবং শেষ রাত্রি; সুষুপ্ত অবস্থার স্থিতি-কাল মধ্যরাত্রি। ঐ তিনটি মৌলিক অবস্থা একদিকে যেমন তিন বিভিন্ন কালের তিন বিভিন্ন অবস্থা, আর এক দিকে তেমনি উহা একই অভিন্ন জীবাত্মার তিন বিভিন্ন অবস্থা। এটা যখন সুনিশ্চিত যে, ও-তিন অবস্থা একই জীবাত্মার তিন কালের তিন অবস্থা, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ও-তিন অবস্থা পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য যোগ-সূত্রে সংগ্রথিত। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, জাগরিতাবস্থার কর্ম্মোদ্যম ক্রমে ক্রমে অবসান প্রাপ্ত হইয়া নিদ্রার দিকে অল্পে অল্পে পা বাড়ায়; নিদ্রার আরামের মাত্রা ক্রমে ক্রমে অবসান প্রাপ্ত হইয়া জাগরণের দিকে অল্পে অল্পে পা বাড়ায়; পূর্ব্বরাত্রের স্বপ্ন সুষুপ্তির দিকে, এবং শেষরাত্রের স্বপ্ন জাগরণের দিকে অল্পে অল্পে পা বাড়ায়। জাগরণ এবং নিদ্রা এরূপ গায়ে গায়ে সংলগ্ন রহিয়াছে যে, নিদ্রার হ'ব হ'ব অবস্থার নামই জাগরণের যা'ব যা'ব অবস্থা, আর, জাগরণের যা'ব যা'ব অবস্থার নামই নিদ্রার হ'ব হ'ব অবস্থা। পূর্ব্বরাত্রের জাগরণ এবং নিদ্রার সন্ধিস্থান দেখ—দেখিবে যে, তাহা জাগরণের অন্ত এবং নিদ্রার আদি; শেষরাত্রের নিদ্রা এবং জাগরণের সন্ধিস্থান দেখ—দেখিবে যে, তাহা নিদ্রার অন্ত এবং জাগরণের আদি। দুই সন্ধিস্থানই না জাগরণ, না নিদ্রা, অথবা জাগরণ এবং নিদ্রা দুইই একসঙ্গে। উভয়ের সন্ধিস্থান যখন না জাগরণ না নিদ্রা, তখন তাহাতেই প্রমাণ

হইতেছে যে, নিদ্রা এবং জাগরণ স্বত কিছুই নহে—তাহা একই অভিন্ন জীবাত্মার বিভিন্ন রূপান্তর-ঘটনা মাত্র। তা ছাড়া, তিন কালের তিন অবস্থার প্রত্যেকেরই গাত্রে একই অভিন্ন অধিষ্ঠাতার নাম লেখা রহিয়াছে স্পষ্ট;—তোমার তিন অবস্থার গাত্রে তোমার নাম লেখা রহিয়াছে, আমার তিন অবস্থার গাত্রে আমার নাম লেখা রহিয়াছে, দেবদত্তের তিন অবস্থার গাত্রে দেবদত্তের নাম লেখা রহিয়াছে। তবে কি না—নীলবর্ণ আলেখ্য-পটে যেমন সোণার অক্ষর বেশী ফোটে, রূপার অক্ষর ফোটে কিন্তু তত না, লোহার অক্ষর আদবেই ফোটে না; তেমনি (রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে) সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম সূর্য্যরশ্মির সুবর্ণ-লেখনী দিয়া সোণার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহা জ্বল্-জ্বল্ করিতে থাকে; অর্দ্ধসুপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম চান্দ্রমসী রজত-লেখনী দিয়া রূপার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহা ঝাপ্সা ঝাপ্সা দ্যাখায়; সুষুপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ-পটে যখন তাহার নাম নৈশ অন্ধকারের লৌহ-লেখনী দিয়া লোহার অক্ষরে লিখিত হয়, তখন তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তার সাক্ষী—সজাগ ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, "এ জাগরিত অবস্থা আমারই জাগরিত অবস্থা"। অর্দ্ধসুপ্ত ব্যক্তি এটা যদিচ বুঝিতে পারে যে, "এ যাহা আমি দেখিতেছি, তাহা আমিই দেখিতেছি", কিন্তু, তা বই, এটা সে বুঝিতে পারে না যে, "আমি স্বপ্ন দেখিতেছি"। সুষুপ্ত ব্যক্তির জ্ঞান যদিচ নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে নিলীন হইয়া প্রাণের আরাম, মনের শান্তি এবং শরীরের আরোগ্য অনুভব করে, কিন্তু তথাপি এটা সে বুঝিতে পারে না যে, "আমি নিদ্রা যাইতেছি"। অতএব এটা যেমন সুনিশ্চিত যে, তিন অবস্থা একেরই তিন অবস্থা, এটাও তেমনি সুনিশ্চিত যে, তিন অবস্থা যে একেরই তিন অবস্থা এবৃত্তান্তটি ধরা দ্যায় কেবল এক অবস্থায়; অপর দুই অবস্থায় তাহা অব্যক্ত থাকে। ধরা দ্যায় কোন্ অবস্থায়? না জাগরিত অবস্থায়। জাগরিত অবস্থাতে—কাহাকে বলে জাগরিতাবস্থা, কাহাকে বলে স্বপ্নাবস্থা, কাহাকে বলে সুষুপ্তাবস্থা, সমস্তই জ্ঞাতা পুরুষের নিকটে সুব্যক্ত হয়। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, জাগরিতাবস্থার মধ্যেই অপর দুই অবস্থা তলে তলে জানান্ দিতেছে; কেন না, জাগরিতাবস্থার মধ্যে যদি অপর দুই অবস্থার কোনো নিদর্শনই বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে জাগ্রৎকালে সে দুই অবস্থার সম্বন্ধে কোনো কথা চলিতে পারা দূরে থাকুক, কোনো কথা উঠিতেই পারিত না।

জাগ্রৎকালের স্বপ্ন।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চিত্র-বীক্ষণ যন্ত্রের অভ্যন্তরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে এক-প্রকার প্রাতিভাসিক দৃশ্য দর্শকের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। সে দৃশ্যের ভিতরের ব্যাপারটা যে কি, তাহা বিজ্ঞানের কৃপায় অনেকেই আমরা বুঝি। কিন্তু আমরা বুঝিলে কি হইবে—আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় বোঝে না। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়কে আমরা যতই বুঝাইয়া বলি না কেন—যে, "তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা"—সে কিন্তু কিছুতেই আপনার গোঁ ছাড়ে না; সে বলে, "বাঃ! স্পষ্ট আমি দেখিতেছি অভ্রভেদী পর্ব্বত, স্রোতস্বতী নদী, পুষ্পিত উদ্যান-কানন, হংসকারণ্ডবাকীর্ণ সরোবর, সুব্যবস্থিত রাজ-

ঘাট-দেবালয়-প্রাসাদ-উদ্যান-পুষ্করিণী-পরিশোভিত লোকালয়—তুমি বলিতেছ কি না 'সর্ব্বৈব মিথ্যা'! তোমার চক্ষুদুটিকে তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ!" ইহার প্রত্যুত্তরে বুদ্ধি বলে যে, "তুমি দেখিতেছ এটা সত্য, কিন্তু যাহা দেখিতেছ তাহা মিথ্যা।" ইহারই নাম হর-পার্ব্বতীর কন্দল। হাজার হো'ক্ বুদ্ধি অবলা স্ত্রী; মন প্রমত্ত দিগ্‌গজ; মনের গায়ের জোরের কাছে বুদ্ধি আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বুদ্ধি বেচারী নিতান্তই দায়ে পড়িয়া, মন যাহা বলিতেছে, তাহাই ঘাড় পাতিয়া লয়। বুদ্ধিমতী বুদ্ধি বলে, "সত্যি! কেমন দেখ বাগান! দিব্যি সোণালি রঙের চাঁপাফুল ফুটে' র'য়েচে! আমার বড্ড সাধ গিয়েছে—ঐ ফুলটিকে তুল্ করে কাণে পরি।" মন ফুল তুলিতে গিয়া দেখে যে, সে ফুলও নাই, সে উদ্যানও নাই, সবই ভোঁ ভাঁ! মন তখন মনের খেদে বলে—"এ যাহা আমি দেখিয়া শিখিলাম, বুদ্ধি তাহা না দেখিয়া—না শিখিয়া—আগে ভাগেই জানিয়া বসিয়া আছে! কালিদাস ঠিক্‌ই বলিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত পটু অর্থাৎ না পড়িয়া পণ্ডিত!" প্রকৃত কথা এই যে, বুদ্ধি না দেখিয়া ও-কথা বলে নাই; বুদ্ধি গবাক্ষের দ্বারে উঁকি দিয়া মনকে অনেকবার ঐরূপ প্রতারিত হইতে দেখিয়াছে; আর, সেই ভূয়োদর্শনের ফলেই জানিতে পারিয়াছে যে, মন যাহা দেখিতেছে—সবই ফাঁকি। মনের ভ্রান্তিও এক-প্রকার ভূয়োদর্শনের ফল। কিন্তু মনের ভূয়োদর্শন প্রকৃত প্রস্তাবে ভূয়োদর্শন নহে, তাহা অন্ধ সংস্কার। এ সম্বন্ধে পরে অনেক কথা বলিবার আছে; এখানে এ যাহা স্বল্প ইঙ্গিত করিলাম—এই অবধিই ভাল। বর্ত্তমান স্থলে অন্ধ ভূয়োদর্শনের চক্রে পড়িয়া মন কিরূপে বিভ্রান্ত হয়, তাহার একটা নমুনা দেখাই—অর্থাৎ কি হইলেই মনের বিভ্রান্তি কোন্ পথ দিয়া যাতায়াত করে, তাহার কতকটা ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারিবে।

দর্শক যখন সম্মুখবর্ত্তী দৃষ্টিক্ষেত্রে চক্ষু নিবিষ্ট করে, তখন সেই দৃষ্টিক্ষেত্রের ঈষৎ বিভিন্ন দুই দিকের ঈষৎ বিভিন্ন দুইখানি ছবি দর্শকের দুই নেত্রে নিপতিত হয়। ঐ-প্রকার ছবি-যুগলের ঈষৎ আকার-ভেদ, উভয়ের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু-সকলের হ্রস্বদীর্ঘতার আপেক্ষিক পরিমাণ, * এবং তাহাদের সঙ্গাশ্রিত ছায়াতপের প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি-ঘটিত কতকগুলি চিহ্নের সহিত উক্ত বস্তুসকলের দূরত্ব-নৈকট্যের ভান ভূয়োদর্শনের সংস্কার-সূত্রে দর্শকের মনোমধ্যে ক্রমাগতই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর রূপে বাঁধা পড়িয়া যাইতে থাকে। ঐ সকল সাঙ্কেতিক চিহ্নের কোন্-কোন্-গুলি কোন্ কোন্ বস্তুর গাত্রে কি-কি-ভাবে কি-কি-পরিমাণে বিন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা দর্শকের চক্ষে পড়িবামাত্রই দর্শকের মনে ধ্রুব প্রতীতি হয় যে, অমুক বস্তু বেশী দূরে রহিয়াছে, অমুক বস্ত কম দূরে রহিয়াছে, অমুক বস্তু খুব নিকটে রহিয়াছে; আর, দর্শকের মনে ঐ যাহা প্রতীতি হয়, দর্শক তাহাই চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করে। দৃশ্য-দর্শন-কালে একই দৃশ্যের ঈষৎ বিভিন্ন দুই দিকের যেরূপ দুইখানি ছবি দর্শকের দুই চক্ষে সচরাচর নিপতিত হয়, চিত্রবীক্ষণ যন্ত্রের ছবি ঠিক্ তেমনিতর দুইখানি ছবি; অর্থাৎ তাহা একই দৃশ্যের ঈষৎ বিভিন্ন

---

* ইহার পরিবর্ত্তে "ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সকলের গাত্রনিষ্ক্রান্ত রশ্মি-চঞ্চুর কোণাগ্রের সরুমোটাত্বের তারতম্য" বলিলে কথাটা বৈজ্ঞানিক হইত। কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে, আঁটাসাঁটা বৈজ্ঞানিক পরিচ্ছদ অপেক্ষা, লৌকিক জ্ঞানের আটপৌরে ধুতিচাদরই বর্ত্তমান প্রবন্ধের গাত্রে মানায় ভাল।

দুই দিকের দুইখানি ছবি। এই জন্য দর্শক সেই দুই ছবির ঈষৎ আকার-ভেদ, উভয়ের অন্তর্গত চিত্রিত বস্তুসকলের হ্রস্বদীর্ঘতার আপেক্ষিক পরিমাণ, এবং তাহাদের সঙ্গাশ্রিত ছায়াতপের প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি-ঘটিত বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিবামাত্র তদনুসারে সেই সকল বস্তুর বিশেষ বিশেষ দূরত্ব-নৈকট্য অবধারণ করিতে অগত্যা বাধ্য হয়; আর, সেইরূপে বাধ্য হইয়া আপনার চক্ষের সম্মুখে একটা বৃহৎ দৃশ্যব্যাপার উদ্ভাবন করে—আপনিই উদ্ভাবন করে, অথচ এটা সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না যে, "আমি উদ্ভাবন করিতেছি"। এই কারণ-বশত দর্শকের মনো-মধ্যে এইরূপ একটা দুরপনেয় ভ্রম জন্মে যে, যে-বস্তু চক্ষের সম্মুখে যে যে স্থানে প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিকই যেন সেই সেই বস্তু সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, স্বপ্নাবস্থায় দর্শকের মনের চিরাভ্যস্ত সংস্কার যেমন বুদ্ধির অসাক্ষাতে কার্য্য করিয়া নানাপ্রকার দৃশ্য উদ্ভাবন করে, জাগরিতাবস্থাতেও অবিকল তাহাই করে; প্রভেদ কেবল এই যে, স্বপ্নাবস্থায় চিরাভ্যস্ত সংস্কার অবিতর্কিত-ভাবে যাহা প্রাণ চায় তাহাই উদ্ভাবন করে; পরন্তু জাগরিতাবস্থায় মনোরাজ্যের স্বপ্ন বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া দর্শকদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে।

জাগ্রৎকালের সুষুপ্তি।

নিদ্রাকালে আমরা যেরূপ আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করি, এবং তজ্জনিত স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করি, জাগ্রৎকালেও সেইরূপ করিয়া থাকি। জাগ্রৎকালে দৈবাৎ কখনো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পরিচালনা-পথে কফাদির বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, তবেই যা সে-দুই কার্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে, নহিলে নিদ্রাকালেও যেমন—জাগ্রৎকালেও তেমনি—সে-দুই কার্য্য আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে স্বভাব-গুণে আপনা-আপনি চলিতে থাকে। ঘুমানো আর কিছুই না—প্রকৃতির অব্যক্ত সত্তাতে হাত-পা ছড়াইয়া গা ভাসাইয়া দেওয়া। যখন নৌকা পা'ল পাইয়াছে—এবং অনুকূল স্রোত বহিতেছে—দাঁড়ি তখন ঘুমন্ত-ভাবে দাঁড় টানে। নৌকা যখন বেস্ পা'ল পাইয়াছে, কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে চলিতেছে, দাঁড়ি তখন অর্দ্ধসুপ্ত-ভাবে দাঁড় টানে। যখন বায়ু এবং স্রোত দুইই প্রতিকূলে বহিতেছে, তখনই দাঁড়ি পূরামাত্রা জাগ্রত-ভাবে দাঁড় টানে। তেমনি সচরাচর আমরা ঘুমন্ত-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করি; তা বই, যখন আমরা মাত্রাতীত শারীরিক পরিশ্রম করিয়া হাঁপাইতে থাকি, তখনই কেবল জাগ্রত-ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করিতে থাকি। সচরাচর আমাদের প্রাণ আমাদের জ্ঞানের অসাক্ষাতে আমাদের-হইয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আকর্ষণ-বিসর্জ্জন করে;—প্রাণের এইরূপ অব্যক্ত স্ফূর্ত্তির নামই (অর্থাৎ অচেতন স্ফূর্ত্তির নামই) সুপ্তি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই মন দৌড়িয়া আসিয়া প্রাণের হাতের কাজ আপনার হাতে টানিয়া লয়; তাহা যখন করে, তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সুপ্তি ভাঙিয়া যায়। তবেই হইতেছে যে, জাগরিতাবস্থার মধ্যেও সুষুপ্তি তলে তলে আপনার রাজ্য চালায়; কোন্ রাজ্য? না প্রাণরাজ্য। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎকালে মনোরাজ্যের স্বপ্ন বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া স্বকার্য্য সাধন করে; এক্ষণে অধিকন্তু দে-

খিতে পাইতেছি যে, প্রাণরাজ্যের সুষুপ্তি মনোরাজ্যের প্রাচীরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া অব্যক্ত সত্তার তামস পরিচ্ছদ বয়ন করিতে থাকে। মোট কথা এই যে, জাগরণের কার্য্যক্ষেত্রে—উপরের কর্ম্মচারী উপরের কার্য্য করে, নিচের কর্ম্মচারী নিচের কার্য্য করে, মধ্যের কর্ম্মচারী মধ্যের কার্য্য করে; তা বই, কেহই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না।

মনে কর, আমি একটা হাঁড়িতে আধ-সের জল, এক-সের ঘৃত এবং দুই-কুন্‌কে চাউল নিক্ষেপ করিয়া সেই তিন-দ্রব্য-সংবলিত হাঁড়িটা ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম। কিয়ৎপরে এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখিয়া আইস তো—উহাতে কি আছে।" সে বলিল, "ঘৃত আছে।" আমি বলিলাম, "উহাতে আর কোনো সামগ্রী তো নাই?" সে বলিল, "আর তো কিছুই দেখিতে পাইলাম না।" সে দেখিতে না পা'ক্—আমি কিন্তু দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, ঐ হাঁড়িটার উপরি-স্তরে ঘৃত রহিয়াছে, মধ্যস্তরে জল রহিয়াছে, নিম্ন-স্তরে তণ্ডুল রহিয়াছে। তেমনি, আর কেহ দেখিতে পা'ক্ বা না পা'ক্—যে দেখিতেছে সে দেখিতেছে যে, জাগরিতাবস্থার উপরি-স্তরে বুদ্ধি ব্যাবহারিক সত্তাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে; মধ্যস্তরে মন প্রাতিভাসিক সত্তাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে; নিম্নস্তরে প্রাণ অব্যক্ত সত্তাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে। জাগরিতাবস্থা এবং স্বপ্নাবস্থার মধ্যে প্রধান একটি প্রভেদ এই যে, প্রাতিভাসিক সত্তা জাগরিতাবস্থার মধ্যস্তরে চাপা থাকে, স্বপ্নাবস্থায় তাহা উপরি-স্তরে ভাসিয়া ওঠে। তেমনি আবার, জাগরিতাবস্থা এবং সুষুপ্ত অবস্থার মধ্যে প্রধান একটি প্রভেদ এই যে, অব্যক্ত সত্তা জাগরিতাবস্থার নিম্নস্তরে চাপা থাকে, সুষুপ্ত অবস্থায় তাহা উপরিস্তরে ভাসিয়া ওঠে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত একই সীধা রাস্তা অবলম্বন করিয়া পদব্রজে সটান চলিয়া আসিয়াছি। এখন যে স্থানটিতে পৌঁছিয়াছি—এ স্থানটি অনেকগুলা পথের সঙ্গম-স্থান; তাহার মধ্যে কোন্ পথ আপাতত অবলম্বনীয়, তাহা বিবেচনার বিষয়। এই সঙ্গম-স্থানটিতে পদার্পণ করিবামাত্র আলোচককে একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে হইতেছে। এই স্থানটির নানা-দিক্ হইতে নানা-ভাবের ত্রিক আসিয়া যখন-তখন আলোচকের সম্মুখে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে; সময়ে সময়ে সেগুলাকে সাম্‌লানো ভার হইয়া পড়ে। আশ্চর্য্য এই যে, যেমন 'সব শেয়ানের একই রায়', তেমনি সব ত্রিকেরই ভিতরের কথা একই ধরণের। একটি ত্রিকের চাবি পাইলেই তাহা দিয়া সব ত্রিকেরই ডালা খোলা যায়। আলোচিতব্য ত্রিকগুলি নিম্নে পংক্তি সাজাইয়া প্রদর্শন করা হইল।

ত্রিক-সপ্তক।

(১)	প্রাণ	মন	বুদ্ধি।
(২)	উদ্ভিদ্	জন্তু	মনুষ্য।
(৩)	সুষুপ্তি	স্বপ্ন	জাগ্রৎ।
(৪)	প্রলয়	সৃষ্টি	স্থিতি।
(৫)	অব্যক্ত সত্তা	প্রাতিভাসিক সত্তা	বাস্তবিক সত্তা।
(৬)	ভোগ	কর্ম্ম	জ্ঞান।
(৭)	তম	রজ	সত্ত্ব।

এই পংক্তি-সপ্তকের মধ্যে মোটামুটি যে একপ্রকার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা তো দেখিতে পাওয়া যাইতেইছে; তা ছাড়া তাহার মধ্যে অনেকগুলি নিগূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে-গুলির ভিতরের সমাচার সংগ্রহ করিতে

হইলে, নিগূঢ় তত্ত্বের সমুদ্রে ডুব দিতে ভয় করিলে চলিবে না। বারান্তরে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

প্রেম। নীরবতা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

বিহঙ্গমের আনন্দ-কূজনে, হরিণীর বিমল স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নপ্রান্তে, শিশুর আধ আধ অব্যক্ত ভাষায় ও মধুর ওষ্ঠকম্পনে, প্রণয়িণীর বিষাদমাখা মুখমণ্ডলে, বিরহীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি এবং দীর্ঘনিশ্বাসে, অভিমানিনীর চরণনখাগ্র-সংলগ্ন অধোদৃষ্টিতে, ক্রোধীর ভ্রূকুটীতে, পরসুখকাতর ব্যক্তির ললাটকুঞ্চনে, লোভীর সতৃষ্ণ সফরীচঞ্চল নয়নপাতে, মোহান্ধের মলিন চক্ষে, মদগর্ব্বিতের স্ফীতবক্ষে, বিরাগীর লক্ষ্যহীন চাহনীতে, ভক্তের স্ফটিকস্বচ্ছ অশ্রুকণায়, কবি ও যোগীর আনন্দরসমগ্ন শান্তভাবে, যে সমুদায় ভাব, যে সকল কথা প্রকাশিত হয়, তাহা কি বাক্যের দ্বারা অভিব্যক্ত করা যায়?

এই কারণেই কোন ফরাশিষ রাজনীতিজ্ঞ মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, ভাব প্রকাশ না করিয়া ভাব গোপন করিবার জন্যই মানবকে ভাষা প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাষা যদি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতেই না পারে, তবে উহা কি করে? কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ ও কিয়ৎপরিমাণে গোপন করে। *—সুতরাং হৃদয়ের ভাব প্রকাশবিষয়ে নীরবতাই ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর! জর্ম্মাণ প্রবচন আছে যে,—বাণী রজতময়ী, নীরবতা স্বর্ণময়ী। †

চিন্‌দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মবীর কংফুচ বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর কি কথা কহেন?" ‡ অথচ তিনি বাক্যের বাক্য! তিনি অশব্দ হইলেও তাঁহার নাদে ব্রহ্মাণ্ড নিনাদিত।

ভগবান বাগতীত, বাক্যহীন, তথচ তিনি বাক্যের বাক্য, বাণীর সৃজনকর্ত্তা। তিনি কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, প্রেমিকশ্রেষ্ঠ, অথচ কেমন নীরবে চন্দ্র সূর্য্যকে প্রধাবিত করিতেছেন,—নদ নদীকে প্রবাহিত করিতেছেন,—কুসুমকলিকাগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন,—ঋতুগণের পরিবর্ত্তন করিতেছেন এবং অনন্ত জগতের অনন্ত ব্যাপার সমূহ অতি সুপ্রণালীতে চালিত করিতেছেন! তিনি অশব্দ এবং অবাঙ্মনসগোচর, কিন্তু বজ্রনাদের উপরে,—সমুদ্র-নির্ঘোষের উপরে,—কুরুক্ষেত্র, মেরাথন, ওয়াটার্লু এবং ব্রুমফণ্টেনের ঘোর সমরানলের উপরে তাঁহার মৃদু মধুর ভগবদ্বাণী শ্রুত হইয়াছে। ভীষণ ভূমিকম্পের মধ্যে দুর্ভিক্ষ্য ও মহামারীর মধ্যে,—জরামৃত্যু শোক দুঃখের মধ্যে,—রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজ-কম্পের মধ্যে, তাঁহার সুকণ্ঠ চিনিতে পারা যায়। স্ফুটনোন্মুখ ঊষার মুখে, স্ফুটপ্রায় সরোজিনীর অর্দ্ধ-ব্যক্ত হৃদয়ে,—মুক্তাবগুণ্ঠন কুসুম-কলিকার স্নেহ-দৃষ্টিতে,—তৃণশিশুর তৃষিত মুখের উপর শিশিরবিন্দুর নিঃশব্দ পতনের ভিতরে, লজ্জারক্তিম গোলাব্-কলিকার ব্যক্ত হৃদয়ের বুকভরা স্নেহের উপর,—শিশিরকণার সহিত তরুণ অরুণ কিরণের ক্রীড়ার ভিতর,—মৃদুমন্দ মলয়-সমীরের মৃদু মধুর রাগিণীর মধ্যে, দোলিত বৃক্ষপত্রের মরমর্, ঝুরুঝুর্ প্রেম-সঙ্গীতের ভিতর তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা গিয়াছে। স্রোতস্বতী নীরবে গিরিশৃঙ্গকে ধৌত ও ক্ষয়যুক্ত করিয়া সমুদ্র-

---

* "For words, like Nature, half reveal
And half conceal the Soul within."
Tennyson. In Memoriam.

† "Speech is silvern,—Silence is golden."
—German Proverb.

‡ "Does Heaven speak?"—Legge's Translation of Confucius' works.

গর্ভে পরিণত করিতেছে,—সমুদ্রবক্ষে পঙ্ক ও প্রবালস্তর স্তূপীকৃত হইয়া হিমালয়শিখরে পরিণত হইতেছে। কত নব নব নক্ষত্র গলিত ধাতুপুঞ্জ হইতে জীবের বাসোপযোগী শীতল ও ঘন মৃত্তিকাপুঞ্জে পরিণত হইতেছে,—যুগযুগান্তর ধরিয়া সেই এক পুরাতন বিশ্বকারিকর নীরবে এতাবৎ সমুদায় সম্পন্ন করিতেছেন, এবং ধীরে ধীরে, নীরবে, নব নব জাতি, নব নব জীব, নব নব নক্ষত্র, নব নব ওষধী বনস্পতি প্রভৃতির কুসুম ফুটাইয়া তুলিতেছেন। কে সেই নীরব ও নিশ্চয় অস্ত্রাঘাত শ্রবণ করিতেছে,—সেই বিশ্বকারিকরের নীরব-রচিত কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছে? তিনি জীবের প্রাণের মধ্যে নীরব ও অলক্ষিত ভাবে প্রাণেশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। তিনি মৃদু বিবেকধ্বনির সহিত বীণা ও রবাবের নিক্কণের ন্যায় মধুর স্বীয় কণ্ঠস্বরকে যুক্ত করিতেছেন,—হৃদয়ের হাসির ভিতরে নিজের হাসি মিলাইতেছেন,—স্নেহধারার সহিত তাঁহার প্রেমামৃত স্রোত মিশাইতেছেন,—স্বয়ং প্রেম হইয়াও নীরবে আত্মগোপন পূর্ব্বক জীবের প্রেমচ্ছায়ার মধ্যে নিজেকে অলক্ষিত ভাবে মিলাইয়া, জীবের দ্বারে দ্বারে, হৃদয়ে হৃদয়ে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এবং মানব চরিত্রকে,—চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছাকে গোপনে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। তাঁহার এই নিঃশব্দ মুরলীর স্বর কত লোকের প্রাণ মন কাড়িয়া লইয়াছে এবং তাঁহারা চণ্ডীদাসের মত প্রেমাশ্রুপাত করিতে করিতে গাহিয়াছেন,—"সই! জীবন মন নেয় বাঁশী!" যাঁহার হৃদয়-বীণার কোমল তন্ত্রীর উপর এই নীরব বাদকের অঙ্গুলী-সঞ্চালন দৃষ্ট ও শ্রুত হইয়াছে, তিনি ধন্য। তাঁহার প্রাণ নব বলে, নব ভাবে, নব রসে পরিপূর্ণ। বিশ্বকর্ম্মার সমুদায় কল কারখানা নিঃশব্দে চালিত হইতেছে। অণু ও ব্রহ্মাণ্ড, ব্যক্তি ও জাতির জীবনে উহা ব্যক্ত।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রের মত যিনি সুকণ্ঠে গাহিতে পারেন,—"তোমার রাগিণী জীবন কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো," তিনিই ভগবানের নীরব কণ্ঠধ্বনি চিনিয়াছেন। কবির অতুল 'রবি'-কিরণে এই সত্যটী কেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রবণ করুন,—

"তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয় পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দন-গন্ধ-নন্দিত,
ফিরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু,
সাজে যেন সদা সাজে গো!
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে,
তব সঙ্গীত ছন্দে!
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,—
তব গৌরবে সকল গৌরব
লাজে' যেন সদা লাজে গো!"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এমন সুন্দর নীরব হাসি কখনও দেখি নাই! এমন সুন্দর ধ্রুপদ খেয়াল কখনও শুনি নাই! 'রবি'-কিরণের অপরূপ ভাতি যেন অমৃতময়ী সঙ্গীতধারাতে প্লাবিত করিয়া আমাদের হৃদয় মনের চক্ষু কর্ণ ফুটাইয়া তুলিল!

সে রাগিণীর অশব্দ স্বরলিপি যিনি জানেন না, তিনি "ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া বৃথা

বাক্য ব্যয় করেন।" "মোল্লা হোকে বাও খুন্দারে।" উপাস্য যেমন, উপাসকও তেমনি হয়। তিনি এই বাক্যশূন্য বক্তার বক্তৃতায় মোহিত, তিনিও বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়া, সেই সঙ্গীত-স্রোতে আত্মাকে নিমজ্জিত করিয়া, স্বয়ং উপাস্য দেবতার ন্যায় মৌনাবলম্বন করেন,—মুনি বা মৌনী হয়েন। পারস্য কবি সাদি গাহিয়াছেন,—

"রসনা-সংযম প্রলাপ অপেক্ষা ভাল।
মৌনীই অপার-জ্ঞানী, জ্ঞানীরা বলেন॥"

এই প্রকার মৌনী শাক্যসিংহ, ঈশা, প্লেটো, সক্রেটীস, পল্‌, সেণ্ট ফ্রান্সিস্‌ প্রভৃতির প্রচারের সহিত অন্য সমুদায় প্রচারকমণ্ডলীর বক্তৃতার তুলনাই হয় না। এলোমেলো বহু বাক্যে বুদ্ধির মোহ উৎপন্ন করে। তাই গীতায় নীরব থাকিতে পরামর্শ দিবার জন্যই যেন অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।"

অর্থাৎ "তুমি বিমিশ্র বাক্যের দ্বারা যেন আমার বুদ্ধিকে বিমোহিত করিতেছ।"

যে নীরব কণ্ঠের অপূর্ব্ব তানলয়ের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র তারকাগণ নাচিয়া নাচিয়া সুনীল আকাশে, অনন্তের দিকে চলিতেছে, আমরা কি তাহা সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া জীবনকে অমৃতধারায় সিক্ত করিতে এবং সেই অনন্তের দিকে ধাবিত হইতে পারিব না? সেই অপাণিপাদ দেবতার নিঃশব্দ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ বুঝিয়া চলিতে পারিলে, আমরা মৃত্যুর ভিতর নবজীবন লাভ করি,—মৃত্যুকে ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করি,—অন্ধকার পরিহার পূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে প্রবেশ করি,—অসত্যকে বর্জ্জন এবং সত্যকে লাভ পূর্ব্বক, মৌনী হইয়া আত্মাতে সেই অবাঙ্মনসগোচরের প্রদর্শিত স্বরগ্রাম অভ্যাস করি, এবং তাঁহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া তাঁহারই রাগরাগিণী আলাপ করি।

ক্রমশঃ।

আত্মা ও তাহার অনুশীলন বা সাধন।

আত্মা কি? আমি কি? আমি কে? এই সমুদায় বিষয় সহজেই প্রশ্নের আকারে হৃদয়মধ্যে উত্থিত হয়। ইহার সন্তোষজনক উত্তর কাহারও নিকট পাই না, কেবল অনুচ্চার্য্য, কঠিন শব্দপূর্ণ কতকগুলি শ্লোক শুনিতে পাই। উহার অর্থ মূল শব্দের অর্থ অপেক্ষা দুরূহ। হৃদয়ের বাহিরে ঐ সমুদায় প্রশ্নের শান্তিপ্রদ উত্তর না পাইয়া, আত্মা স্বীয় ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্ধকার ও নির্জ্জনতার মধ্যে বসিয়া ভাবে "আমি কে?" "আমি কি?" "আমার প্রকৃত স্বাস্থ্য, কল্যাণ কিরূপে হইবে?"

আমি দেহী। দেহ আমার। আমি দেহ নহি। দেহ জড়, দেহ মৃত্তিকা, দেহ মরণশীল। দেহ মৃণ্ময় পাত্র, মৃণ্ময় মন্দির। উহা নির্ম্মাতার। আমি গৃহকর্ত্তার অনুমত্যনুসারে এই মৃণ্ময় মন্দিরে বাস করিতেছি! আমার পাট্টার মেয়াদ্‌ শেষ হইলেই আমাকে এ গৃহত্যাগ করিতে হইবে; গৃহ-কর্ত্তা, গৃহস্বামী ইহার দখল লইবেন,—আমার প্রজাস্বত্ব সেই সময়ে লুপ্ত হইবে। এই দেহসম্পত্তির উপর স্থায়ী প্রজাস্বত্ব আমার নাই।

আমি দিব্য ও উজ্জ্বলরূপে দেখিতেছি যে, এই দেহলতাটী মোমের বাতির মত। নানা প্রকার যত্নসংগৃহীত দুর্লভ ও উপভোগ্য বিলাস সামগ্রী দ্বারা এই বর্ত্তিকাটীকে যতই বর্দ্ধিত ও বৃহদায়তন করি না, ইহার গতি ভস্মীভূত হইবার দিকে,—এক দিন শ্মশানের

অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হওয়া বই ইহার আর অন্য শেষ গতি নাই। রাজা মহারাজার দেহ হউক, বা অনাথ নিরাশ্রয়ের দেহ হউক,—সাধু মহাজনের দেহ হউক, বা পাপে মলিন আত্মার বাসস্থান হউক, সকল দেহই ধরণীর ধূলাতে পরিণত হইবে,—সকল মস্তকই মৃত্তিকাতে লুণ্ঠিত হইবে,—সকল দেহই দেহের গতি প্রাপ্ত হইবে,—কীট ও কৃমির ভক্ষ্য হইবে। দেহের মূল্য শূন্য। তুমি ধনী, রাজা, মহারাজা। তুমি সাধু, পণ্ডিত, কবি, সুবক্তা। তুমিও শূন্য। আমিও শূন্য। তবে সংসারের চক্ষে তোমার আয়তন আমার অপেক্ষা শত সহস্র গুণ বৃহত্তর হইতে পারে; কিন্তু ক্ষুদ্র শূন্য ও বৃহৎ শূন্য উভয়ই গণিতের চক্ষে এক,—উভয়েই প্রকৃতির চক্ষে এক,—উভয়েই ভগবানের নিকট এক। জ্ঞানের চক্ষে দেখ, নানা চিত্র বিচিত্র করিলেও, বড় শূন্য যেমন, ছোট শূন্য অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান হয় না,—তেমনি গাড়ি ঘোড়া, লোক জন, রেশম পশম, অট্টালিকা ও প্রস্তরমন্দির, সুবর্ণ ও হীরক, বিদ্যা ও বুদ্ধি, রূপ ও যৌবন সংযুক্ত হইলেও, তোমার ও আমার দেহ একই গতির দিকে ধাবিত।

দেহ নশ্বর। যতই ইহার যত্ন ও সেবা কর, দেহ আত্মার নিত্য সহচর হইতে পারে না। অনেক স্থলেই দেহ আত্মার মিত্রতা না করিয়া শত্রুতা করে। দেহ ও আত্মা বহুকাল একত্রে অবস্থান করে। উভয়ের মধ্যে সখ্য হইবারই কথা। কিন্তু সখ্য না হইয়া, দেহ আত্মাকে জড়ীভূত করে,—মৃত্তিকার ভারে মৃত্তিকার দিকে,—পশুত্বের দিকে টানিয়া আনে। পুরাতন বন্ধু সচ্চরিত্র হইলে যেমন সৎপথে লইয়া যাইবার প্রধান সহায় হয়েন। বন্ধু অসৎ হইলে যেমন স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক বন্ধুকে অসৎ পথে লইয়া যায়, তেমনি দেহ অনেক স্থলে আত্মাকে উর্দ্ধগামী হইতে না দিয়া, অধোগামী করে। বন্ধু দেহের স্নেহের ইঙ্গিত আত্মা অগ্রাহ্য করিতে পারে না,—সে গলায় ধরিয়া টানিলে আত্মা সুখ বিলাসের গৃহে প্রবেশ করে,—হিতাহিত বিবেচনা,—মঙ্গল অমঙ্গলের হিসাব ভুলিয়া যায়,—শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়।

আত্মা দেহী,—সে দেহের মধ্যে বাস করে। কেন বাস করে,—কেন বাহির হইতে পারে না,—কেন দেহের অধীন হয়, ইহা বিশেষ বিবেচ্য বিষয়।

আত্মা আরোহী। দেহ অশ্ব। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই, দেহ দুষ্ট অশ্বের মত। আত্মার অধীন না হইয়া,—আত্মাকে দেহের অধীন করে,—আত্মার প্রদর্শিত সৎপথে না চলিয়া,—অবাধ্য, দুষ্ট প্রকৃতির অশ্বের ন্যায় বিপদের ভিতর, কণ্টকময় ও অমঙ্গলময় গহ্বরের ভিতর আত্মাকে নিক্ষেপ করে।

আত্মা দেহ নহে। জ্ঞান ও প্রেম আত্মার উপভোগ্য বিষয়। জ্ঞান সংগ্রহের শক্তি মন। স্নেহ ও প্রেম প্রভৃতি ভাব সংগ্রহের ইন্দ্রিয় হৃদয়। এবং জ্ঞান ও ভাব যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই পথে চলিবার শক্তির নাম ইচ্ছা। মন, হৃদয় ও ইচ্ছা এই তিন শক্তিযুক্ত আত্মাই "আমি"। দেহের ধ্বংশের সহিত আমার বিনাশ হয় না। মন, হৃদয় ও ইচ্ছাকে অগ্নি নষ্ট করিতে পারে না। দেহরূপ অশ্বের মুখরজ্জু কঠিন রূপে ধরিয়া থাকিতে পারিলে, আত্মা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয়।

দেহ ও আত্মার মধ্যে এক নিত্য সংগ্রাম চলিতেছে। পলোয়ানেরা কুস্তি করিতে করিতে যেমন ক্রমান্বয়ে নীচে ও উপরে হয়, তেমনি দেহও আত্মার টানাটানিতে, কখনও আত্মা দেহের উপরে,—আবার কখন দেহ আত্মার

উপরে হয়। জীবনের এই সংগ্রাম, এই ব্যায়াম, এই কুস্তি ও কশরৎ শিখিবার নানা প্রণালী, নানা দেশে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে, নানা প্রকারে, প্রচারিত আছে। কুস্তি করিতে করিতেই যেমন কুস্তীগীর, রণকুশল হওয়া যায়, তেমনি অধ্যাত্ম অনুশীলন দ্বারা মানব-আত্মা বলবান, কৌশলবান ও রণদক্ষ হয়। "গেড়্‌তে পড়তে হাজার মেহন্নৎমে" পলোয়ান তৈয়ারী হয়। ভূমিতে পড়িলেই পরাজয়ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া, বা পলায়ন দ্বারা পলোয়ান হওয়া যায় না। পুনরায় উঠিয়া লাগিতে হয়, পুনরায় আশায় বুক বাঁধিয়া,—ইচ্ছার বলে কোমর বাঁধিয়া,—জগৎ-গুরুর কৃপায় নির্ভর করিয়া, পুনঃ পুনঃ সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত সিদ্ধহস্ত হইবার,—রণবীর ও রণজিৎ হইবার আর অন্য উপায় নাই।

কি উপায়ে,—কি চিন্তাপ্রণালী, কি সাধন দ্বারা আত্মাকে নীরোগ, বলবান ও রণকুশল করিয়া পতনশীলতা হইতে রক্ষা করা যায়, ইহা সকল আত্মারই পক্ষে বিশেষ গুরুতর ও সুবিবেচনার বিষয়।

আমি বন্দোবস্ত কর্ম্ম জানি। আমি ভূমির পরিমাণ, পর্য্যায়, কর প্রভৃতির বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আবাদী জমি, অনাবাদী, আবাদের অযোগ্য, বনভূমি ও উর্ব্বরা, অনুর্ব্বরা জমি প্রভৃতি লইয়া জীবনের বহু মূল্যবান সময় অনেকটা অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু জীবনরূপ, আত্মারূপ সোণার জমিকে পতিত রাখিয়াছি; মাটীর জমির আবাদ, উন্নতি, জরিপ, জমাবন্দী করিয়া, জীবিকার জন্য অর্থলাভ করিতে যাইয়া, অনর্থ লইয়া গৃহে ফিরিয়াছি। যদি জীবনক্ষেত্রে, জ্ঞানবীজ ও সত্যবীজ রোপণ করিয়া, হৃদয়-কূপ হইতে প্রেম ও ভক্তিবারি সিঞ্চন করিতাম, তাহা হইলে সেই অধ্যাত্ম কৃষির রাশীকৃত ফলে জীবন হিরণ্ময় হইয়া উঠিত। তাই আক্ষেপের সহিত রামপ্রসাদী সুরে হৃদয় সর্ব্বদাই কাঁদিতেছে ও বলিতেছে,—

"মন, তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জমী রইল পতিত,
আবাদ কর্লে ফল্‌তো সোণা।"

আত্মার বন্দোবস্ত চাই। হৃদয় মন যে বে-বন্দোবস্ত রহিয়াছে। মন জীবনক্ষেত্রকে জরীপ করুন। হৃদয় করধার্য্য, জমাবন্দী করুন। ইচ্ছা করসংগ্রহের কার্য্যে নিযুক্ত থাকুন। আত্মা জীবনের রাজা হইয়া, হিরণ্ময় মন্দিরে বসিয়া, এই অধ্যাত্ম বন্দোবস্তের সমুদায় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করুন। এই কার্য্য সূচারু রূপে সম্পাদন করিতে হইলে একটী চিন্তার ও চেষ্টার সুপ্রণালী ধরিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

আত্মা বন্দোবস্ত বিভাগে কার্য্য করিতে বসিয়াই কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে একটা 'বজেট্', বা আয়ব্যয় সম্ভাবনার হিসাব করিয়া লয়, এবং তৎপরে কার্য্যপ্রণালী স্থির পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়; এবং বুদ্ধি বিবেচনা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া, "ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে" বচনানুসারে কার্য্য করে।

চোর যেমন গৃহপ্রবেশানন্তর প্রথমেই গৃহের জ্যোতি নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়, তেমনি কুপ্রবৃত্তিনিচয় প্রথমেই আত্মার জ্যোতি বা বিবেককে মলিন করিয়া, পরে তাহার, ধর্ম্ম হরণ করে। অতএব, সাবধান গৃহস্থের মত এই জ্ঞানবর্ত্তিকাকে জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে; জ্ঞানরূপ আত্মার প্রহরীকে জাগ্রত রাখিতে হইবে; যেন সে নিদ্রিত হইয়া না পড়ে। যদি আত্মা এই জ্ঞানজ্যোতির সাহায্যে দেখিতে পায় যে দশ দিনের সুখ ত্যাগ করিলে দশ মাসের সুখ পাইব, যদি বুঝিতে পারে যে দশ টাকার আয় বৃদ্ধির পথে না চলিলে,

অন্য প্রকারে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন হইবে, এই জ্ঞান ও বুদ্ধি নিশ্চয় ও সংশয় শূন্য হইলে, আত্মা কি লোক্‌সানের পথে, অনর্থের পথে, বিনাশের পথে, চলিতে অভিলাষী হয়? না, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

জ্ঞান একাকী কিছু করিতে পারে না। জ্ঞানজ্যোতি জ্বলিলে, হৃদয় যদি চক্ষু মুদিয়া থাকে, তো সে জ্ঞানের কার্য্য ব্যর্থ হয়। হৃদয়কে মনের সহিত যুক্ত হইতে হইবে, এবং ইচ্ছাকে সঙ্গিনী করিতে হইবে।

এই তিনটী বৃত্তির একীকরণের নামই যোগ। ভগবানের সহিত আত্মার যোগকে যোগ বলা যায় না, কারণ ভগবানের সহিত আত্মার যোগ সংঘটন করা অলীক কল্পনা, বৃথা চেষ্টা। যেখানে বিয়োগ, সেইখানেই যোগ হয়। যেখানে বিয়োগ নাই, সেখানে যোগ হইবে, কি প্রকারে? আমার সপ্তদশ বৎসর হইল বিবাহ লইয়াছে, হয় তো আমার বন্ধুগণ জানেন। অদ্য যদি আমি এই মর্ম্মে নিমন্ত্রণ পত্র বাহির করি যে, "অমুক শুভদিনে এবম্বিধ শুভ মুহূর্ত্তে অতুলানন্দের মাতা ওরফে আমার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে আমার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আপনারা সবান্ধবে অমুক স্থানে উপস্থিত হইয়া, উক্ত শুভানুষ্ঠানে যোগদান পূর্ব্বক বাধিত করিবেন," তাহা হইলে আমার বন্ধুগণ পৃথিবীর গোলত্বের সম্বন্ধে যেমন বিশ্বাসবান, আমার চরণের গোলত্বের সম্বন্ধেও সেইরূপ বিশ্বাসবান হইবেন। যাহা পূর্ব্ব হইতেই আছে, তাহা করিব কি প্রকারে? সে যোগ ত পূর্ব্ব হইতেই সংঘটিত রহিয়াছে। দেহকে যেমন আকাশের ভিতরে প্রবেশ করান যায় না,—প্রবিষ্ট হইয়াই আছে, তৎসম্বন্ধে নূতন কর্ত্তব্য কিছুই নাই,—সেইরূপ দেহের সহিত আকাশের,—জড়ের সহিত আকাশের নিত্য যোগের ন্যায়, সৃষ্টিকাল হইতেই আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যুক্ত, জড়িত ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সে সম্বন্ধ, বিষয়ে বিয়োগের কল্পনা হয় না, অতএব যোগের চেষ্টাও হয় না,—চেষ্টা করা ভ্রম। তবে, আত্মার বিক্ষিপ্ত বৃত্তি সমূহকে যুক্ত করিয়া, জ্যোতির বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জ্যোতিরেখা গুলিকে যুক্ত, একীভূত, সংশ্লিষ্ট, করিয়া,—নিগৃহীত, কেন্দ্রীভূত করিয়া, আত্মার ও ভগবানের চিন্তার দিকে নিক্ষেপ করা, সমকালিক প্রয়োগ করার প্রণালী ও চেষ্টাকেই যোগ বলিতে পারা যায়।

অনেকেই ভাবেন কঠোরতা আচরণ; দেহের নির্যাতন, কম্বলে শয়ন, কঠোর ব্রত ধারণ, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ এবং নানা প্রকার কঠোর ও কষ্টকর ব্যাপার সাধন করিলেই সাধন হয়। আবার অনেকেই মনে করেন, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, যে অনেক পূজা অর্চ্চনা, অনেক প্রার্থনা নামোচ্চারণ, অনেক ব্রত-বার, অনেক তীর্থ দর্শন ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে সাধন উত্তম রূপ হয়। কেহ ভাবেন নির্জ্জনে বা বনে থাকিলে, প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করিলে, নিয়মিত সময়ে মন্দিরে যাইয়া, উত্তম রূপে শ্লোক আবৃত্তি করিলে, বা গ্রন্থাদি পাঠ, দান ধ্যান, সাধুসঙ্গ বা নিয়মিত জীবন করিলে সাধনে অগ্রসর হওয়া গেল। এতাবৎ সমুদায় বাহ্য কার্য্য, বাহ্য উপায় মাত্র। জীবন এত অল্প দিন স্থায়ী যে এই সমুদায় ব্রতাদি সমাধা করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না। উহা দ্বারা হৃদয়ের গতি, প্রবৃত্তি অনেক স্থলে মুক্তির বিরুদ্ধ দিকে গিয়াছে, যোগের মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানব নিতান্ত ভ্রান্ত পথে পরিভ্রমণ করিয়াছে। এই ভ্রমে পড়িয়া অনেকে যোগের বিভূতি লইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, মনে মনে ভাবিয়াছেন ঈশ্বর দর্শন

লাভ করিলাম, মুক্তি পাইলাম। কখনও বা সংসার ও ইন্দ্রিয়সুখ ভুলিয়া,ভাবুকতায় মুগ্ধ হইয়া, বা ধ্যান-সুখ অনুভব করিয়া মনে করা গিয়াছে যে এইবার পরমাত্মাকে ধরিয়াছি। ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিলেই দেখি হস্ত হইতে সে সকল কল্পিত সুখ, সাধন, সিদ্ধি স্বপ্নলব্ধ রাজ্যবৎ চলিয়া গিয়াছে, আর নাই। আমরা পূর্ব্বে যে স্থানে ছিলাম, এখনও প্রকৃত পক্ষে সেই স্থানে বা তাহারও নীচে রহিয়াছি।

এইপ্রকার অবস্থার জীবন পর্য্যবেক্ষণ ও কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিলেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে সিদ্ধি, যোগ বা মুক্তি হইতে আমরা অতি দূরে। এই প্রকার কল্পিত যোগ বা সাধনের অবস্থাতেও আমরা অন্যের অপেক্ষা নিজেকে বড় জ্ঞান করি, অন্যের উপর স্থাপিত না হইলে দুঃখিত হই, অন্যের মত ও ইচ্ছার উপর আমাদের মতও ইচ্ছা জয়যুক্ত না হইলে ক্ষুব্ধ হই, এবং নিজের ত্রুটী নাশ হইয়াছে, মনে মনে অজ্ঞাত ভাবে এই প্রকার ধারণা করিয়া, আমরা সংসারের ও অন্যের দোষ, ত্রুটি ও কথাবার্ত্তার তীব্র সমালোচনা করি। এই প্রকার অবস্থায় "আমি সাধক, আমি যোগী বা আমি সিদ্ধ ব্যক্তি" ইত্যাদি জ্ঞানজনিত অহঙ্কারের উপর অন্যের হাত পড়িলেই, নিদ্রিত ভুজঙ্গের ন্যায় আমাদের হৃদয়ের অহঙ্কার জাগিয়া উঠে, সাধনে ব্যাঘাত হয়,—সংসারকে বিষবৃক্ষময়, বাসের অনুপযোগী, বন বলিয়া মনে হয়, এবং আমাদিগকে যে ভক্তি না করে, না গ্রাহ্য করে, না মানে, বা তীব্র প্রতিবাদ করে, তাহাকে নরকের যাত্রী রূপে স্থির করি; নচেৎ তাহার জন্য সেই অন্ধকারময় অধোরাজ্যে একটি স্থায়ী স্থান মনে মনে চিরনির্দ্দেশ করিয়া দি।

এই প্রকার মোহের ঘোর ভাঙ্গিবার জন্য, সিদ্ধি, যোগ ও মুক্তির পথে আনিবার জন্য, ভগবান যদি রোগ শোক নির্য্যাতন প্রভৃতি ভক্তির পরীক্ষা স্বরূপ কোন বিপদ প্রেরণ করেন তো কল্পিত আধ্যাত্মিকতার মূল দমিয়া যায়, শূন্যে নির্ম্মিত গৃহ ধূলির উপর পড়িয়া যায়, ভগবানের মঙ্গলবিধানে অবিশ্বাস জন্মে, তাঁহাকে আর তত বিশ্বাস করা যায় না। তখন আমরা বিনয়-নম্র ভাবে ভগবৎ-প্রেরিত দুঃখের কণ্টকলতাকে ঈশার ন্যায় শিরোভূষণ করিতে, চৈতন্যের ন্যায় কানু পরশমণিহার করিতে পারি না,—যোগী ও ভক্তের ন্যায় তাহাকে মুক্তির সহায় জ্ঞান করিতে পারি না। যে দুঃখ, শোক ও বিপদ আমাদের আত্মাকে বাহিরের সুখসম্পদ হইতে টানিয়া ভিতরের দিকে প্রেরণ করে, তাহাই কি যোগের সহায়, উপায় ও আদরের জিনিষ নহে?

পাপী সহজে ভগবানের সহিত যোগে মিলিত হইতে পারেন, কিন্তু কল্পিত সাধনের বশে থাকিয়া, নিজেকে উন্নত সাধু জ্ঞান করিলে, "আমি মন্দ লোক নহি" বা "অন্য সাধারণের অপেক্ষা আমি উন্নত" এই প্রকার জ্ঞান থাকিলে, আমরা নিজেই অন্তশ্চক্ষের পর্দ্দা রচনা করি, ও এই এক প্রকার "ছানি" উৎপন্ন করি।

প্রকৃত যোগের উপায় কি? জ্ঞান ও পিপাসা। সৎ কি? অসৎ কি? শ্রেয় কি? প্রেয় কি? আমি কি? ভগবান কি? আমি কেমন মন্দ? তিনি কেমন মঙ্গলময়? ইত্যাদি উজ্জ্বল ভাবে না বুঝিলে যোগ-রাজ্যে প্রবেশ হয় না, আত্মার অনুশীলন বা সাধন হয় না। নিজের জঘন্যতা দেখিয়া, ভগবানের মঙ্গল ভাব অনুভব করিয়া, নিজেকে তাঁহার অধীনস্থ করিতে হইবে, তাঁহার চরণাশ্রিত করিতে হইবে, তাঁহার ইচ্ছায় সমুদায় ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, প্রাণ মন তাঁর চরণে সঁপিয়া দিতে

হইবে, তবে দেবদুর্ল্লভ যোগ লাভ করা যাইবে। জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ঠা ও প্রেমসাধন করাই প্রকৃত যোগানুষ্ঠান। এই সমুদায় উপকরণ না থাকিলে "দুঃখহা" যোগ হয় না।

জ্ঞান বিবেক ও বিচারের পথ অবলম্বন করা শ্রেষ্ঠ যোগমার্গে উপনীত হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। যোগ আত্মসংগ্রাম, কারণ দেহ ও কুপ্রবৃত্তিনিচয় আমাদিগকে কেশ ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। সেই আকর্ষণের হাত ছাড়াইয়া উঠিতে পারিলে যোগ সম্ভব হয়। আত্ম-সংগ্রামে জয়ী হওয়া, সেনাপতি ও শত যুদ্ধে জয়যুক্ত বীর হওয়া অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয়।

ক্রমে ক্রমে আমরা সময় পাইলে ইহার উপায় অনুসন্ধান করিব এবং নিত্যানিত্য, সদসৎ বিচার করিব, ভাল মন্দের হিসাব নিকাশ লইব এবং যদি পারি এই পথে চলিতে চেষ্টা করিব।

অনন্ত যোগ।

দৃষ্টি করি যেই গ্রহ তারকার প্রতি,
মনে হয় শূন্যে তাঁর হইছে আরতি ;—
স্বর্গীয় সে আরতির অনাহত শব্দ
যেন শুনিবারে পাই নিশীথে নিস্তব্ধ !—
করিতে করিতে সেই শব্দ উপভোগ
অন্তরে জাগিয়া উঠে অন্তহীন যোগ ;—
সে যোগের অন্ত নাই। হে অপাপবিদ্ধ
অনন্ত এ যোগে তুমি কর মোরে সিদ্ধ।

তাঁর দর্শন ভিখারী।

কত গিরি নদী সিন্ধু বন উপবন
দেখিয়াছি, কত স্থানে ক'রেছি ভ্রমণ
কত রূপে, সহি' রৌদ্র ঝটিকা পবন,
কিছুতেই তৃপ্তি তবু মানে না এ মন।—
মনে হয়, গিয়ে আমি দূর দুরান্তরে
প্রকৃতির নানা দৃশ্য দেখিয়াছি বটে,
কিন্তু হায় না দেখিনু যিনি প্রাণ অন্তরে
আত্মার প্রাণ, নিকট হইতে নিকটে !—
পরাণে পাইলে যাঁর প্রসাদকণিকা
ঘুচে যায় দুঃখ শোক দর্প অভিমান,
উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যায় মোহযবনিকা।
প্রভো ! দেখা দাও মোরে কর কৃপাদান।

রাজনীতি সংগ্রহ।

রাজাই রক্ষার হেতু। যদি রাজার নেতৃত্ব না থাকে তাহা হইলে লোকের অবস্থা সমুদ্রে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় অতি শোচনীয় হয়। ধর্ম্মশীল ও পালনপর রাজাকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান করিবে। তিনি প্রজাকে রক্ষা করেন এবং প্রজাও ধনধান্যাদি দ্বারা তাঁহাকে বর্দ্ধিত করিয়াথাকে; কিন্তু এই বর্দ্ধন অপেক্ষা রক্ষণই শ্রেষ্ঠ, কারণ রক্ষার অভাবে সমস্তই ছারখার হইয়া যায়। ন্যায়পর রাজা প্রজাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনেরই মূল। অতএব তাঁহার সর্ব্বাগ্রে ন্যায় রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। রাজা যবন ন্যায়-বলেই বহুকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন এবং নহুষ অধর্ম্ম-প্রভাবেই রসাতলগামী হন। সুতরাং রাজা ন্যায় ও ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থের জন্য যত্নবান হইবেন। ধর্ম্মেই রাজ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার স্বাদু ফল শ্রী সম্পদ। স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, সৈন্য ও সুহৃৎ এই সপ্তাঙ্গই রাজ্য। বল ও বুদ্ধির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। রাজা এই বল-বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক উত্থানবান হইয়া এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য

লাভের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। ন্যায়ানুসারে অর্থোপার্জ্জন, তাহার রক্ষণ, বর্দ্ধন ও সৎপাত্রে দান রাজকার্য্য এই চার প্রকার। নীতি ও বল আশ্রয় করিয়া অর্থচিন্তা করিবে। বিনয় নীতির মূল। আবার শাস্ত্র- নিশ্চয়ই বিনয়। এই বিনয়েই ইন্দ্রিয়-জয় প্রতিষ্ঠিত। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হয় এবং তাহারই শাস্ত্রার্থসকল প্রসন্ন হইয়া থাকে। বিনয়, প্রজ্ঞা, ধৃতি, দক্ষতা, উৎসাহ, বাগ্মিতা, দৃঢ়তা, আপদ ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা, প্রভাব, মৈত্রী, ত্যাগ, সত্য, কৃতজ্ঞতা, কুল, শীল, ও বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ এই সমস্ত গুণ সম্পদের মূল। অতএব রাজা প্রথমে আপনাকে পরে অমাত্য, ভৃত্য, পুত্র ও প্রজাদিগকে বিনয়ী করিবেন। যিনি প্রজাপালক এবং প্রজারা যাঁহার একান্ত অনুরক্ত, যিনি বিনয়ী সেই রাজা শ্রীসম্পদ ভোগ করেন। এই ইন্দ্রিয়রূপ করী বিষয়রূপ-অরণ্যচারী ও একান্ত প্রমাথী। জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা ইহাকে বশীভূত করিবে। কোনরূপ বিষয়লাভের জন্য আত্মা মনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আত্মা ও মনের সংযোগ নিবন্ধন প্রবৃত্তি জন্মে। পরে বিষয়-লাভ-লোভে মন ইন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে। অতএব প্রযত্নসহকারে মনকে নিরোধ করিবে। মনের নিগ্রহেই ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হয়। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু ইত্যাদি লইয়া সর্ব্বসমেত দশটী ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শাদি উহাদের বিষয়। আত্মা ও মন অন্তঃকরণ। এই দুইটী প্রযত্নবান হইলে সংকল্প জন্মে। আত্মা ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বহিস্করণ। সংকল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা ইহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব প্রবৃত্তি নিরোধ দ্বারা মনকে বশীভূত করিবে। নীতিজ্ঞ রাজা এই উপায়ে আপনাকে সংযত করিয়া আত্মহিতে নিযুক্ত থাকিবেন। যিনি এই একমাত্র মনকেই জয় করিতে অসমর্থ তিনি কি প্রকারে এই সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিবেন। যিনি অকার্য্যে আসক্ত, যাঁহার চক্ষু বিষয়ান্ধ সেই রাজা স্বয়ংই ভীষণ আপদকে আহ্বান করিয়া থাকেন।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটীর এক একটীই মহাবিনাশ সাধনে সম্যক সমর্থ। ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শষ্পাঙ্কুরাহারী দূরসঞ্চরণশীল হরিণ গীতি-লোভে ব্যাধহস্তে বিনষ্ট হয়। যে হস্তী গিরিশৃঙ্গাকার, যে অবলীলাক্রমে বৃক্ষ সকল উন্মূলিত করিয়া থাকে সে করিণীর স্পর্শ-মোহে সহজেই বদ্ধ হইয়া থাকে। পতঙ্গ দীপশিখায় আকৃষ্ট-চক্ষু হইয়া সহসা তাহাতে পড়িয়া মৃত্যুলাভ করে। অগাধ-জলচারী মৎস্য মরিবার জন্যই আমিষ-খণ্ডের সহিত বড়িশ গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। গন্ধলুব্ধ ভৃঙ্গ আসব-পিপাসায় হস্তীর গণ্ডে নিপতিত হইয়া পঞ্চত্ব পায়। এই বিষতুল্য বিষয় এক একটীই যখন মৃত্যুর কারণ তখন যে এককালে এই পাঁচটীরই সেবা করে, জানি না, সে কিপ্রকারে কুশলে থাকিবে! অতএব জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আসক্ত না হইয়া যথাকালে বিষয়সেবা করিবেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীমুখ দর্শনে নিতান্ত লোলুপ যৌবনের সহিত শ্রী তাহাকে অচিরাৎ কাঁদাইয়া চলিয়া যায়। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম এবং কাম হইতে সুখ; যে ব্যক্তি যুক্তি সহকারে ইহাদের সেবা না করে সে অগ্রে ঐ গুলিকে নষ্ট করিয়া পরে নিজেও মরে। স্ত্রী এই নামটাই মনে বিকার সঞ্চার করিয়া দেয়, ভ্রূ-বিলাসচতুরা স্ত্রীর দর্শন তো দূরের কথা। তাহার মৃদু ও গদগদ বাক্যে কাহার না মন আর্দ্র হয়। সে মুনির মনেও অনুরাগ সঞ্চার করিতে পারে। যেমন

জল-ধারায় অচলও প্রচ্যুত হয় সেই রূপ স্ত্রীসংস্পর্শে মহানেরও মন ভেদ হইয়া যায়।

মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া ও পান এই তিনটী রাজার সর্ব্বনাশের মূল। রাজা পাণ্ডু, নৈষধ ও যদুবংশীয়দিগের ইহা হইতেই যে বিপদ ঘটিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, অভিমান ও গর্ব্ব ইহা ষড়্‌বর্গ। রাজা যত্নসহকারে ইহা ত্যাগ করিবেন। এই ষড়্‌বর্গ-জয়েই সুখ প্রতিষ্ঠিত। রাজা দণ্ডক কাম হইতে, জনমেজয় ক্রোধ হইতে, রাজর্ষি ঐল লোভ হইতে, অসুর বাতাপি হর্ষ হইতে, রাক্ষস রাবণ অভিমান হইতে এবং অগস্ত্য দম্ভ হইতে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরু-সংযোগ শাস্ত্রের জন্য এবং শাস্ত্র বিনয় বৃদ্ধির জন্য। যে রাজা বিদ্যাবিনীত তিনি মহা কষ্টেও অবসন্ন হন না। যিনি জ্ঞান-বৃদ্ধসেবী তিনিই সাধুসম্মত হইয়া থাকেন এবং অসৎ লোকের প্রবর্ত্তনায় কদাচ অ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। যিনি জিতেন্দ্রিয় ও নীতিপথানুসারী তাঁহার শ্রী সম্পদ উজ্জ্বল এবং কীর্ত্তি নভঃস্পর্শী হইয়া থাকে। এই রূপে যে রাজা রাজ্যপদ আশ্রয় করিয়া বি-নয়ী ও নীতিমান হন তিনি রত্নগিরি সুমেরুর উন্নত শৃঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল শ্রী অধিকার করেন। এই লোকাতিবর্ত্তী পার্থিবতা স্বভাবই উন্নত, ইহাকে বলপূর্ব্বক বিনয়ে নিয়োগ করিবে। বলিতে কি, নয়দর্শিতায় বিনয়ও সহজলভ্য হইয়া থাকে। যিনি বিনীত তিনি অন্যের সেবাপাত্র হন। বিনয়ই রাজগণের উৎকৃষ্ট ভূষণ। বিদ্যালাভের জন্যই গুরুসেবা, লব্ধ বিদ্যাও আবার সৎবুদ্ধির জন্য। যাঁহার বুদ্ধি বিদ্যানুগামিনী নিশ্চয়ই তাঁহার শ্রীলাভ হয়। অতএব সতত অনু-বৃত্তিপর হইয়া সুনিপুণ রূপে সদ্‌গুরুর সেবা করিবে। বিদ্যাবিনীত হইলেই রাজপদ রক্ষার উপযুক্ত হইয়া থাকে। যিনি অবি-নয়ী, শত্রু সহজেই তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে কিন্তু বিদ্যাবিনীতের পরাভব সুদূর-পরাহত।

সংবাদ।

বিগত ৩০ ভাদ্র তারিখে পুণ্যশ্লোক, প্রজাপালক ও আশ্রিতবৎসল, পরম পূজ্য-পাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবের কটক জেলার অন্তঃ-পাতি তালুক পাণ্ডুয়ার শুভ পুণ্যাহ উপ-লক্ষে তথায় ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে কাছারী বাটী নানা প্রকার পল্লবে ও ফল ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল। স্থানীয় বাদ্যকরগণ তাহাদের বাদ্য যন্ত্র লইয়া, উল্লাসের সহিত বাজাইয়া ছিল। দেশীয় মল্লগণকে উৎসাহ দিবার জন্য অপরাহ্নে লাঠি ও তরবারি ক্রীড়া হইয়া-ছিল। প্রজারঞ্জনের জন্য দুই রাত্রি যাত্রা হইয়াছিল। সমাগত বালক বালিকাগণকে জলপান বিতরণ করা হইয়াছিল, এবং অভ্যা-গত কাঙ্গালীগণকে ভোজন করান হইয়া-য়াছিল। এই উপলক্ষে তথায় ব্রহ্মোপাসনা হইয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল সম-য়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, আশ্বিন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৭৭৮ ৻৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬২৮। ৩
সমষ্টি	...	১৪০৬। ৯
ব্যয়	...	৮৫৯।৶৯
স্থিত	...	৫৪৬৸০

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৪৬৸০
৫৪৬৸০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪১০॥৶৩

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৩০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
১০৲
" " প্যারিমোহন রায়
১০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সিং
৪০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৲
" পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব
৫৲
দানাধারে প্রাপ্ত ... ১॥৶৩
৪১০॥৶৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৮৸০
যন্ত্রালয়	...	৩০৮॥৶৩
সমষ্টি		৭৭৮ ৻৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৬১১৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৪৸৩
পুস্তকালয়	...	।৴০
যন্ত্রালয়	...	১১৬৶৯
সমষ্টি		৮৫৯।৶৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩।

৭০৩ সংখ্যা ১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ১ পৌষ মঙ্গলবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা;
ডাক মাশুল।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কালনা সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।

ধীর ব্যক্তিরা অমৃতত্বকে জানিয়া অধ্রুব পদার্থের মধ্যে ধ্রুব পদার্থের অন্বেষণ করেন না। মরীচিকাতে জলের অন্বেষণ যেমন বৃথা, সূর্য্যের প্রখর কিরণের মধ্যে শীতল ছায়ার অন্বেষণ যেমন বৃথা, অধ্রুব পদার্থের মধ্যে ধ্রুব পদার্থের অন্বেষণ তদ্রূপই বৃথা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় যাহা কিছু তাহাই অধ্রুব—পরিণামবিশিষ্ট। এই অধ্রুব পদার্থের অন্যতর যাহা, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত—স্বপ্রকাশ, তিনিই সেই ধ্রুব পদার্থ মনুষ্যের চরমগতি, পরমাশ্রয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই উপলব্ধ হয়। যদি তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কোন পদার্থ হইতেন তবে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহাকে লাভ করা যাইত। কিন্তু যখন তাহা হয় না, অথচ সমস্ত চরাচর এবং সকল দেব মনুষ্যের অন্তস্তল ভেদ করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা, একটা পিপাসা উত্থিত হইতেছে, তখন অবশ্যই ইন্দ্রিয়াতীত এমন কোন পদার্থ আছে, যাহা দ্বারা আমরা সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরম পদার্থকে লাভ করিতে পারি। সে পদার্থ কি? যাহা দ্বারা আমরা অতীন্দ্রিয় পরম বস্তুকে দেখিতে পাই এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করি, তাহা আমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু। এই প্রজ্ঞাচক্ষু উদ্ঘাটিত হইলে মনুষ্য নিরাকার জ্ঞানস্বরূপকে দেখিতে পান। এই প্রজ্ঞাচক্ষু উদ্ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়া কত অল্পবুদ্ধি কুসংস্কারাপন্ন বর্ব্বরজাতির মধ্যেও মহাপুরুষগণ এক পরব্রহ্মের নাম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। ইরাণের যোগীবৃন্দ এবং আর্য্যাবর্ত্তের ঋষিবৃন্দ এই প্রজ্ঞাচক্ষুর বলেই সেই সত্যের পরমনিধান পরমেশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই প্রজ্ঞাচক্ষু উদ্ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়া তেজস্বী বামদেব ঋষি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন,

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণস্তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

আমি এই অন্ধকারের পরপারে থাকিয়াই সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে

জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। মৃত্যুর পর পারে যাইবার আর অন্য পন্থা নাই।

"স এতেন প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্তামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ।"

তিনি এই জ্ঞানময় আত্মজ্যোতি দ্বারা ইহলোক হইতে উৎক্রমণ করিয়া সেই স্বর্গলোকে সমুদায় কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অমর হইয়াছিলেন। ইহাঁকে জানিয়া ইহাঁর উপাসনা করিলে মনুষ্যের সকল কামনা চরিতার্থ হয়। ইনি সকল মঙ্গলের আবহ, সকল সুখের নিদান। যেখানে সূর্য্য ও চন্দ্র পুণ্য-কিরণ দ্বারা পবিত্র করেন সেই লোক সকল ইহাঁ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁর দ্বারা সকল দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁ হইতে সমুদ্র, পর্ব্বত এবং সর্ব্বপ্রকার নদী প্রবাহিত হইতেছে।

এতদ্যোবেদ নিহিতং গুহায়াং সোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।"

হে সোম্য, যিনি এই পুরুষকে হৃদয়ে নিহিত বলিয়া জানেন তিনি এখানে থাকিয়াই অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করেন।

যুগে যুগে, দেশে দেশে কত মহাপুরুষ ও ধর্ম্মপ্রাণ মহিলা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল সেই এক মাত্র পরব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে,

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।"

যিনি অনিত্য পদার্থের মধ্যে নিত্য এবং চেতনদিগের মধ্যে চেতন, যিনি সকলের কামনা সকল বিধান করেন, তাঁহাকে যাঁহারা স্বীয় আত্মাতে দর্শন করেন তাঁহাদেরই ধ্রুব শান্তি হয়, অন্যের হয় না। অন্ন বস্ত্র, ইন্ধনের অভাবে অথবা অন্ন, বস্ত্র, ইন্ধনের প্রাচুর্য্যের অভাবে দুঃখভারে অবনত হইয়া আমরা চক্ষে অন্ধকার দেখি। যদি অন্ন, বস্ত্র, ইন্ধন প্রচুর হয়, যদি হস্তী, হিরণ্য অট্টালিকা আমার সম্পদ হয় আমরা তবে উন্মত্ত অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখি। বিষয়লাভে দুঃখ, বিষয়ের অবসানেও দুঃখ। কিন্তু সাধু ভক্ত মহাপুরুষেরা তো কখন এরূপ দুঃখ দুর্গতি ভোগ করেন না—তাঁহাদের মনে কোন অবস্থাতেই দুঃখ শোক উপস্থিত হয় না। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা অধ্রুব পদার্থে ধ্রুব সুখ শান্তির অন্বেষণ করেন না। ভগবৎকৃপায়, সাধন-পুণ্যে প্রজ্ঞা-চক্ষু-বিশিষ্ট তাঁহারা পুত্রৈষণা হইতে, বিত্তৈষণা হইতে এবং লোকৈষণা হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এষণামুক্ত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত মহাপুরুষদিগের কথা স্মরণ করিলে শুক্ল যজুর্ব্বেদের রচয়িতা মিথিলাধিপতি জনক রাজার পুরোহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে এবং তাঁহার পত্নী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকেই প্রথমেই মনে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য যেমন জ্ঞানী তেমনিই ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই যে, তিনি একদা জনক রাজার বহু-দক্ষিণ নাম যজ্ঞে, এক এক শৃঙ্গে দশ দশ পাদ সুবর্ণ মণ্ডিত এক সহস্র গরু এবং আর এক দিন জনক রাজার প্রতি ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াতে জনক রাজার নিকট হইতে বিদেহ রাজ্য দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জনক রাজার মুখের কথা এই—

"সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি।"

আমি মহাশয়কে আমার বিদেহ রাজ্য প্রদান করিলাম এবং নিজেকেও মহাশয়ের দাসত্বে অর্পণ করিলাম। এখন ভাবিয়া

দেখুন যাজ্ঞবল্ক্য কিরূপ সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন।

এ হেন যাজ্ঞবল্ক্য এক দিন হঠাৎ তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,

"উদ্যাস্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি।"

অরে মৈত্রেয়ি! এখন আমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে চলিলাম। তুমি কাত্যায়নীর সহিত এই বিষয় সকল বিভাগ করিয়া উপভোগ কর। কিন্তু মৈত্রেয়ীও অধ্রুব পদার্থের মধ্যে ধ্রুব পদার্থের অন্বেষণকারিণী নহেন। তিনি বলিলেন, স্বামিন্, যদি এই সমুদায় পৃথিবী আমার বিত্ত হয়, তাহাতে কি আমি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—নারে, না। তাহা পারিবে না। বিষয়ী লোকে যে ভাবে জীবন ধারণ করেন তুমিও সেইরূপ করিবে। বিষয় ভোগে অমৃতের আশা নাই। অতঃপর যাহাতে মনুষ্য অমর হইতে পারে এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য চির দিনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহা তো গেল ঋষি-যুগের কথা। বর্ত্তমান যুগেও কত কত ধর্ম্মপ্রাণ নিষ্কাম মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে আদর্শ জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। সংসারের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া উদাসী নানক ভ্রমণ করিতে করিতে যখন মুসলমান রাজধানী দিল্লি নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সেখানকার সম্রাট ছিলেন বহরম খাঁ লোদী। লোদির এক জন ক্ষত্রিয় রাজকর্ম্মচারী নানকের হিন্দু রীতিবহির্ভূত কার্য্য দেখিয়া ঘৃণা ও হিংসাবশতঃ সম্রাটের নিকট তাঁহার নানা প্রকার কুৎসা করিয়া তাঁহাকে বন্দী করাইয়া দেন। নানক যোগধর্ম্মশ্রী সহকারে আনন্দমনে বন্দীদিগের সহিত কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন! কারাধ্যক্ষ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী নানকের অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাহা সম্রাটের নিকটে নিবেদন করিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট নানকের কারামুক্তির আদেশ দিলেন। নানক কারামুক্ত হইয়া দিল্লি সহরেই কিছু কাল বাস করিয়া তথাকার অধিবাসী ও কারাবাসীদিগের নিকটে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বহরম খাঁ লোদির মৃত্যুতে বাবর সম্রাট দিল্লির সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইহার রাজ্য লাভের প্রারম্ভে অত্যন্ত অনিয়ম ও প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল। সেই অত্যাচারফলে নানক পুনরায় কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ধার্ম্মিকের আশ্রয় ও শান্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর। সাধুর বন্ধু সজ্জন সকল। পুনরায় সেই কারারক্ষক নূতন সম্রাটের নিকটে এই উদাসী মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন করিলেন। বাবর সম্ভ্রমের সহিত নানককে তাঁহার সমীপস্থ করিতে আদেশ দিলেন। নানক সম্রাটের সমীপস্থ হইলে সম্রাট অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানক মান সম্ভ্রম যশের পিপাসু নহেন—তিনি সম্রাটকে বলিলেন, "প্রশংসনীয় এক পরমেশ্বর, তিনি অনন্ত। কত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সাধু পুরুষ তাঁহার অন্ত না পাইয়া তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।" সম্রাট স্তব্ধ হইলেন। নানক নিশ্চিন্ত মনে কেবল একমাত্র ঈশ্বরেরই প্রশংসা করিতে সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সাধু, তুমি কাহার শিষ্য, তোমার গুরু কে?" নানক বলিলেন, এক নিরাকার পরমেশ্বরই আমার সদ্গুরু। আমি যাহা কিছু শিক্ষা করি তাঁহারই নিকটে শিক্ষা করি। তাঁহার নিঃশব্দবাণী

যোগে যে সকল পরম সত্য আমার হৃদয়ে উপস্থিত হয় তাহা পালন করিয়া জীবনকে পবিত্র করি। "গুরা ইক দে বুঝাই সভনা জীয়াকা ইক দাতা সো মৈ বিসরি ন জাই।" গুরু আমাকে এই এক শিক্ষা দিয়াছেন যে, "সকল জীবের একই দাতা" আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই। সম্রাট বলিলেন, হে নানক, তুমি কিছু অর্থ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু নানক যে একমাত্র সেই প্রেমময় পরমেশ্বরেরই প্রেম-মুখ দর্শনের জন্য পাগল, তাঁহারই জন্য সংসারত্যাগী উদাসী—তিনি যে, কর্ম্মত্যাগী আশ্রমত্যাগী যোগী,—তিনি যে কর্ম্মীর প্রতি শ্লেষ করিয়াই বলিয়াছেন—"কর্ম্মী আবে কাপড়া নদরী মোখ্-দুয়ার।" কর্ম্মীর জন্য কাপড়ই আগমন করে আর নজরী অর্থাৎ আত্মদর্শীর জন্য মোক্ষদ্বার খোলা। বলিলেন হে সম্রাট, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিশ্বপতি পরমেশ্বরের অর্থে পূর্ণ রহিয়াছে, আমি তাঁহার পুত্র, তাঁহাতে সকলি সমর্পণ করিয়া সেই সমস্ত অর্থের উত্তরাধিকারী হইয়াছি। সকলেই সেই অর্থ সম্ভোগ করিতেছে, আমার আর অন্য অর্থের প্রয়োজন নাই। নানক দ্বিতীয় বার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বীয় শিষ্য বালাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ বালা, প্রভুর রঙ্গ তামাসা, আমি সে দিন এই কারাগার হইতে যাইতে না যাইতেই তিনি আবার আমাকে এখানে আনিলেন।" নানক ইহা বলিবেন না কেন? তাঁহার যে নগর, অরণ্য, গৃহ ও ও কারাগার সমান—মৃত্তিকাময়, সকল বৈচিত্রেই তিনি যে একই ভাব পরিলক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি সেই সর্ব্বব্যাপী সুখ-স্বরূপেই সুখান্বেষণ করিতেছেন, তিনি কেন অধ্রুব অন্ন বস্ত্রের মধ্যে সুখের অন্বেষণ করিবেন।

আরবের সেই ধর্ম্মোন্মত্ত মোহম্মদ যখন জ্ঞাতিবর্গের ভয়ে ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীর মধ্যে অনুগত শিষ্য আবুবেকরের সঙ্গে পলায়ন কালে গারসুর নামক সঙ্কীর্ণ গিরিগহ্বরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন প্রস্তরের আঘাতে তাঁহার ক্ষতবিক্ষত চরণতল হইতে শোণিতস্রাব হইতেছিল। আবুবেকর প্রথমেই মোহম্মদকে গিরিগহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, বলিলেন, "আপনি এই স্থানে অপেক্ষা করুন। প্রথমতঃ আমি এই গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া তাহার অবস্থা অবগত হই। রজনী তমসাচ্ছন্ন, গহ্বর সর্পাদি জন্তুশূন্য না হইতে পারে। অগ্রে আমি তাহাকে অশ্রুজলে ধৌত এবং নেত্র-রোমে পরিষ্কৃত করি।" আহা কি দুঃখ! একদা মোহম্মদ ঈশ্বরের উপাসনান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছিলেন, তাঁহার শত্রুগণ এমন সময়ে নিহত উষ্ট্রের শোণিতলিপ্ত অস্ত্র সকল তাঁহার পৃষ্ঠে প্রক্ষেপ করিয়া অট্টহাস্য করিয়াছিল। অন্য সময়ে তাহারা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া তাঁহার কন্যা ফাতেমাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মোহম্মদ বলিলেন, কল্যাণি, চিন্তা করিও না, কাহার সাধ্য আমাকে বধ করে, হস্ত পদ প্রক্ষালনের জল আনয়ন কর, আমি উপাসনা করিব। বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে আমি আচ্ছাদিত, প্রার্থনারূপ অস্ত্র আমার হস্তে, ভয় কাহাকে করি! মোহম্মদ এবম্বিধ শত শত দুঃখে পতিত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত বা নিরুদ্যম হন নাই। যেহেতুক তাঁহার ক্ষুধা সেই ঈশ্বরে, তাঁহার সুখ, শান্তি, পিপাসা সেই মহান্ আনন্দ স্বরূপে। মৃত্যুর পর পারে অমরধামে উপবেশন করিয়া তিনি যে আনন্দ উপভোগ করিবেন তাহার

জন্য বজ্রাঘাত বা মৃত্যুভয় তাঁহার নিকটে কি তুচ্ছ! তিনি তো অন্ন, বস্ত্র বা মান-সম্ভ্রমের মধ্যে ধ্রুব সুখের অন্বেষণ করেন নাই।

"অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।"

মহারাষ্ট্র দেশে তুকারাম নামে এক পরম ভক্ত বৈরাগী ছিলেন। তিনি আপনার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পদ, সম্ভ্রম সকলই নিজের অভীষ্ট দেবে সমর্পণ করিয়া এবং সাংসারিক অশেষ দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এ দেশে চৈতন্যদেবের আসন যত উচ্চে, সে দেশে তুকারাম তত উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়দমন, হরিসঙ্কীর্ত্তন এবং কামনা বিসর্জ্জন রূপ ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নাত হইয়া পবিত্র কলেবরে ধ্রুব সুখ সন্নিধানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শত পরীক্ষার মধ্যে একটি পরীক্ষা এই যে একদা কোন অসচ্চরিত্রা নারী কোন নিভৃত স্থানে তাঁহার নিকট পাপ প্রস্তাব উত্থাপন করে। তদুত্তরে তিনি সেই নারীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ এই—

"এই যে আমার বপু শুষ্ক তরুপ্রায়
তপঃক্লেশে শিলাসম হয়েছে কঠিন
বিনতি তোমায় করি হরি দয়াময়
করো না ইহার সহ নারীর মিলন।
এ মিলন হলে দেব, ভুলিব তোমায়
ভজন সাধনে তব না যাইবে মন,
প্রমত্ত বারণ সম হইবে মানস
অসাধ্য সাধন হবে তাহার দমন।

* * * *

পরনারী জ্ঞান করি রুক্মিণীর প্রায়,
অন্যথা হবে না ইহা করিয়াছি পণ।
তাই বলি জননি গো, কেন ক্লেশ পাও;
বিষ্ণুর সেবকগণ ব্যভিচারী নয়।

পঞ্চবিংশতি শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র বোধিসত্ত্ব যখন ধর্ম্মের জন্য বনে বনে তপস্যা এবং নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিলেন, যখন তাঁহার উদরে অন্ন নাই, দুঃখভারাক্রান্ত শরীরে মাংস নাই, চক্ষু, কর্ণ এবং বাক্যে শক্তি নাই; তৃণ শয্যা এবং বৃক্ষতল গৃহ, তাঁহার তখনকার ক্লেশ তোমার আমার পক্ষে কি দুর্বিসহ। কিন্তু বুদ্ধদেব নিষ্কাম—নির্ভীক। তিনি আপনার চির শান্তির জন্য রাজ্যসুখ কি, লোকলোকান্তরের পর্য্যন্ত যাবদীয় ভোগ সুখকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন মগধরাজ বিম্বসার পাণ্ডবশৈলতলস্থ বুদ্ধদেবের চরণ বন্দন করিয়া বলিলেন, হে বোধিসত্ত্ব! আমি তোমার দাসত্ব করিব, তুমি আমার রাজ্যের সকল সুখ ভোগ কর, আর বনে বনে ভ্রমণ করিও না, এই ভূমিতলে তৃণ-শয্যায় শয়ন ও উপবেশন করিও না। ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন যে,

"কামা বিষসমাঃ অনন্তদোষা নরকে প্রপাতন তির্য্যক্‌যোনৌ। বিদ্বাভর্বিগর্হিতা চাপ্যনার্য্যকামাঃ জহি তময়া যথা পক্কখেটপিণ্ডং।"

বিষয়কামনা বিষের ন্যায় অনন্ত দোষযুক্ত। ইহা মনুষ্যকে প্রেত তির্য্যক্-যোনি রূপ নরকে প্রবিষ্ট করায়। এই অনার্য্যকাম বিষয়ভোগকে পণ্ডিতেরা গর্হিত বলিয়া থাকেন। ঘোটকেরা যেমন পক্ক তৃণকে পরিত্যাগ করে, আমি তদ্রূপ বিষয়ভোগকে পরিত্যাগ করিয়াছি।

"কামঃ ধরণিপাল যে চ দিব্যাঃ তথ অপি মানুষকাম যে প্রণীতাঃ। একু নরু লভতে সর্ব্বকামান্ ন চ সো তৃপ্তি লভতে ভূয়ঃ এষঃ।"

হে ধরণিপাল; যদি দেবতার এবং মানুষের সমুদায় কামনা একজন মনুষ্য ভোগ করে তথাপি তাহাতে তাহার তৃপ্তি হয় না।

"যে তু ধরণিপাল শান্তা দান্তাঃ আর্য্যাশ্রব ধর্ম্ম পূর্ণসত্তাঃ প্রজ্ঞ বিদুষ তৃপ্ত তে সুতৃপ্তা।"

হে ধরণিপাল, যে সকল আর্য্যেরা তিতিক্ষা-

ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং পূর্ণ সংজ্ঞ এবং বিদ্বান্ তাঁহারাই সুতৃপ্ত।

বুদ্ধদেবের নিকটে অন্ন বস্ত্রের দুঃখ কি দুঃখ? তিনি তো অন্ন বস্ত্রকে দুঃখের কারণ জ্ঞানেই অন্নবস্ত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ধ্রুব পদার্থেই ধ্রুব সুখের অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের সার মর্ম্ম এই—

"নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।"

আমরা পরব্রহ্মের উপাসক। তিনি আমাদের হৃদয়ের দেবতা হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ভূমা সুখস্বরূপ—তিনি পূর্ণসুখানন্দময়। যদি আমরা যথার্থ সুখ চাই, শান্তি চাই, তবে যেন সমস্ত অধ্রুব পদার্থের মধ্যে তাঁহাকেই অন্বেষণ করি, তাঁহাতেই আমাদের সমস্ত পিপাসা, সকল কামনা বিন্যস্ত করি। আমাদের রোমাবলি যেন তাঁহারই দিকে উচ্চশির হয়। হৃদযতন্ত্রী তাঁহারই নামে অহোরাত্র বাদিত হইতে থাকে, আত্মা যেন তাঁহাতেই এক চক্ষু, একজ্ঞান, একপ্রাণ হইয়া যুক্ত থাকে।

হে দেব, হে পরব্রহ্ম! আকাশের বায়ু তোমার চরণরেণু মাখিয়া এত পবিত্র, সূর্য্য তোমার জ্যোতিতে এত জ্যোতিষ্মান্ এবং এই চন্দ্রমা তোমারই শুভ্র কিরণে এত শোভাময়, আনন্দময়। যখন উদ্যানের পুষ্প তোমারই চরণতলে প্রস্ফুটিত হয়, যখন বনের বিহঙ্গ তোমারই নামে সুকণ্ঠে নিনাদ করে, তখন জ্ঞান-ভক্তিসমন্বিত মানব-বিহঙ্গ কেন তোমার মহিমা গান না করিবে? হে মহিমাময়, তুমি চির পুরাণ, তুমি চির নূতন। অনন্ত দেশ কাল যদিও তোমাতেই নিমজ্জিত—আত্মহারা হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু মানব আত্মা অনন্ত জীবন লাভ করিয়াও তোমারই অমৃত রসে নিত্য নূতন জীবনে প্রস্ফুটিত হইতেছে—তোমার অমৃত ক্রোড়ে অভয় প্রাপ্ত হইতেছে। দেব, প্রার্থনা করি, আমাদের সকল সংশয় দূর করিয়া আমাদের বিশ্বাসকে তোমাতে সুদৃঢ় কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সার সত্যের আলোচনা।

তিনে এক, একে তিন।

গতবারের আলোচনার শেষ-ভাগে ত্রিকের কথা উপস্থিত হওয়াতে তাহার গোটাকত নমুনা যাহা দেখানো হইয়াছিল, তাহা এইরূপঃ—

(১)	(২)	(৩)
প্রাণ	মন	বুদ্ধি
উদ্ভিদ্	মূঢ়জীব	মনুষ্য
সুষুপ্তি	স্বপ্ন	জাগ্রৎ
তম	রজ	সত্ত্ব

ইত্যাদি।

ত্রিক দুই অক্ষরের শব্দ বই নয়, কিন্তু তাহার গুরুত্ব নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কুলায় না। বলা যাইতে পারে যে, তত্ত্বরত্নাগারের চাবি একটিমাত্র, আর সে চাবি ত্রিক। ত্রিকের দৌড় সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে—কোথাও তাহার পরিসমাপ্তি নাই।

ত্রিকের অভিব্যক্তির পথ একটি চক্রাকৃতি সোপান; আর, তাহারই নাম ব্রহ্মাণ্ড-চক্র; সংক্ষেপে—ব্রহ্মচক্র।

ব্রহ্মচক্রের দুইটি ক্রম—(১) নাম্বিবার ক্রম বা সৃষ্টির ক্রম বা অনুলোম-ক্রম; এবং (২) উঠিবার ক্রম বা সাধনের ক্রম বা প্রতিলোম-ক্রম। অনুলোম-ক্রমের গতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে; প্রতিলোম-ক্রমের গতি স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে।

বলিলাম "দুই ক্রম"; কিন্তু প্রকৃত

প্রস্তাবে তাহা দুই নহে; তাহা একই ক্রমের দুই অর্দ্ধাঙ্গ। এক দিবা+একরাত্রি =দুই দিন নহে, পরন্তু তাহা একই দিনের দুই অর্দ্ধাঙ্গ; তেমনি অনুলোম-ক্রম+প্রতিলোম-ক্রম=একই ক্রমের দুই অর্দ্ধাঙ্গ। কতকগুলি বিষয় এখানে সুবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সমগ্র ত্রিক-শ্রেণী একটি চক্রাকৃতি সোপান।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, ত্রিক-গুলি গোল সিঁড়ির ধাপেরন্যায় উপচক্র-পরম্পরা। এক-এক ত্রিকএক-এক উপচক্রের ফের।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, সমগ্র ত্রিক-চক্র দুই ভাগে বিভক্ত; সে দুই ভাগ দুইটি গোল সিঁড়ি। একটি গোল সিঁড়ি নাবিবার সিঁড়ি, আর একটি গোল সিঁড়ি উঠিবার সিঁড়ি। প্রথম গোল সিঁড়িতে ত্রিক-শ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাবিয়া চলিয়াছে, দ্বিতীয় গোল সিঁড়িতে ত্রিক-শ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে। ঐ দুইটি গোল সিঁড়ির যথাক্রমে নাম দেওয়া যাইতে পারে (১) অনুলোম-সোপান এবং (২) প্রতিলোম-সোপান।

চতুর্থ দ্রষ্টব্য এই যে, যেমন রজনীর সমাপ্তিই দিবসের আরম্ভ এবং দিবসের সমাপ্তিই রজনীর আরম্ভ, তেমনি অনুলোম-সোপানের সমাপ্তিই প্রতিলোম-সোপানের আরম্ভ এবং প্রতিলোম-সোপানের সমাপ্তিই অনুলোম-সোপানের আরম্ভ। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, রজনীর শেষাংশ যেমন দিবসের প্রথমাংশে গিয়া ঠ্যাকে, তেমনি প্রতিলোম-সোপানের শেষ ত্রিক অনুলোম-সোপানের প্রথম ত্রিকে গিয়া ঠ্যাকে। অনুলোম-সোপানের প্রথম ত্রিক কি? না,—সৎ, চিৎ, আনন্দ; প্রতিলোম-সোপানের শেষ ত্রিক কি? না,—প্রাণ, মন, বুদ্ধি। দুয়ের সংশ্লেষ কোথায়? না,—যেখানে প্রাণ-মন-বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ সৎ-চিৎ-আনন্দে গিয়া পর্য্যাপ্তি লাভ করে।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, কি গোড়ার ত্রিক, কি মাঝের ত্রিক, কি শেষের ত্রিক, সকল ত্রিকেরই ভিতরকার কল একই-প্রকার। সে কলের মুখ্য অবয়ব তিনটি—(১) শান্তি, (২) প্রতিযোগ, (৩) সংযোগ; আর, সে কলের গতি তাহার ঐ তিন অবয়বের মধ্যেই আবদ্ধ। সে গতি এইরূপঃ—শান্তি হইতে প্রতিযোগ, প্রতিযোগ হইতে সংযোগ, সংযোগ হইতে নূতন শান্তি, নূতন শান্তি হইতে নূতন প্রতিযোগ, নূতন প্রতিযোগ হইতে নূতন সংযোগ, নূতন সংযোগ হইতে নবতর শান্তি; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ত্রিকের ঐ যে ভিতরকার কল, উহা একপ্রকার রূপক-তাল। রূপক-তালের অঙ্গ তিনটিমাত্র—দুই তাল এবং এক ফাঁক। দুই তাল হ'চ্চে প্রতিযোগ এবং সংযোগ; আর এক ফাঁক হ'চ্চে শান্তি।

সকল ত্রিকের ভিতরকার কল যেহেতু একই-প্রকার; এই জন্য আদি এবং অন্ত, এই দুই মুড়ার দুই ত্রিকের প্রতি আপাতত লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া, সেই দুই ত্রিককে মাঝখানের আর আর ত্রিক-শ্রেণীর আদর্শ-রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমি এক্ষণে তাহাই করিব; তাহার পরিবর্ত্তে গোড়াতেই যদি আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিকের গোলোকধাঁদায় প্রবেশ করিয়া আপনিও বিভ্রান্ত হই এবং পাঠকবর্গকেও বিভ্রান্ত করিয়া তুলি, তাহা হইলে একূল ওকূল দুকূল যাইবে; তাহাতে কাজ নাই। আপাতত এইরূপ মনে করা যা'ক্ যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ত্রিক যেন তাহার দুই মুড়া'র দুই ত্রিকেই পরিসমাপ্ত; সৎ, চিৎ, আনন্দ—এই এক ত্রিক, এবং প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এই

আরেক ত্রিক, এই দুই ত্রিকেই পরিসমাপ্ত। তাহা হইলে সংক্ষেপে দাঁড়াইবে এই যে, সৎ-চিৎ-আনন্দ হইতে প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে অবতরণ করিবার ক্রম অনুলোম-ক্রম, এবং প্রাণ-মন-বুদ্ধি হইতে সৎ-চিৎ-আনন্দে উত্থান করিবার ক্রম প্রতিলোম-ক্রম। উপনিষৎশাস্ত্রেও আছে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূত জন্মগ্রহণ করে;

* * * *

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

কে বা প্রাণধারণ করিত, কাহারই বা প্রাণস্ফূর্ত্তি হইত, যদি এই আনন্দ আকাশে না থাকিতেন। অতএব আনন্দ হইতে অনুলোম-ক্রমে প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এ কথা শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়-সম্মত। এ কথাও তেমনি উভয়-সম্মত যে, প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রতিলোম-ক্রমে সৎ-চিৎ-আনন্দে উত্থান করিতেছে। সর্ব্বপ্রথমে প্রথম ত্রিকের অবয়ব-পারিপাট্য এবং ভিতরকার কল কিরূপ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

আমার সম্মুখে, মনে কর, একখণ্ড কাগজ উড়িয়া পড়িল। বলিলাম—"এক খণ্ড"; কিন্তু সেই একের মধ্যে তিন রহিয়াছে; তার সাক্ষী—(১) এ পিট, (২) ও পিট, এবং (৩) দুই পিটের উভয়-সাধারণ চারিধার। তেমনি সত্য এক; কিন্তু সেই একের মধ্যে তিন রহিয়াছে—সৎ রহিয়াছে, চিৎ রহিয়াছে, আনন্দ রহিয়াছে। এরূপ কাগজ কেহ কখনো চক্ষে দেখেও নাই, দেখিতে পাইবেও না—যাহার এ-পিট আছে, ও-পিট নাই; ও-পিট আছে, এ-পিট নাই; অথবা দুই পিটই আছে, কিন্তু উভয়-সাধারণ পরিধি Periphery নাই। তেমনি এরূপ সত্য কেহ কখনো জ্ঞানে বা ধ্যানে উপলব্ধি করিতে পারেও না, পারিবেও না, যে-সত্যের অস্তি (অর্থাৎ সত্তা) আছে, ভাতি (অর্থাৎ প্রকাশ) নাই; ভাতি আছে, অস্তি নাই; অথবা অস্তি-ভাতি দুইই আছে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনো-প্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই। কেমন করিয়াই বা সেরূপ অঙ্গহীন সত্যের উপলব্ধি সম্ভব হইবে?—মূলেই যাহার ভাতি নাই, কাহারো নিকটে কস্মিন্ কালেও যাহার প্রকাশ নাই—প্রকাশের সম্ভাবনাও নাই, তাহাকে "আছে" বলিলে কি বুঝায়? শুদ্ধ কেবল আ এবং ছে এই দুই অক্ষর বুঝায়, তাহা ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। যাহার ভাতি আছে, অস্তি নাই, তাহাই বা কিরূপ সত্য? "মাথা নাই, মাথাব্যথা" যেরূপ সত্য, "অস্তি নাই ভাতি" ঠিক্ সেইরূপ সত্য, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তুমি বলিতেছ, "অস্তি আবার কি—সবই তো ভাতি"; তোমার এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তুমি আবার কে—সবই তো তোমার মুখের কথা। ফলে, সূর্য্য নাই, দিবালোক আছে; এবং অস্তি নাই, ভাতি আছে; এ দুই কথা একই ধরনের কথা; দুয়ের কোনোটিরই অর্থ ঘুণাক্ষরেও কাহারো বোধগম্য হইবার নহে। যদি বল যে, অস্তিও আছে, ভাতিও আছে; কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনোপ্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই—যোগ-সূত্র নাই—সম্বন্ধ নাই, তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—ভাতি যে, সে কাহার ভাতি? অস্তিরই তো ভাতি! অস্তি যে, সে কাহার অস্তি? যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহারই তো অস্তি—ভাতিরই তো অস্তি! তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, অস্তি এবং ভাতির মধ্যে কোনোপ্রকার ঐক্যের বন্ধন নাই—সম্বন্ধ

নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অস্তি এবং ভাতির মধ্যে সেই যে বন্ধনের আঁট, তাহা কি? ইহার উত্তর এই যে, তাহা আনন্দ। এ যাহা বলিতেছি, ইহার প্রথম উপমাস্থল—পিতামাতার সহিত পুত্রকন্যাদিগের ঐক্য-বন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ। পৈতৃক ঐক্যবন্ধন প্রকৃতপ্রস্তাবেই ঐক্যের (অর্থাৎ একত্বের) বন্ধন; কেন না, পুত্রকন্যারা পিতা-মাতার শরীর-মন লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; পুত্রকন্যারা পিতামাতার সাক্ষাৎ ভাতি (অর্থাৎ আবির্ভাব)। দ্বিতীয় উপমা-স্থল—ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ; এ ঐক্যবন্ধন বিভিন্নের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। তৃতীয় উপমাস্থল—পতিপত্নীর ঐক্যবন্ধন এবং তৎসংক্রান্ত আনন্দ; এ ঐক্যবন্ধন বিপরীতের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন। এই তিনপ্রকার ঐক্য-বন্ধন মনুষ্য-সমাজের গোড়া'র বাঁধুনি, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; অধিকন্তু এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, তিনই অস্তি এবং ভাতির ঐক্যবন্ধন। পিতামাতা পুত্রকন্যাতে আপনারই ভাতি দেখেন; ভ্রাতারা পর-স্পরের আকারপ্রকার-ভাবভঙ্গীতে আপ-নাদের ভাতি দেখেন; স্বামি-স্ত্রী আপনা-দিগের উভয়কে পরস্পরের সহিত অভেদ দেখেন; স্বামী স্ত্রীতে আপনার ভাতি দেখেন, স্ত্রী স্বামীতে আপনার ভাতি দেখেন। বিশেষত দম্পতির ঐক্যবন্ধনে আনন্দ অতীব সুপরিস্ফুট ভাব ধারণ করে; আর, তাহা যে করে, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে; সে কারণ আর কিছু না—প্রতিযোগের মধ্য দিয়া সংযোগের অভি-ব্যক্তি। এ যাহা বলিলাম, ইহার যৎকিঞ্চিৎ টীকা করা আবশ্যক; তাহা এই:—

পুত্রকন্যা পিতামাতার নিতান্তই আপ-নার। যাহা আপনার, তাহাতে আপনার ভাতি দেখিতে পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভ্রাতা-ভগিনীরা এক মায়ের গর্ভজাত, কাজেই পরস্পরের আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী এবং আচার-ব্যবহারের দর্পণে পরস্পরের মুখ দেখিতে পাওয়া, তাঁহাদের পক্ষেও কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পক্ষান্তরে, এক পিতামাতার পুত্র এবং আরএক পিতামাতার কন্যা, দোঁহে দোঁহার নিতান্তই পর; তাহা সত্ত্বেও যে, স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় আপনি বা আপনার অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম ক-রেন; হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্ত্রী স্বামীতে এবং স্বামী স্ত্রীতে আপনার ভাতি দর্শন করেন; তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বর-কন্যার শুভদৃষ্টি একপ্রকার ভাতি-বিনিময় অর্থাৎ পরস্পরের নয়ন-দর্পণে পরস্পরকে দেখা; নিতান্ত পর ব্যক্তির নয়ন-দর্পণে আপনাকে দেখা; ইহারই নাম প্রতিযোগের মধ্য দিয়া সংযোগের অভিব্যক্তি। দাম্পত্য-বন্ধনে প্রতিযোগের সংশ্লেষে সংযোগ সুপরিস্ফুট হয় বলিয়া, সে বন্ধনে আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত ভাব ধারণ করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অস্তি এবং ভাতির ঐক্যবন্ধন আনন্দেরই প্রস্রবণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সকল ত্রিকেরই ভিতরকার কল একই-প্রকার; ইহাও বলি-য়াছি যে, সে কলের মুখ্য অবয়ব তিনটি—(১) শান্তি, (২) প্রতিযোগ, এবং (৩) সংযোগ। এ তিনটি অবয়ব মূল ত্রিকে অতীব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে; তার সাক্ষী:—

প্রথমত সৎ অর্থাৎ নিত্যসত্য চির-কালই সমান। এই যে অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যসত্যের ভাব বা সতের ভাব, এই প্রথম ভাবটি শান্তি-প্রধান, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয়ত অসতের প্রতিযোগে সতের, এবং সতের প্রতিযোগে অসতের যে প্রকাশ, তাহারই নাম চিৎ বা জ্ঞান; কাজেই বলিতে হইতেছে যে, চিৎ প্রতিযোগপ্রধান। কেহ বলিতে পারেন—এটা সত্য যে, ছায়ার উপলব্ধি আলোকের প্রতিযোগিতা-সাপেক্ষ; কিন্তু আলোকের উপলব্ধিও যে ছায়ার প্রতিযোগিতা সাপেক্ষ, তাহা কে বলিল? একটা ঘর যখন দীপালোকে আলোকিত হয়, তখন ছায়ার প্রতিযোগিতা তাহার মধ্যে কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, একটা ঘর যখন দীপালোকে আলোকিত হয়, তখন সেই আলোকের প্রত্যেক ছেদ-স্থানেই ছায়া নিপতিত হয়; কোথাও বা ঘনচ্ছায়া নিপতিত হয়, কোথাও বা অর্দ্ধ ছায়া নিপতিত হয়; তা ছাড়া ঘরের মধ্যে দীপালোক অপেক্ষা মলিন বর্ণের বস্তু যত কিছু আছে, যেমন আবলুষ কাঠ, সবুজ কাপড় ইত্যাদি, তাহাও ছায়ারই সামিল। ফল কথা এই যে, আমাদের চক্ষের সম্মুখে যদি কেবলমাত্র একরঙা আলোক নিত্যনিয়ত বর্ত্তমান থাকিত, আর তাহার কোনো স্থানে যদি কোনোপ্রকার রঞ্জন বা অঞ্জনের সংস্পর্শ না থাকিত, তাহা হইলে হইত এই যে, আমরা যেমন শত মন বায়ুর ভার মস্তকের উপরে অষ্টপ্রহর বহন করিয়াও তাহার সরিষাভোরও উপলব্ধি করি না, তেমনি আমাদের চক্ষুর উপরে অষ্টপ্রহর আলোকের বর্ষণ হইলেও আমরা তাহার কণামাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, নীলবর্ণ আকাশেই চন্দ্র তারার মুখশ্রী দীপ্তি পায়; তা ছাড়া, যেখানেই আমরা সূর্য্যাতপ বা চন্দ্রাতপ দেখি, সেইখানেই তাহার আশেপাশে, ছেদ-স্থানে এবং সীমাপ্রদেশে ছায়া বা বর্ণমালিন্য সংলগ্ন দেখি, আর সেই ছায়া বা বর্ণমালিন্য সংলগ্ন দেখি বলিয়া তাহারই প্রতিযোগে সূর্য্যাতপ বা চন্দ্রাতপ দেখিতে পাই—নচেৎ দেখিতে পাইতাম না।

অতএব এটা সুনিশ্চিত যে, ছায়ার প্রতিযোগেই আলোকের প্রকাশ সম্ভবে; অসতের প্রতিযোগেই সতের প্রকাশ সম্ভবে; আর সতের সেই যে প্রকাশ, তাহারি নাম চিৎ বা জ্ঞান। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সৎ শান্তিপ্রধান, চিৎ প্রতিযোগ-প্রধান। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, আনন্দ সংযোগ-প্রধান। একদিকে সতের প্রশান্তি এবং অচল-প্রতিষ্ঠা, আর-এক দিকে চিত্তের উৎক্রান্তি এবং প্রকাশ, এই দুয়ের ঐকতানিক সংযোগই আনন্দের উৎস। গোড়া'র ত্রিকের ভিতরে রূপকতালের তরঙ্গলীলা, এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল—শেষের ত্রিকের ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলে অবিকল তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষের ত্রিক হ'চ্চে—(১) প্রাণ, (২) মন, (৩) বুদ্ধি। কল-প্রধান শতাব্দীর, (Mechanical ageএর) এক কথায়—কলিযুগের—প্রধান একজন তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত (আর কেহ নহেন—স্পেন্সর) প্রাণের সংজ্ঞা-নির্ব্বাচন করিতে গিয়া বিভ্রান্তির তরঙ্গকল্লোলে হাবুডুবু খাইয়াছেন! হাবুডুবু খাইবারই কথা। প্রাণকে বুদ্ধি এবং মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে গিয়াছেন—কাজেই হাবুডুবু খাইয়াছেন। তিনি যদি সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিকে ধরিতেন, আর তাহার পরে মনকে অর্দ্ধপরিস্ফুট বুদ্ধি, এবং প্রাণকে অপরিস্ফুট মন বলিয়া অবধারণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হাবুডুবু খাইতে হইত না; কিন্তু তিনি ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি

প্রথমেই প্রাণকে একপ্রকার উচ্চ অঙ্গের ঘড়ির কল-রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন; তাহার পরে তিনি মনকে উচ্চ অঙ্গের প্রাণ, এবং বুদ্ধিকে উচ্চ অঙ্গের মন করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন; কাজেই হাবুডুবু খাইয়াছেন। বড়'দের দৃষ্টান্ত ছোটো'দের উপরে কাজ করে—ইহা খুবই সত্য; কিন্তু সকল ছোটো'র উপরে সমানতরো কাজ করে না; একদল ছোটো'র চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে, আর-এক-দল ছোটো'র চক্ষু ফুটাইয়া তোলে। বড় বড় বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের অনেকগুলা নিছক বলগর্ব্ব উক্তি (অর্থাৎ গায়ের জোরের কথা) আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের বালকদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে—ইহা আমার স্বাখা কথা। ক্যান্টের কথা ছাড়িয়া দেও—ক্যান্ট্ দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ! তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম সত্যানুরাগী দার্শনিক পণ্ডিতের যুক্তিপূর্ণ বাক্য-সকলের সহিত স্পেন্সর, মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি-সকলকে তুলাইয়া দেখিলে শেষোক্ত পণ্ডিতগণের বিপথগামিতার প্রতি কাহার না চক্ষু ফুটে? নিতান্ত যে অন্ধ—তাহারও চক্ষু ফুটে। বলিতে কি—স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ যে-পথে চলিয়া ভ্রান্তি-কূপে নিমগ্ন হইয়াছেন, আমি ঠিক্ তাহার বিপরীত পথে চলিয়া সে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জড়কে জ্ঞানের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, প্রাণকে একপ্রকার ঘড়ির কল করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। আমি তাহা না করিয়া প্রথমেই বুদ্ধিকে আলোচ্য-পদবীতে বরণ করিয়াছি। বুদ্ধির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি প্রনিধান করিয়া দেখিলাম যে, বুদ্ধির ভিতরেই তিনপ্রকার সত্তা একত্র জমাটবদ্ধ রহিয়াছে;—অব্যক্ত সত্তা গভীরে নিমগ্ন রহিয়াছে; প্রাতিভাসিক সত্তা উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং বাস্তবিক সত্তা দুইকে ক্রোড়ে করিয়া বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। বুদ্ধির মুখ্য উপজীবিকাই হ'চ্চে বাস্তবিক সত্তা; মনের মুখ্য উপজীবিকা—প্রাতিভাসিক সত্তা; প্রাণের মুখ্য উপজীবিকা—অব্যক্ত সত্তা। এখন দেখিতে হইবে এই যে, প্রাণকে একপ্রকার উচ্চ অঙ্গের ঘড়ির কল বলিলে, তাহার পরিচয়-জ্ঞাপক প্রভেদ-লক্ষণের কিছুই বলা হয় না; অর্থাৎ আর আর কল হইতে প্রাণের বিশেষত্ব যে কোন্‌খানটিতে, তাহার কিছুই বলা হয় না। স্পেন্সরের দলের পণ্ডিত-বর্গের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, প্রাণের সংস্থা-নির্ব্বাচন যদি করিতেই হয়, তবে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত যে, জল যেমন তরলীভূত বাষ্প এবং বরফ যেমন ঘনীভূত জল; তেমনি, মন প্রাতিভাসিক বুদ্ধি, এবং প্রাণ অব্যক্ত মন। পূর্ব্বে আমি দেখাইয়াছি যে, সৎ শান্তি-প্রধান, চিৎ প্রতিযোগ-প্রধান, এবং আনন্দ সংযোগ-প্রধান; এখন দেখাইতে চাই যে, প্রাণ শান্তি-প্রধান, মন প্রতিযোগ-প্রধান, এবং বুদ্ধি সংযোগ-প্রধান। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ ভেদাভেদ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রাণের প্রধান আড্ডা হ'চ্চে ভাব-রাজ্যে সুষুপ্তি, এবং আবির্ভাবরাজ্যে তরুলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থ। মনের প্রধান আড্ডা হ'চ্চে ভাবরাজ্যে স্বপ্ন, এবং আবির্ভাব-রাজ্যে পশুপক্ষী প্রভৃতি মূঢ়জীব। বুদ্ধির প্রধান আড্ডা হ'চ্চে ভাব-জগতে জাগরিতাবস্থা এবং আবির্ভাব-জগতে মনুষ্য। ভাব-জগতের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন

অবস্থার সহিত, তথৈব, বুদ্ধি মন এবং প্রাণ এই তিনটি অন্তঃকরণ-বৃত্তির সহিত, মনুষ্য মূঢ়-জীব এবং তরুলতার (প্রথমের সহিত প্রথমের, দ্বিতীয়ের সহিত দ্বিতীয়ের, এবং তৃতীয়ের সহিত তৃতীয়ের) বিশেষ ঘনিষ্টতা এ যাহা রহিয়াছে, তাহা তো রহিয়াইছে, তা ছাড়া, তিন প্রকার ব্যবসায়ের সঙ্গেও যথাক্রমে ঐ-তিনের-তিনের বিশেষ ঘনিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায়। সে তিনটি ব্যবসায় হ'চ্চে ভোগ কর্ম্ম এবং জ্ঞান। প্রাণের বিশেষ ব্যবসায় হ'চ্চে ভোগ, মনের বিশেষ ব্যবসায় হ'চ্চে কর্ম্ম, এবং বুদ্ধির বিশেষ ব্যবসায় হ'চ্চে জ্ঞান। এই জন্য প্রাণ মন এবং বুদ্ধির পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, ভোগ কর্ম্ম এবং জ্ঞানের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহার প্রতি সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

ত্রিক-গণের মধ্যে সৌহার্দ্দ-বন্ধন কি চমৎকার! একটা ত্রিককে ডাকিলে দশটা ত্রিক জোটবদ্ধ হইয়া তাহার পাছু পাছু ছুটিয়া আইসে। ডাকিলাম প্রাণ-মন-বুদ্ধিকে; আর অমনি দেখিতে-না-দেখিতে সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগ্রৎ এবং তরুলতা-পশুপক্ষি-মনুষ্য জোটবদ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত! এক্ষণে আবার, আর-একটি ত্রিক নূতন দেখা দিতেছে—সে ত্রিক হ'চ্চে (১) ভোগ, (২) কর্ম্ম, (৩) জ্ঞান। এই নূতন ত্রিকটি'র সহিত উদ্ভিদ্, মূঢ়জীব এবং মনুষ্য—এই পরিদৃশ্যমান ত্রিকটির আর,—সেই সঙ্গে প্রাণ মন এবং বুদ্ধি, এই অন্তর্নিগূঢ় ত্রিকটি'র তান-মান-লয়ের মিল যে কেমন চমৎকার, তাহা দেখিলে মন আশ্চর্য্য-রসে দ্রবীভূত হয়; তাহা এইরূপ :—

ভোগ-শব্দের মুখ্য অর্থ পূরণ—অভাবের পূরণ; তার সাক্ষী—অন্নদ্বারা শরীরের অভাব-পূরণের নাম অন্ন ভোগ করা; আনন্দদ্বারা মনের অভাব-পূরণের নাম আনন্দ ভোগ করা; ইত্যাদি। যে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির গৃহ ভোগের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ, তাঁহাকে আমরা বলি "সুখী"। কিন্তু সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি সহস্র সুখী হইলেও তাঁহার ভোগের সামগ্রী ক্রমাগতই ক্ষয় পাইতে থাকে; আর, সেইজন্য তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ভোগের সামগ্রী জোগাড় করিতে হয়। ভোগ্যবস্তুর আয়োজন কষ্টকর ব্যাপার; কাজেই, চেতনাবান্ জীবমাত্রকেই সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ফলে, দুঃখের প্রতিযোগেই সুখের স্বাদ-গ্রহণ সম্ভবে, এবং সুখের প্রতিযোগেই দুঃখের স্বাদগ্রহণ সম্ভবে। পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখের ওলট্‌পালট্ ব্যতিরেকে সুখও অনুভূত হইতে পারে না, দুঃখও অনুভূত হইতে পারে না। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থের ভোগের সামগ্রী প্রতিনিয়তই তাহাদের হাতের কাছে সাজানো রহিয়াছে :—তাহাদের একতালার ভাণ্ডার-ঘরে আর্দ্র মৃত্তিকা রহিয়াছে; সেই স্থান হইতে তাহারা পানীয় আহরণ করে। তাহাদের দোতালার মুক্ত ভাণ্ডারে বায়ু রহিয়াছে; সেই স্থান হইতে তাহারা অঙ্গারাদি অন্ন আহরণ করে। তাহাদের তেতালার ঘরে সূর্য্যাতপ রহিয়াছে; সেই স্থান হইতে তাহারা আলোক এবং উত্তাপ আহরণ করে। বৃক্ষের কোনো দুঃখ নাই। দুঃখ নাই—কাজেই সুখও নাই; কেন না, (ইতিপূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি) দুঃখের প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে সুখের স্বাদ-গ্রহণ সম্ভবে না! সুখদুঃখের অনুভব উৎপাদন করিতে হইলে ভোগের আয়তন কি না শরীর, এবং ভোগের সামগ্রী কি না/

অন্নাদি, এ-দুয়ের মাঝখানে একটা প্রাচীরের ব্যবধান নিতান্তই আবশ্যক। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, প্রকৃতি-মাতা বৃক্ষ-লতাদির ভোগ্য-সামগ্রী যেমন প্রতিনিয়তই তাহাদের হাতের কাছে সাজাইয়া রাখেন—পশুপক্ষীদিগের ভোগের সামগ্রী তেমন করিয়া কেহ তাহাদের হাতের কাছে সাজাইয়া রাখে না। পশুপক্ষীদিগের শরীর ক্ষুধাতৃষ্ণার অগ্নিশরণ বা অগ্নিমন্দির; আর, সেই অগ্নির হবনীয় পদার্থ যোজন-যোজন দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কাজেই, কর্ম্ম-চেষ্টার পথ দিয়া ঐ অগ্নি এবং ঐ হব্য সামগ্রীর মধ্যে ক্রমাগতই সংযোগ-বিয়োগ চলিতে থাকে, আর সেই গতিকে সুখ-দুঃখের ক্রমাগতই ওলট্পালট্ হইতে থাকে।

বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ পদার্থের কর্ম্ম-চেষ্টা নাই—ভোগই তাহাদের সর্ব্বস্ব। পশু-পক্ষীরা পর্য্যায়-ক্রমে ভোগ এবং কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থকার তাই বলিয়াছেন যে, মূঢ় জীবেরা "কুর্ব্বতে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে"—ভোগের জন্য কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মের জন্য ভোগ করে। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, দুঃখই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; অথচ, বিশ্ববিধাতার কি আশ্চর্য্য ন্যায় এবং দয়া, কর্ম্মেতে ভোগের সুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া দুঃখকে কেবল যে ভুলাইয়া দ্যায় তাহা নহে, অধিকন্তু সুখকে দ্বিগুণিত—চতুর্গুণিত করিয়া তোলে; এবং আর এক দিয়া প্রকারান্তরে জ্ঞান-চর্চ্চার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া সুখ দুঃখের ওপারে স্থায়ী আনন্দের ঠিকানা নির্দেশ করে। মনে কর, একটা বিজন প্রান্তরের মধ্যে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হইয়াছে; আর, কোশ-খানেক দূরে একটা দেবালয়ের অতিথি-শালা রহিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহার অভিমুখে আমি দ্রুতবেগে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। এরূপ অবস্থায়—কে বলিল যে, আমার ক্ষুধার জ্বালা দুঃখ? তাহা সুখের নিদান! আমি যে, অতিথি-শালায় অন্ন-ভোজন করিয়া সুখী হইব—আমার ক্ষুধার জ্বালা তাহারই শুভ-চিহ্ন। কে বলিল যে, দ্রুতগমনের পরিশ্রম দুঃখ? তাহা সুখের নিদান! আমি যে, অচিরে অতিথি-শালায় উপনীত হইয়া বিশ্রামের সুখ উপভোগ করিব—আমার দ্রুত-গমনের পরিশ্রম তাহারই শুভ-চিহ্ন। আমি যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম—এবং বিশ্রাম করিয়া নবীভূত হইলাম, তখন পান্থ-শালা কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম; আর, সেই সঙ্গে লোকহিত ব্রতের স্বর্গীয় মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্তঃকরণে সুবিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জীবের কর্ম্মচেষ্টাতে এক-তো ভাবী সুখ প্রতিবিম্বিত হইয়া কর্ম্মের দুঃখকে দুঃখ বলিয়াই মনে করিতে দ্যায় না; তাহাতে আবার কর্ম্ম-চেষ্টা নিজেই একপ্রকার ভোগ (অর্থাৎ অভাবের পূরণ), যে হেতু কর্ম্মদ্বারা জড়তা-রূপী অভাবের পূরণ হয়।

স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বৃক্ষলতাতে ভোগ-ক্রিয়ারই একাধিপত্য; মূঢ় জীবে ভোগ-ক্রিয়া এবং কর্ম্মচেষ্টা উল্টিয়া-পাল্টিয়া পর্য্যায়-ক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। মনুষ্য সময়ে সময়ে ভোগ এবং কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া—উভয়ের ভাল-মন্দের বিচার করে;—কোন্ সময়ে ভোগ ভাল—কোন্ সময়ে কর্ম্ম ভাল—কিরূপ ভোগ ভাল—কিরূপ কর্ম্ম ভাল—কতমাত্রা ভোগ ভাল—কতমাত্রা কর্ম্ম ভাল—কিরূপ প্রণা-

লীতে ভোগ করা ভাল—কিরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম করা ভাল, এই সব ভাল-মন্দের বিচার করে; ভালমন্দের বিচার করিয়া কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য স্থির করে। ভালমন্দের বিচার সত্যাসত্যের প্রতীতির উপরে নির্ভর করে। যাহার সত্যাসত্যের জ্ঞান নাই, তাহার ভাল-মন্দ-বিবেচনার গোড়া'র বাঁধুনি নিতান্তই আল্‌গা। প্রাণের ব্যবসায় হ'চ্চে ভোগ—উপজীবিকা হ'চ্চে অন্ন। মনের ব্যবসায় হ'চ্চে কর্ম্ম—উপজীবিকা হ'চ্চে সুখ। বুদ্ধির ব্যবসায় হ'চ্চে জ্ঞান—উপজীবিকা হ'চ্চে সত্য।

সত্যই বুদ্ধির মুখ্য আলোচ্য বিষয়। সত্য বস্তুত এক, কিন্তু কার্য্যত অনেক। ভিন্ন ভিন্ন সত্য ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উপযোগী। জ্যোতিষ্য সত্য পঞ্জিকা-প্রণয়ন-কার্য্যের উপযোগী; জ্যামিতিক সত্য স্থাপত্য-কার্য্যের উপযোগী; রাসায়নিক সত্য—ছায়াঙ্কন (Photography), ঔষধ-প্রস্তুত-করণ, প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী; সমগ্র সত্য সমগ্র আত্মার পুরুষার্থসাধনের উপযোগী। সমগ্র সত্য অখণ্ড এবং অপরিচ্ছিন্ন; ব্যাবহারিক সত্য খণ্ড খণ্ড এবং পরিচ্ছিন্ন; তার সাক্ষী—দার্শনিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, বৈদিক সত্য, পৌরাণিক সত্য, জ্যামিতিক সত্য, রাসায়নিক সত্য, এবংবিধ নানাশ্রেণীর নানা সত্য একই অখণ্ড সত্যের বহুধা-বিচিত্র শাখা-প্রশাখা। সব সত্যই বুদ্ধির আলোচ্য বিষয়। একই অখণ্ড সত্যকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কাজের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়, তেমনি একই জ্ঞাতা পুরুষের বুদ্ধিকে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার কার্য্যের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়; তার সাক্ষী—প্রজ্ঞা এক থাকের বুদ্ধি; বিজ্ঞান দ্বিতীয় আর-এক থাকের বুদ্ধি; ধর্ম্মবুদ্ধি তৃতীয় আর-এক থাকের বুদ্ধি; বিষয়বুদ্ধি চতুর্থ আর-এক থাকের বুদ্ধি; ইত্যাদি। তাহার মধ্যে—প্রজ্ঞার আলোচ্য বিষয় অখণ্ড সত্য; বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় জ্যামিতি, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড বৈজ্ঞানিক সত্য; ধর্ম্মবুদ্ধির আলোচ্য বিষয় মনুষ্যের পুরুষকার, বিশ্ববিধাতার ন্যায় এবং দয়া, কর্ম্মফল প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সত্য; বিষয়-বুদ্ধির আলোচ্য বিষয় অর্থের আয়-ব্যয়, সামাজিক রীতি-নীতি-প্রথা প্রভৃতি লৌকিক সত্য।

এখানে একটি বিষয় সবিশেষ দ্রষ্টব্য—বিষয়টি গুরুতর; তাহা এই যে, উপরের উপরের ধাপে নীচের নীচের ধাপ সর্ব্বতোভাবে সম্ভুক্ত থাকে; অর্থাৎ নীচের নীচের ধাপে যাহা কিছু আছে, সমস্তই উপরের উপরের ধাপে মোট-বাঁধা হয়—কোনো-কিছুই বাদ পড়ে না। তার সাক্ষী—বিদ্যালয়ের বালক যখন নীচের শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়িয়া-চুকিয়া উপরের শ্রেণীতে রঘুবংশ পড়িতে আরম্ভ করে, তখন সে রঘুবংশের ভিতরে তাহার পূর্ব্বশিক্ষিত সমস্ত বৈয়াকরণিক সত্যই সম্ভুক্ত রহিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। ইহাও তেমনি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বুদ্ধির ভিতরে মন এবং প্রাণ, দুইই সম্ভুক্ত রহিয়াছে; বাস্তবিক সত্তাতে প্রাতিভাসিক সত্তা এবং অব্যক্ত সত্তা, দুইই সম্ভুক্ত রহিয়াছে; অখণ্ড এবং অপরিচ্ছিন্ন সত্যে সমস্ত সত্যই সম্ভুক্ত রহিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, অখণ্ড সত্য বুঝি বা খণ্ড সত্য হইতে পরিচ্ছিন্ন একটা কিছু। তাঁহাদের এ বোধ নাই যে, অখণ্ড সত্য যদি খণ্ড সত্য হইতে পরিচ্ছিন্নই হ'ন, তবে তাহা তো পরিচ্ছিন্ন সত্য। পরিচ্ছিন্ন সত্যের নামই তো খণ্ড সত্য। পরিচ্ছিন্ন সত্য আবার অখণ্ড সত্য

হইল কিরূপে? তেমনি আবার, অনেকে মনে করেন যে, বুদ্ধি প্রাণ-মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের পদার্থ। ইহাদের এ বোধ নাই যে, প্রাণ-মনের সহিত বুদ্ধির যদি কোনোপ্রকার একাত্মভাব না থাকে, তবে বুদ্ধি রাজ্যহীন রাজার ন্যায় অথবা রথহীন রথীর ন্যায় কেবল একটা আভিধানিক শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির মধ্যে যে, কোনো হিসাবেই প্রভেদ নাই—এ কথা কেহই বলিতেছে না। প্র ভেদ খুবই আছে। কিন্তু প্রভেদ যাহা আছে, তাহা অভেদেরই পরিপোষক, তা বই তাহা অভেদের হন্তারক নহে। আমি এখানে দেখাইতে চাই এই যে, তিনের মধ্যে প্রভেদের ছেদচিহ্ন যেমন সুস্পষ্ট, একাত্মভাবের বন্ধন তেমনি সুদৃঢ়; দুয়েরই গুরুত্ব সমান। প্রভেদ কেমন সুস্পষ্ট, এবং একাত্মভাবের বন্ধন কেমন সুদৃঢ়, তাহা পরে পরে ক্রমশই অধিকাধিক প্রকাশ পাইতে থাকিবে। আর, সেই সঙ্গে, প্রাণ মন এবং বুদ্ধির ভিতরে শান্তি প্রতিযোগ এবং সংযোগের কল কিরূপে বিচেষ্টিত হয়, তাহাও প্রকাশ পাইতে বাকি থাকিবে না।

ইব্রাহিম ও অগ্নি-উপাসক।

দিন যায় সপ্তাহখানেক চলে যায়
অতিথের দেখা নাই অতিথিশালায়;
ইব্রাহিম মহামতি ভাবিয়া অধীর
আমার আশ্রমে কেন না আসে ফকীর।

একদিন ঘুরে ফিরে মরুর মাঝারে
সুভদ্র তাপসবৃদ্ধ সুক্ষণে নেহারে।
লোলচর্ম্ম জীর্ণবাস ঘন কম্প-শ্বাস,
ক্লিষ্ট ক্লান্ত শীর্ণকায় শুক্ল কেশপাশ।

সাধু তারে সম্ভাষিয়ে মহা সমাদরে
আতিথ্য-সৎকার তরে নিয়ে যান ঘরে,
কহিল বিনয়ে "মোর স্বল্পই সম্বল,
হেথায় যা কিছু আছে তোমারই সকল;
কিছুকাল তাম্বু মাঝে করহে বিশ্রাম
ইচ্ছা-সুখে খেয়েপিয়ে লভহ আরাম।"
বাক্যগুলি বৃদ্ধ কাণে সুধা যেন ঝরে
বিনা বাক্যব্যয়ে তার আতিথ্য স্বীকারে।
দাস দাসী পরিজন করে আয়োজন,
বসিবারে দেয় তারে মহার্ঘ্য আসন।
ভোজগৃহে সারি সারি অতিথি সহিত
আর যত নিমন্ত্রিত বসে যথারীত।

ভোজনের আগে সবে আল্লা নাম কয়,
হেনকালে বৃদ্ধ খালি মৌনভাবে রয়।
ইব্রাহিম কহে "বৃদ্ধ, এ কি আচরণ?
যার খাও সে নাম না কর উচ্চারণ?"
বৃদ্ধ কহে "উপদেশ দেন গুরুদেব
সেই মন্ত্রে জপি নাম পূজি অগ্নিদেব।"

শুনিয়া বিষম রুষ্ট ইব্রাহিম খুড়া—
বুঝিলেন অগ্নি-উপাসক এই বুড়া;
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বৃদ্ধে করে বহিষ্কার
কলঙ্ক পরশে পাছে পরশি অঙ্গার।

হইল আকাশবাণী "ছি ছি ছি কি লাজ!
বিজ্ঞ তুমি মূঢ় সম এ কি তব কাজ?
আমি ত বুড়ারে সহি অশীতি বৎসর
সহিতে না পার তুমি দুই দণ্ড ভর?
সেই একে নানা লোকে ভজে নানা মতে,
কেহ খোঁজে এক পথে কেহ অন্য পথে;
ভ্রমান্ধ না বুঝে বাছা কি কাণ্ড করিলি—
দয়া মায়া সব তাহে দিলি জলাঞ্জলি!
অগ্নি-উপাসকে সেবি হতে পার ক্ষুণ্ণ,
আতিথ্য ধরম কিন্তু রেখ গো অক্ষুণ্ণ।
যাও পুন আন বৃদ্ধে করি অভ্যর্থনা
অশ্রুজল মুছি তার ঘুচাও বেদনা।"

দৈবরাণী শুনি সাধু চলিলা সত্বর
বহু অনুনয়ে তারে ফিরাইল ঘর।
অনুতাপ-দগ্ধ হিয়া কহে মহামতি
"ক্ষম অপরাধ মোর করি এ মিনতি।
বিনা দোষে সহ ভাই কত অত্যাচার—
আমারি অন্ধতা-দোষ জানিয়াছি সার।"

সাদি—বোস্তন হইতে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫২ ৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৪৬৸৴৪
সমষ্টি	...	৫৯৯ ৻৬
ব্যয়	...	৬৩৷৷৴৬
স্থিত	...	৫৩৫।৶০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
একেকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৩৫।৶০

৫৩৫।৶০

আয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৩৸০
পুস্তকালয়	...	৪৲
যন্ত্রালয়	...	১৩ ৻৬
গচ্ছিত	...	৸৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		৷৷০
সমষ্টি		৫২৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৩।৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৬৸ ৬
পুস্তকালয়	...	।৴৯
যন্ত্রালয়	...	৩৩ [illegible]
সমষ্টি		৬৩৷৷৴৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ত্রিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

পঞ্চদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩।

৭১৪ সংখ্যা | ১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ১ মাঘ বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সার সত্যের আলোচনা।

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের কার্য্যগত প্রভেদ।

ডারুইনের শাস্ত্র-অনুসারে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (survival of the fittest) সৃষ্টির প্রধান প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। আমার ইচ্ছা হইতেছে, ডারুইনের ঐ কথাটির উপরে উপরে ভাসিয়া না বেড়াইয়া উহার ভিতরে কি আছে, তাহা একবার ডুব দিয়া দেখিতে; অতএব দেখা যা'ক্ ঃ—

যে-কোনো সীমাবদ্ধ বস্তু হউক্ না কেন,—যেমন তুমি বা আমি—সেই সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র বস্তুটিকেই সমস্ত জগতের একতম খণ্ড বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোনো এক ব্যক্তিকে—যেমন দেবদত্তকে—যদি সমস্ত জগতের একতম খণ্ড বলিয়া ধরা যায়, তবে কাজেই দাঁড়ায় যে, দেবদত্তের শরীরের সীমার বাহিরে জগতের মধ্যে আর আর যত কিছু পদার্থ আছে সমস্তের মোট বাঁধিয়া নিখিল জগতের অন্যতম খণ্ড। তবেই হইতেছে যে, নিখিল জগৎ দুই খণ্ডে বিভক্ত; এক খণ্ড হ'চ্চে দেবদত্ত নিজে, আর-এক খণ্ড হ'চ্চে দেবদত্তের শরীরের সীমার বাহিরে যেখানে যাহা কিছু আছে, তা-সবা'র সমষ্টি। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, তুমি নিজে একজন এবং তোমার শরীরের সীমার বাহিরে যেখানে যত-কিছু পদার্থ আছে, সমস্তের সমষ্টি আর-এক জন। তোমরা দুইজন প্রকৃত-প্রস্তাবে দুই নহ; পরন্তু একেরই দুই অপরিহার্য্য অঙ্গ;—সে এক কি? না, সমস্ত জগৎ। তুমি, এবং তোমাছাড়া জগতে আর যাহা কিছু আছে সমস্ত—এই দুই ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ খণ্ড-পদার্থ—যখন একেরই দুই অপরিহার্য্য অঙ্গ, তখন দুয়ের মধ্যে ঐকান্তিক বিচ্ছেদ অসম্ভব—সুতরাং দুয়ের মধ্যে যোগ অবশ্যম্ভাবী। এই তো পাইলাম যোগ। এখন যোগ্যতা কি—তাহাই জিজ্ঞাস্য।

যে-কোনো সীমাবদ্ধ বস্তু হউক্ না কেন, তাহার যোগ্যতা বলিতে বুঝায় আর কিছু না—তাহার নিজত্বের সীমার বাহিরের বস্তুসকলের সহিত যোগ-ক্ষমতা। তুমি যদি তোমার পরিবার-বর্গের সহিত—রাজপুরুষদিগের সহিত—কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সহিত—ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের সহিত—এক

কথায় সময়ের সহিত যোগে চলিতে পার, তবে তোমাকে বলিব যোগ্য-চূড়ামণি। কিন্তু যোগের পাত্র-ভেদ আছে—সেটা ভুলিলে চলিবে না। এই পাত্র-ভেদের ব্যাপারটি চরাচর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া নিরন্তর চলিতেছে, সুতরাং ডারুইনের ন্যায় একজন বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের অনুসন্ধান-চক্ষে তাহা গোপন থাকিতে পারে না। ডারুইন তাহার নাম দিয়াছেন—(Natural selection) নৈসর্গিক পাত্র-নির্ব্বাচন। চোর-ডাকাত প্রভৃতি যে সকল দুষ্টলোক জন-সমাজের যোগ-ভঙ্গ করিতেই সর্ব্বদা তৎপর, তাহারা যোগের অনুপযুক্ত পাত্র। এই জন্য যে রাজা দুষ্টের সহিত যোগযুক্ত হইয়া শিষ্টের নির্যাতন করেন, সে রাজাকে যোগ্য রাজা বলিতে পারা যায় না। ফলেও আমরা সেই রাজাকেই বলি যোগ্য রাজা, যিনি শিষ্টের সহিত যোগযুক্ত হইয়া দুষ্টের দমন করেন। শিষ্টের সহিত যোগই প্রকৃত যোগ। "শিষ্ট" কিনা শেষিত—পরিণত (finished—accomplished)। জ্ঞান-শব্দ হইতে যেমন জ্ঞেয়-শব্দ এবং জ্ঞাত-শব্দ হইয়াছে, শেষ-শব্দ হইতে তেমনি শিষ্য-শব্দ এবং শিষ্ট-শব্দ হইয়াছে। গুরু যাঁহাকে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন—পাকাইয়া তুলিতেছেন—finish করিয়া তুলিতেছেন—শেষিত করিয়া তুলিতেছেন—তিনিই শিষ্য; এবং যিনি শেষিত হইয়াছেন, তিনিই শিষ্ট। শিষ্ট হ'চ্চে finished product of শিক্ষা ("শিক্ষা" অর্থাৎ শেষিত হইবার ইচ্ছা বা চেষ্টা), এবং প্রকারান্তরে finished product of nature। প্রকৃতির গতিই শিষ্টের দিকে—দুষ্টের দিকে নহে; কেন না, দুষ্টেরা কালে আপনাদের দোষেই আপনারা মারা পড়ে। শিষ্টেরাই জনসমাজের যোগবন্ধনের ভিত্তিমূল; শিষ্টের সহিত যোগই প্রকৃত যোগ। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, জন-সমাজে যিনি যে পরিমাণে শিষ্টদিগের সহিত যোগ-ক্ষম, তিনি সেই পরিমাণে যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে:—কথায় বলে, "ঠক বাছিতে গাঁ উজাড়"। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জন-সমাজে কেহ বা বেশী দুষ্ট, কেহ বা কম দুষ্ট; কেহ বা কম শিষ্ট, কেহ বা বেশী শিষ্ট; তা বই, একেবারেই পরম শিষ্ট কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না; এক কথায়—দুষ্ট এবং শিষ্টের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ব্যবধান নাই; ব্যবধান না থাকিবারই কথা; যেহেতু শিষ্ট এবং দুষ্ট, রাম এবং রাবণ, উভয়েই প্রকৃতি-মাতার সন্তান। এমন কি, রাবণ না থাকিলে রামায়ণই হইতে পারিত না। দুষ্ট এবং শিষ্ট দুয়ের মধ্যে যদি অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর থাকিত, তবে চৈতন্য-মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে শিষ্ট করিয়া তুলিতে পারিতেন না। যে রাজা শিষ্টের সহিত যোগযুক্ত হইয়া দুষ্টের দমন করেন, তিনি সুযোগ্য রাজা তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহা অপেক্ষাও যোগ্যতর রাজা যদি থাকেন, তবে তিনি সেই রাজা—যিনি তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না, পরন্তু দুষ্টকে আপন সদ্‌গুণের দৈবী মায়ার প্রভাবে শিষ্ট করিয়া তোলেন। জীবের প্রাণ যেমন নির্জীব অন্নকে সজীব রক্ত করিয়া তোলে—মহাপুরুষদিগের প্রেম এবং দয়া তেমনি অধম পাপীকেও উত্তম সাধু করিয়া তোলে। এ সকল আশপাশের কথা এখন যাইতে দেওয়া হো'ক্। প্রকৃত বক্তব্য যাহা, তাহা এই যে, সীমাবদ্ধ বস্তুগণের মধ্যে, যে বস্তু যে পরিমাণে আপন সীমার বাহিরের বস্তুসকলের সহিত যোগে চলিতে

পারে, সে বস্তু সেই পরিমাণে যোগ্য-শব্দের বাচ্য। মোটামুটি সকলেই জানে যে, তরুলতা অপেক্ষা পশু-পক্ষী, এবং পশু-পক্ষী অপেক্ষা মনুষ্য যোগ্যতর জীব; কিন্তু সেপ্রকার জানা কাজের জানা নহে। স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সকলেই তো যোগ্য; তবে কেন একজনকে বলা হয় যোগ্য, আরেক জনকে বলা হয় অযোগ্য? যে যোগ্য, সে কিসে যোগ্য—ইহার একটা ঠিক্‌ঠাক্ উত্তর দিতে পারা চাই;—তা যদি তুমি না পার, আর, তবুও যদি বল যে, "আমি জানি যে, উদ্ভিদপদার্থ অপেক্ষা অধম-জন্তু এবং অধম-জন্তু অপেক্ষা মনুষ্য যোগ্যতর জীব", তবে সেরূপ জানা বিজ্ঞানের কোনো কার্য্যে আসিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, উদ্ভিদ্‌পদার্থ অপেক্ষা মূঢ়জীব এবং মূঢ়জীব অপেক্ষা মনুষ্য যে কিসের গুণে অধিকতর যোগ্য, তাহার একটি কস্‌টি-পাথর আছে; তাহা ঘষিয়া দেখিলেই—যে যোগ্য, সে কিসে যোগ্য, তাহা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। সে কস্‌টি পাথর যে কি, তাহা বলিতেছি।

সীমাবদ্ধ বস্তু-মাত্রেরই যোগ্যতার অভিজ্ঞান-চিহ্ন বা নিদর্শন কি—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার নিজত্বের সীমাবহির্ভূত বস্তুসকলের সহিত তাহার যোগের দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা একবার ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখ। যাহার যোগের দৌড় আপন শরীরের সীমা ছাড়াইয়া যত বেশীদূর যায়, সে সেই পরিমাণে অধিকতর যোগ্য। উদ্ভিদপদার্থ-সকলের যোগের দৌড় তাহাদের শরীরের সীমা-ঘ্যাঁসা পদার্থ-সকলেতেই পর্য্যাপ্ত; তার সাক্ষী—তাহারা তাহাদের মূলঘ্যাঁসা মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ করে, পত্রঘ্যাঁসা বায়ু হইতে অঙ্গারাদি অন্ন আহরণ করে, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মূঢ়জীবদিগের যোগের দৌড় চলে তাহাদের শরীরের সীমা ছাড়াইয়া তাহার ও-দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত। তার সাক্ষী—মৌমাছিরা থাকে মৌচাকে, মধু অন্বেষণ করে সরোবরের পদ্মবনে। এ বিষয়ে, মনুষ্য এবং নিকৃষ্ট জন্তুদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, আর আর জীবদিগের যোগের দৌড় যতই দূরে প্রসারিত হউক না কেন, তথাপি তাহা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ; মনুষ্যের কিন্তু তাহা নহে; মনুষ্যের যোগের দৌড় কোনোপ্রকার প্রাচারের অবরোধ মানে না; মনুষ্যের যোগের দৌড় আকাশ-পাতাল-ব্যাপী-সমগ্র সত্যে প্রধাবিত হয়; মনুষ্য সমগ্র আত্মার সম্যক্ চরিতার্থতা চায়; তাহারই জন্য "সার সত্যের আলোচনা"। সার সত্যের আলোচনা পশু-পক্ষীদিগের অধিকার-বহির্ভূত।

এখন দেখিতে হইবে এই যে, উদ্ভিদ্‌-পদার্থ-সকলের যোগের নিদান তাহাদের প্রাণ; মূঢ়-জন্তুদিগের যোগের নিদান তাহাদের মন; মনুষ্যের যোগের নিদান তাহার বুদ্ধি। সেই সঙ্গে আর-একটি দেখিতে হইবে এই যে, প্রাণের বিচরণ-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা; মনের বিচরণ-ক্ষেত্র প্রাতিভাসিক সত্তা; বুদ্ধির বিচরণ-ক্ষেত্র বাস্তবিক সত্তা।

পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি—একটা ত্রিকের কথা উঠিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দশটা ত্রিক সারি বাঁধিয়া আসিয়া হুড়াহুড়ি আরম্ভ করে। বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, মনুষ্য, এই ত্রিকটি যেই ডাক শুনিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, আর অমনি ত্রিকের শ্রেণী-পরম্পরা—এটির পশ্চাতে ওটি—ওটির পশ্চাতে সেটি—দেখা দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দেখা দিল—ভোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান; তাহার পরে দেখা দিল—প্রাণ, মন, বুদ্ধি; এখন আবার

আরেক ত্রিক আসিয়া উপস্থিত অব্যক্ত সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা, বাস্তবিক সত্তা। ত্রিকের ভিমরুলের চাকে ঘা দিলে আর নিস্তার নাই। প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, তিনের মধ্যে প্রভেদ কিরূপ সুস্পষ্ট, অথচ একাত্ম-ভাব কিরূপ সুদৃঢ়, তাহা দেখাইবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বাহির হইয়াছিলাম, পথের মাঝখানে ত্রিকের ভিড় সামলাইতে না পারিয়া, সে প্রতিজ্ঞা মূল হইতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। নূতন অভ্যাগত ত্রিকটিকেও সন্তুষ্ট করা চাই এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয়টিরও মীমাংসা করা চাই; দুই কূল রক্ষা করা চাই; তাহারই এখন চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

অভ্যাগত ত্রিক হ'চ্চে—অব্যক্ত সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা, বাস্তবিক সত্তা; অধিবাসী ত্রিক হ'চ্চে—প্রাণ, মন, বুদ্ধি। দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে—এইরূপ ঃ—

জীবের অভ্যন্তরে কার্য্য করিবার সময়, প্রাণ কার্য্য করে অব্যক্ত-ভাবে, মন এবং বুদ্ধি কার্য্য করে ব্যক্ত-ভাবে। শরীরের ভিতরে প্রাণ একাকী একশত ব্যক্তির কার্য্য করে;—অন্ন পরিপাক করে, অন্নের নির্য্যাস রক্তে পরিণত করে, রক্ত শোধন করিয়া তাহাকে দিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মেরামত করাইয়া লয়—ইত্যাদি-প্রকার কত যে কার্য্য করে, তাহার সংখ্যা নাই; অথচ সে সমস্ত কার্য্য এমনি অব্যক্ত-ভাবে নিষ্পাদন করে যে, শরীরের যিনি গৃহস্বামী, তিনি তাহা জানিতেও পারেন না। পক্ষান্তরে, মন যখন লোভের চাবুক কসিয়া জীবকে সম্মুখস্থিত বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত করে, অথবা ভয়ের তাড়া দিয়া সম্মুখস্থিত বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনে, তখন দুইই সে করে ব্যক্ত-ভাবে। বুদ্ধির তো কথাই নাই;—রাজা যখন বুদ্ধিপূর্ব্বক রাজ-কার্য্য নিষ্পাদন করেন, অথবা সেনাপতি যখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ব্যূহ-রচনা করেন, তখন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে সুব্যক্ত-ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রাণ অব্যক্ত সত্তার ভিতরে ডুব দিয়া কার্য্য করে; মন এবং বুদ্ধি উভয়েই ব্যক্ত সত্তার আলোকে বিনির্গত হইয়া কার্য্য করে। বুদ্ধি এবং মন দুয়েরই কার্য্যের সহিত প্রাণের কার্য্যের এ-যেমন প্রভেদ দেখা গেল; বুদ্ধি এবং মনের আপনাদের কার্য্যের মধ্যেও তেমনি আর-এক দিকে আরেক-প্রকার প্রভেদ আছে—সে প্রভেদটিও বিবেচ্য। সে প্রভেদ এইরূপ ঃ—

মনের নিকটে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত বিষয়ই ব্যক্ত হয়; আর, অন্ধ-সংস্কার-সূত্রে উপস্থিত বিষয়ের সহিত অনুপস্থিত বিষয়ের যোগ অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে, বুদ্ধির নিকটে উপস্থিত-এবং-অনুপস্থিত-উভয়-সংবলিত সমগ্র আলোচ্য বিষয় প্রতিভাত হয় এবং (অন্ধ-সংস্কার-সূত্রে নহে, পরন্তু) বাস্তবিক সত্তার বন্ধন-সূত্রে সমস্তের সহিত সমস্তের যোগ অনুভূত হয়। বুদ্ধি এবং মনের মধ্যে এই যে কার্য্যগত প্রভেদ, ইহা একপ্রকার যোগের প্রকার-ভেদ; যথাঃ—

যোগ দুই-প্রকার—(১) প্রতিযোগ এবং (২) সংযোগ। যোজ্য বস্তুর সহিত তাহার অব্যবহিত-পরবর্ত্তী বস্তুর যে যোগ (যেমন পারম্পর্য্য-সূত্রে ক-এর সহিত খ-এর, খ-এর সহিত গ-এর, গ-এর সহিত ঘ-এর যে যোগ), তাহারই নাম প্রতিযোগ; আর মৌলিক-একতা-সূত্রে সমস্তের সহিত সমস্তের যে যোগ (যেমন কণ্ঠ্য-সূত্রে কখগঘঙ এই পাঁচটি বর্ণের সকলের সহিত সকলের যোগ),

তাহারই নাম সংযোগ। এখন আমি দেখাইতে চাই এই যে, মন প্রতিযোগ-তরঙ্গের ধাক্কায় ধাক্কায় গম্যপথে অগ্রসর হয়, বুদ্ধি সংযোগ-সূত্রে অগ্রপশ্চাৎ বেষ্টন করিয়া পরিধি-পরম্পরা-ক্রমে গম্যপথে অগ্রসর হয়।

মনে কর, আমি বিদেশে একটা বৃহৎ পান্থশালায় দুই-চারি-দিন-মাত্র বাস করিয়াছি। পরদিন প্রাতঃকালে আমি নগর-পর্য্যটন করিয়া যখন সেই পান্থশালার দ্বারদেশে উপনীত হইলাম, তখন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না—সকলেই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গিয়াছে। পান্থশালার প্রাঙ্গণের দশদিক্ দিয়া দশটা সুঁড়ি পথ গিয়াছে; কোন্ পথটা আমার ঘরে পৌঁছিবার পথ, তাহা ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। একদিকের একটা পথ ধরিয়া চলিয়া আমার ঘরে যাইবার সিঁড়ি দেখিতে পাইলাম। সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে তো উঠিলাম, কিন্তু আমার বামে একটা এবং আমার ডাহিনে একটা, দুই দিকে দুইটা বারাণ্ডা রহিয়াছে—কোন্‌টা আমার ঘরের পাশের বারাণ্ডা, তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ব্যাকুলভাবে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছি, ইতিমধ্যে—বামদিকের বারান্দার এক কোণে একটা প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে—তাহার প্রতি আমার চক্ষু পড়িল; চক্ষু পড়িবামাত্র আমার মনে হইল যে, আমার ঘরের দ্বারের একপার্শ্বে একটা শ্বেত-প্রস্তরের মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে যেন আমি দেখিয়াছি। তখন আমি সেই প্রস্তরমূর্ত্তিটির সন্নিধানবর্ত্তী একটি দ্বারে উঁকি দিবামাত্র দেখিতে পাইলাম যে, আমার ঘরের জিনিসপত্র যেখানকার যাহা, সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্ সাজানো রহিয়াছে। সিঁড়ি আমাকে বারাণ্ডায় পৌঁছাইয়া দিল, বারাণ্ডা আমাকে প্রস্তরমূর্ত্তিতে পৌঁছাইয়া দিল, প্রস্তরমূর্ত্তি আমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। ক আমাকে খ-এ পৌঁছাইয়া দিল, খ আমাকে গ-এ পৌঁছাইয়া দিল, গ আমাকে ঘ-এ পৌঁছাইয়া দিল। এইরূপ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নিরপেক্ষ উত্তরোত্তর ক্রমই মনের ক্রম। "পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নিরপেক্ষ" অর্থাৎ যখন আমি খ-এ পৌঁছিলাম, তখন খ-এর প্রতিযোগে আমার মনে গ যেমনি আবির্ভূত হইল, ক অমনি মন হইতে তিরোভূত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী ক আমার মন হইতে সরিয়া পলাইল, উত্তরবর্ত্তী গ আসিয়া তাহার স্থানে জুড়িয়া বসিল; ইহারই নাম পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-নিরপেক্ষ উত্তরোত্তর ক্রম। বুদ্ধির ক্রম কিন্তু আর-এক-প্রকার; সে ক্রমের নাম দেওয়া যাইতে পারে—যুক্তিপূর্ব্বক বিচরণ-পদ্ধতি বা বিচার-পদ্ধতি। বিচার-পদ্ধতি আর কিছু না—অগ্র-পশ্চাতের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া পরপরবর্ত্তী পথে পা-বাড়ানো। পান্থশালার যিনি কর্ত্তা, তাঁহার মনোমধ্যে পান্থশালার কোথায় কোন্ ঘর, কোথায় যাইবার কোন্ পথ, সমস্তই নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; কাজেই, তিনি যখন পান্থশালার কার্য্যালয় হইতে ভোজনালয়ে গমন করেন—তখন সমস্ত পান্থশালার সমস্ত-ঘরের-সহিত সমস্ত-ঘরের কিরূপ যোগাযোগ, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সমস্তের মধ্য হইতে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ বাছিয়া ল'ন, এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া গম্যস্থানে উপনীত হ'ন। পাঠশালার একটি কচি বালককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, গএর পরে কোন্ অক্ষর, তবে সে তৎক্ষণাৎ বলিবে ঘ; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কবর্গের চতুর্থ বর্ণ কি? তবে সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। এরূপ যে হয়, তাহার কারণ কি? কারণ অতীব সুস্পষ্ট—বালকটির বুদ্ধি এখনো পরিস্ফুট হয় নাই। ক বলিলে তাহার মনে খ আসিয়া

পড়ে, খ বলিলে গ আসিয়া পড়ে, গ বলিলে ঘ আসিয়া পড়ে; প্রথমের প্রতিযোগে দ্বিতীয় আসিয়া পড়ে, দ্বিতীয়ের প্রতিযোগে তৃতীয় আসিয়া পড়ে, ইত্যাদি; তা বই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সমস্তের মোট বাঁধিয়া যে একটা বর্গ হয়,—ক-বর্গ হয়; আর, ঘ যে সেই ক-বর্গের চতুর্থ বর্ণ; এরূপ যুক্তিমূলক বিচার একটি কচি-বালকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করাই পাগলামি। ক হইতে খ, খ হইতে গ, গ হইতে ঘ, এইরূপ করিয়া মন যখন উপস্থিত বিষয় হইতে অনুপস্থিত বিষয়ে প্রধাবিত হয়, তখন উপস্থিত বিষয়ের ভাবের টানে অনুপস্থিত বিষয়ের ভাব মনোমধ্যে আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে; আর, ভাবের পশ্চাতে ভাবের সমাগম যাহা ঐরূপে সংঘটিত হয়, তাহার দার্শনিক নাম ভাবের অনুবন্ধিতা অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে association of ideas। স্বপ্নের মনোরাজ্যে ভাবের অনুবন্ধিতাই সমস্ত প্রাতিভাসিক দৃশ্যের মূল উৎস। জাগ্রৎকালে নির্দ্দিষ্ট পথ অতিবাহন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছিতে হয়; স্বপ্নকালে তাহার কিছুই করিতে হয় না; স্বপ্নের অনুজ্ঞা হইলে যে-সে পথ দিয়া যেখানে-সেখানে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। হনুমানের নিকট হইতে রামচন্দ্র যে-দিন অশোকবনের সংবাদ শুনিলেন, খুব সম্ভব যে, সে-দিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্নযোগে অশোকবনে সীতার দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন; তখন সমুদ্রে সেতু বাঁধিবার জন্য তাঁহাকে একমুহূর্ত্তও উপায়-চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইতে হয় নাই। এইখানে জাগ্রৎকালের বাস্তবিক সত্তা এবং স্বপ্নের প্রাতিভাসিক সত্তা, দুয়ের প্রভেদ স্পষ্ট ধরা পড়িতেছে। বাস্তবিক সত্তার রাজ্যে বস্তুসকলের সংযোগের ব্যবস্থা অতীব সুনির্দ্দিষ্ট; ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইবার পথ অতীব সুনির্দ্দিষ্ট; পৃথিবী হইতে সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থসকলের দূরত্ব অতীব সুনির্দ্দিষ্ট; কার্য্য-কারণের পারম্পর্য্য-শৃঙ্খলা অতীব সুনির্দ্দিষ্ট; সহযোগী বস্তুসকলের পরস্পরের সহিত পরস্পরের বাধ্যবাধকতা অতীব সুনির্দ্দিষ্ট। পক্ষান্তরে, স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজ্যে দেশকালঘটিত দূরত্ব-নিকটত্বেরও কোনো ঠিকানা নাই—দিক্‌বিদিকেরও কোনো ঠিকানা নাই—কার্য্যকারণের যোগ্যাযোগ্যতারও কোনো ঠিকানা নাই; স্বপ্নের প্রাতিভাসিক রাজ্যে সবই সব-স্থানে সম্ভবে—পঙ্গুকর্ত্তৃক গিরিলঙ্ঘন সম্ভবে, মরুভূমিতে উৎসের উৎসারণ সম্ভবে; সব-কার্য্যই সব-কারণে সম্ভবে; জোনাকপোকার মশালে অরণ্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, ভেক হস্তীকে গিলিয়া খাইতে পারে। অতএব এটা স্থির যে, যে-রাজ্যে দিক্-বিদিকের ঠিকানা আছে, যে-রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেশের ব্যবধান সুনির্দ্দিষ্ট; যে-রাজ্যে প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে কালের ব্যবধান সুনির্দ্দিষ্ট; যে-রাজ্যে কার্য্য-কারণ-প্রবাহের পারম্পর্য্য-ব্যবস্থা সুনির্দ্দিষ্ট; যে-রাজ্যে বিভিন্ন বস্তুসকলের পরস্পর বাধ্যবাধকতা সুনির্দ্দিষ্ট; সেই রাজ্যই বাস্তবিক সত্তার রাজ্য; আর, সেই বাস্তবিক সত্তার রাজ্যই বুদ্ধির বিচরণ-ভূমি। বিচরণ-ভূমি এবং বিচার-ভূমি—এই দুই শব্দের একই অর্থ। ঐ যে বাস্তবিক সত্তা—যাহা বুদ্ধির বিচারভূমি—তাহা একই অদ্বিতীয় সত্যের বিশ্বব্যাপী বন্ধন-সূত্র। দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে, যেখানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তই ঐ একই বন্ধন-সূত্রের টানে পরস্পরের সহিত

যোগে বিধৃত রহিয়াছে। পান্থশালার গৃহস্বামীর মনোমধ্যে যেমন পান্থশালার কোথায় কোন্ ঘর, কোথায় কোন্ পথ, কোথায় কোন্ কার্য্যশালা, সমস্তই নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; এক অদ্বিতীয় সত্যে সেইরূপ সমস্ত বস্তুর সংযোগ-ব্যবস্থা নখদর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে; সে সংযোগ-ব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি সুনির্দ্দিষ্ট এবং পরিপাটী; তাহা নিয়তির বন্ধন; তাহার একচুলও এদিক্-ওদিক্ হইবার নহে। শাস্ত্রে যে বলে—"বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি", তাহার অর্থই ঐ। নিশ্চয়াত্মিকা-শব্দের অর্থই হ'চ্চে—বাস্তবিক-সত্তা-মূলক সংযোগ-ব্যবস্থার নিশ্চয়ীকরণ তাহার মুখ্যতম কার্য্য। বুদ্ধি যখন নিশ্চয় করে যে, ইহা মৃত্তিকা, ইহা জল, ইহা বায়ু ইত্যাদি, তখন প্রত্যেক নিশ্চয়-ক্রিয়ার সঙ্গে এই একটি মৌলিক নিশ্চয়-ক্রিয়া জোড়া-লাগানো থাকে যে, ইহা বাস্তবিক পদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, সত্য-নিশ্চয়ই গোড়া'র নিশ্চয়, পরম নিশ্চয়, এবং চরম নিশ্চয়। পুনশ্চ, শাস্ত্রে বলে যে, মন সংকল্প-বিকল্পাত্মক। সংকল্প-বিকল্প কি? না, কল্পনা-বিকল্পনা। ভাবনা-বিভাবনাও তাহারই নামান্তর। বর্ত্তমান প্রবন্ধের গোড়া'তেই বলিয়াছি যে, ভাবন-শব্দ ভূ-ধাতু হইতে হইয়াছে—তাহার অর্থ হওয়ানো। মনোমধ্যে ধ্যেয় বস্তু হওয়ানো, মনোমধ্যে ধ্যেয় বস্তু গড়িয়া তোলা, মনোমধ্যে ধ্যেয় বস্তু কল্পনা করা, একই কথা। সংকল্প-বিকল্প আর কিছু না—মনোমধ্যে ভাবের তরঙ্গভঙ্গ। বুদ্ধির সত্য-নির্ণয় বাস্তবিক-সত্তা-মূলক-সংযোগ-প্রধান; মনের সংকল্প-বিকল্প কবিতাচ্ছন্দের লঘু-গুরু মাত্রার ন্যায় প্রতিযোগ-প্রধান; আর সেই প্রতিযোগের মূল প্রবর্ত্তক হ'চ্চে—ভাবের অনুবন্ধিতা (association of ideas)। স্বপ্নে এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র নহে যে, এই আমি উদ্যানে বসিয়া পক্ষীর কলরব শুনিতেছি, পরক্ষণেই উদ্যান অরণ্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিল এবং তাহার মধ্য হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। উদ্যান ভাঙ্গিয়া গেল, অরণ্য গঠিত হইয়া উঠিল। এইরূপ ভাঙন-গড়নই সংকল্প-বিকল্প এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতিযোগী।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদ খুবই স্পষ্ট। প্রাণের সহিত মনোবুদ্ধির প্রভেদ এই যে, প্রাণ অব্যক্ত সত্তায় ব্যাপৃত হয়—প্রাণের ব্যাপার-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা। মন এবং বুদ্ধি উভয়েরই ব্যাপার-ক্ষেত্র ব্যক্ত সত্তা। ব্যক্ত সত্তা আবার দুই থাকে বিভক্ত—(১) প্রাতিভাসিক সত্তা এবং (২) বাস্তবিক সত্তা। মনের ব্যাপার-ক্ষেত্র প্রাতিভাসিক সত্তা; বুদ্ধির ব্যাপার-ক্ষেত্র বাস্তবিক সত্তা। যাহা বাস্তবিক, তাহা আদ্যোপান্ত সবটা ধরিয়া বাস্তবিক। একটা কাগজ তাহার এ-পিট ও-পিট এবং চারিধার সবটা ধরিয়া বাস্তবিক-কাগজ। পক্ষান্তরে, ও-পিটের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত এ-পিট, এবং দু-পিটের সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত চারিধার, দুইই অবাস্তবিক। "বুদ্ধিতে বাস্তবিক সত্তা প্রকাশ পায়", এ কথার অর্থ এই যে, বুদ্ধিতে আলোচ্য-বিষয়ের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সবটা এক-যোগে প্রকাশ পায়, আর সেই সঙ্গে কেন্দ্র, পরিধি এবং অরাবলী (radii) প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সংযোগের ব্যবস্থা, তাহাও প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, মন যখন এ-পিটে ব্যাপৃত হয়, তখন ও-পিটের কোনো তোয়াক্কা রাখে না। মন যখন যে-পিটে ব্যাপৃত হয়, তখন সেই পিটের প্রাতিভাসিক সত্তাই তাহার নিকটে ব্যক্ত

হয়। মন প্রাতিভাসিক সত্য লইয়া—ঐকাংশিক সত্য লইয়া—এক-পিট লইয়া কারবার করে। এইজন্য মন এ-পিট হইতে ও-পিটে, ও-পিট হইতে চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়, ক হইতে খ-এ, খ হইতে গ-এ ঘুরিয়া বেড়ায়। মন সর্ব্বদাই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়; বিক্ষিপ্ত হইবারই কথা—কেন না, কোনো আংশিক সত্যই আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে। মন এলোমেলো ভাবনার তরঙ্গে এরূপ অষ্টপ্রহর তরঙ্গিত হয় যে, একদণ্ডও তাহাকে দেখিলাম না যে, সে নিজ নিকেতনে ভরপূর জমাট্ বাঁধিয়া বসিয়া আছে। জমাট্ ভাব সমাহিত ভাব, বা সমাধি, পরিপক্ক বুদ্ধির লক্ষণ—প্রজ্ঞার লক্ষণ। এক অদ্বিতীয় বাস্তবিক সত্যের বাহিরে দ্বিতীয় কিছুই নাই; কাজেই, প্রজ্ঞা যখন কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সবটা ধরিয়া সমগ্র বাস্তবিক সত্যে ব্যাপৃত হয়; তখন সে-সত্য হইতে সে যে পদস্খলিত হইয়া তাহার বাহিরে পড়িয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা থাকে না; কেন না, যাহার বাহিরই নাই, তাহার বাহিরে পড়িবে কিরূপে? মন আংশিক সত্য লইয়া কারবার করে, এইজন্যই ভাবের অনুবন্ধিতা (association of ideas) তাহাকে মায়া-রজ্জুতে বাঁধিয়া ক হইতে খ-এ, খ হইতে গ-এ, গ হইতে ঘ-এ ক্রমাগতই ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়।

এই তো গেল, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, এই তিনের মধ্যেকার প্রভেদ। তিনের মধ্যে একাত্মভাব কিরূপ, তাহা বারান্তরে আলোচনার জন্য রহিল।

দুঃখারণ্য।

(ফরাসী হইতে)

শীতকালের সায়াহ্ন। দারুণ শীত। একটি যুবা পুরুষ কোন এক অরণ্যে প্রবেশ করিল। অরণ্যের দৃশ্যটি এরূপ যে দেখিলেই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।

বড় বড় গাছ; গাছের ছাল হল্‌দে হইয়া গিয়াছে; ডালে পাতা নাই; ইতস্তত গুল্মের ঝাড়,—ঝাড়ের পাদমূল কণ্টকাকীর্ণ; আঁকাবাঁকা পথ, খোঁচা-খাঁচা পাথরে আচ্ছন্ন; জটিল সূতার জালের ন্যায় পথগুলি কোথাও বা বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারিত, কোথাও বা আবার একত্র মিলিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কাঁটাগাছের বন। ইহা-ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যায় না।

সেই যুবক দ্রুতপদে চলিতেছিল; একটা কোন গাঢ় চিন্তায় যেন তার ললাটদেশ তমসাচ্ছন্ন। সে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই বৃক্ষগুলি আরও ঘন-সংলগ্ন এবং পথগুলিও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আসিতেছে। কিন্তু গাঢ় চিন্তায় এরূপ মগ্ন যে, ইহা সে জানিতেও পারিতেছে না।

পথের জটিলতা হইতে বাহির হইতে না পারিয়া অবশেষে সে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। সেইখানেই সে অনেক ক্ষণ রহিল। কেন না, শীতে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হওয়ায়, চলিবারও আর শক্তি ছিল না; এ দিকে আবার ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিতেছিল।

সহসা তাহার মুখ হইতে কষ্টের তীব্র চীৎকার বহির্গত হওয়ায় সুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল।

মাথা তুলিয়া দেখিল, তিন জন লোক তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তারা কোথা হইতে আসিল, কখন আসিল, সে কিছুই জানিতে পারে নাই।

দেখিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। সেই

তিন জনের দৃষ্টি তাহার দৃষ্টির উপর দৃঢ় নিবদ্ধ।

একজনের কিংখাপের জামাজোড়া পরা'; কোমরে কোমরবন্দ হীরক-খচিত আঁক্‌ড়া দিয়া আবদ্ধ—হীরকগুলি জোনাকির ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তাহার পার্শ্বদেশ হইতে একটি তলোয়ার লম্বমান।

দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচ্ছদ কৃষ্ণবর্ণ ও কোমরবন্দটি লাল।

তৃতীয় ব্যক্তির গায়ে নীল রঙের চাপকান ও কোমরে চামড়ার কোমরবন্দ। হাতে একটা কুঠার; সেই কুঠার-দণ্ডের উপর ভর দিয়া সে দণ্ডায়মান।

"এখানে কি করচিস্" ?—তিনজনই সমস্বরে বলিয়া উঠিল।

—"আমি বড় কষ্ট পাচ্চি, তোমরা আমার প্রতি দয়া কর"।

—"কি চা'স্ তুই" ?

—"এই ভীষণ অরণ্য থেকে, যত শীঘ্র পারি, বেরিয়ে যেতে চাই"।

—"আচ্ছা তাহ'লে, আমাদের মধ্য হতে একজনকে বেছে নেও; তুমি যাকে বেছে নেবে সেই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কেন না, একজন পথপ্রদর্শক তো চাই"।

ঐ যুবাপুরুষটি তিনজনকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, তিনজনই নিস্তব্ধ ভাবে তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিল। যুবকের দৃষ্টি অবশেষে সেই কিংখাপের জামাজোড়া-পরা' লোকটির উপর পতিত হইল; কেন না তার সেই কোমরবন্দের আঁকড়াটি হইতে দীপ্তিচ্ছটা বাহির হইয়া সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত হইতেছিল।

—"আচ্ছা তোমাকেই আমি বেছে নিলেম"।

তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তির শীতল ওষ্ঠাধরের উপর দিয়া একটা হাসির রেখা চলিয়া গেল। সে যুবকের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল; আর, অমনি সেই সময়ে অপর দুই ব্যক্তি স্বপ্নের ন্যায় সহসা অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

যুবা পুরুষ আতঙ্কে হতবাক্ হইয়া পথপ্রদর্শকের হস্ত ধারণ করিল এবং দুই জনে একসঙ্গে চলিতে লাগিল।

ওঃ! সে কি দ্রুতগতি! মনে হইল যেন, গাছগুলা পশ্চাতে দৌড়িয়া পলাইতেছে। তাহাদের পদশব্দেও চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তথাপি, এক ঘণ্টা কাল পরে দেখিল, তখনও তাহারা সেই অরণ্যেই রহিয়াছে।

"ওঃ! আমি ভয়ানক শ্রান্ত" !—একটা চৌমাথা পথের মধ্যে থামিয়া যুবকটি এইকথা বলিয়া উঠিল। ঐ পথটিতে আরও অনেকগুলি পথ মিশিয়াছে।

"এই পথে এখনও অনেক দূর যেতে হবে; আমাদের পা যেরূপ দুর্ব্বল, তাতে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু এখনি একজন অশ্বারোহী পথিক এই দিক্ দিয়ে যাবে। এই তলোয়ার লও; যেমনি সে তোমার কাছ দিয়ে যাবে অমনি তলোয়ারটা তার বুকে বসিয়ে দেবে। তার পর, তার ঘোড়াটা ধরে' আমরা তার উপর চড়ে' চলে যাব"।

—"কি ভয়ানক! তুমি যে আমাকে এইরূপ পরামর্শ দিচ্চ, তুমি কে বল দিকি" ?

সেই অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, আমি মহাপাপ।

যুবক মাটির উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল: "দূর হ'! দূর হ'!"

সেই সময়ে একটা বিকট নারকী হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। যুবা পুরুষ এখন একাকী। পরে উঠিয়া দেখিল, অন্য দুই ব্যক্তি

তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাহারা বলিল :

"তুই এখানে কি করচিস্" ?

—"বড় কষ্ট পাচ্চি, আমার উপর তোমরা সদয় হও"।

—"কি চা'স্ তুই" ?

—"এই দুস্তর অরণ্য থেকে, যত শীঘ্র পারি, বেরিয়ে যেতে চাই"।

—"আচ্ছা তাহ'লে আমাদের মধ্য হতে একজনকে বেছে নেও। তুমি যাকে নেবে সেই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কেন না, একজন পথপ্রদর্শক তো চাই"।

দুই জনের মধ্যে সেই কালো পোষাক ও লাল কোমরবন্দ-পরা' লোকটিকে নির্দ্দেশ করিয়া যুবক বলিল :

"আচ্ছা, তোমাকেই আমি বেছে নিলেম।"

তখন, অপরিচিত ব্যক্তি কোন কথা না বলিয়া, একটু হাসিয়া যুবকের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। ইতিমধ্যে তাহার অন্য সঙ্গীটি অদৃশ্য হইল।

আতঙ্কে হতবাক্ হইয়া যুবক তাহার পথপ্রদর্শকের হস্ত অবলম্বন করিল। দুই জনে আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

একঘণ্টা কাল চলিয়া একটা গহ্বরের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গহ্বর হইতে দারুণ আর্ত্তনাদ ও মর্ম্মভেদী ক্রন্দন শ্রুত হইল।

—"ওঃ! আমি ভয়ানক শ্রান্ত"—এই কথা যুবক অস্ফুটস্বরে বলিল।

—"এখনও এই পথে অনেক দূর যেতে হবে। আমাদের পা যেরূপ দুর্ব্বল, তাতে শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছন অসম্ভব। তাই, তোমাকে এখানে এনেছি যে মৃত্যু তোমাকে সকল যন্ত্রণা হতে মুক্ত করবেন"।

—"কি ভয়ানক! আমাকে যে তুমি এইরূপ পরামর্শ দিচ্চ, তুমি কে বল দিকি" ?—অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিল :—আমি নৈরাশ্য।

মাটির উপর হুমৃড়ি খাইয়া পড়িয়া যুবক বলিয়া উঠিল :—"দূর হ'! দূর হ'!"

একটা বিকট নারকী হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। যুবক এখন একাকী।

পরে মাথা তুলিয়া দেখিল, সেই তৃতীয় ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান। অন্য দুই ব্যক্তির নাম তখন মনে পড়ায়, যুবক পলাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু ঐ তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তি তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিল।

—"আমার সঙ্গে এসো। এখনও এই পথে অনেক দূর যেতে হবে। কিন্তু মানুষ যখন কষ্ট পায় ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য করেন"।

যুবক তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। সে তখন হাত বাড়াইয়া দিল। অপরিচিত ব্যক্তি তাহার আগে-আগে এক-এক-পা অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পরে, তাহার সেই কুঠার দিয়া, সম্মুখের পথরোধী গাছগুলি কাটিতে কাটিতে, নূতন পথ করিয়া চলিতে লাগিল। পরে যুবককে বলিল :—

—"এই একটা গাছ কাঁধে করিয়া চল"।

যুবক তাহাই করিল। যদিও খুব শ্রান্ত হইয়াছিল, তথাপি গাছের ভার বড় একটা অনুভব করিল না।

ঐ কুঠার দিয়া আঘাত করিতে করিতে, অপরিচিত ব্যক্তি, যুবক কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া, অরণ্যের প্রান্তভাগে আসিয়া উপনীত হইল। এক্ষণে, তাহাদের সম্মুখে একটা বিস্তৃত ময়দান প্রসারিত হইল—তাহার মধ্যে একটি দুর্গভবন।

তখন অপরিচিত ব্যক্তি যুবককে বলিল,

—"যে অরণ্য তুমি পার হয়ে এলে, তার নাম দুঃখারণ্য। এই নামটি যেন স্মরণ

থাকে। এখন কাঁধের বোঝাটা নাবিয়ে ফেল।”

যুবক বৃক্ষটা স্কন্ধ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। পতিত হইবা মাত্র ঐ বৃক্ষকাণ্ড এক সুদীর্ঘ স্বর্ণদণ্ডে পরিণত হইল। যুবক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল:—

—“আপনি যে আমাকে এরূপ সুপরামর্শ দিয়াছেন, বলুন দিকি আপনি কে?”

সেই অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিলঃ—“আমি কর্ত্তব্যসাধন।

শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন।

৭ই পৌষ।

বহু বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেব পৌষের ৭ম দিনে দীক্ষিত হইয়া সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; সুতরাং ঐদিন ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর স্মরণীয় পুণ্যদিন। প্রতি বৎসরেই এই দিনের পুণ্য প্রত্যুষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উষাকীর্ত্তন সম্প্রদায় ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে মহর্ষিদেবের বাটীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন। এইবার ৬ই পৌষের নিশীথ রাত্রি হইতে অবিশ্রাম ধারাসম্পাত হইতে লাগিল, রাজপথগুলি নিতান্ত পঙ্কিল ও শীত অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, বেগে উত্তরের বাতাস বহিতেছে; কাজেই পথ চলা বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠায় ভক্তদলের আগমন বিষয়ে আমরা সন্দিহান হইতে ছিলাম, এমন সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্তেও এই দুর্দ্দিনে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চিরপরিচিত নিষ্ঠার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। দেখিতে দেখিতে আরও অনেক যুবক উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য বারের তুলনায় লোকসংখ্যা যদিও নিতান্তই অল্প হইয়াছিল, তথাপি উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগ এই পুণ্য স্মৃতির দিনকে মধুময় করিয়াছিল। প্রতি বৎসরের ন্যায় সমবেত ভক্তমণ্ডলী মহর্ষিদেবের দীক্ষা উপলক্ষ্যে বিশেষ উপাসনাদি সমাপ্ত করিয়া তৃতীয় তলে গিয়া শ্রীমন্মহর্ষিদেবের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক উপবেশন করিলে তাঁহারা যে এই দুর্দ্দিনের বাধা অতিক্রম করিয়া এই ভয়ঙ্কর শীতের প্রভাত বেলায় অক্লান্ত উৎসাহে ব্রহ্মনাম প্রচার ব্রহ্মমহিমা কীর্ত্তনে আসিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ মহর্ষিদেব অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সময়োপযোগী একটি ব্রহ্মসঙ্গীত উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া সেই সর্ব্ব-ভয়-দুঃখহারী ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতি অচল ভক্তি ও ধর্ম্মকর্ম্মে অটল নিষ্ঠা এইরূপে বদ্ধমূল করিতে উপদেশ দিয়া সকলের কল্যাণ কামনা করিলেন। তৎপরে সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শান্তিনিকেতনে দ্বাদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

এবারে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মোৎসবে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। আকাশ যদিও মেঘাচ্ছন্ন ছিল কিন্তু কোনও ক্ষতি হয় নাই। স্থানীয় লোক পূর্ব্ববৎ বহুল পরিমাণে আসিয়াছিল। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর ত্রৈলোক্য বাবু দলবলসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে সপ্তপর্ণমূলে যান এবং তথায় বিশেষ উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করেন। সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। নানা রূপ বাদ্য বাজিয়াছিল, যাত্রা হইয়াছিল। মেলাস্থানে নানারূপ দ্রব্যাদি আইসে। সমস্ত দিন লোকের ভিড় ও ক্রয় বিক্রয়

চলিয়াছিল। স্থানীয় বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তন, ভোজ্যদান প্রভৃতি পূর্ব্ববৎই হইয়াছিল। রাত্রিকালের উপাসনায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী সুমধুর বক্তৃতা করিয়া লোকের চিত্ত আর্দ্র করিয়াছিলেন। সঙ্গীতাদি শুনিয়া সকলেই প্রীত হন। উপাসনান্তে পূর্ব্ববৎ নানারূপ বাজী হইয়াছিল। ফলত ৭ই পৌষের ব্রহ্মোৎসবে কোন অঙ্গে কিছুই ত্রুটি হয় নাই। দ্বিপেন্দ্র বাবুর ব্যবস্থায় সমস্তই সুচারু রূপে নির্বাহ হইয়াছিল। প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় যে উদ্বোধন করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

ঈশ্বরের জ্বলন্ত আবির্ভাব কোথায় গেলে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, তাহার উত্তরে অনেকে বলিতে চাহেন, যদি তাঁহার দর্শনের প্রয়াসী হও, যদি আত্মার মধ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থ্য জন্মিয়া না থাকে, তবে যাও একবার হিমালয়শিখরে, যাও সাগরসঙ্গমে, যাও বিশাল বারিধিকূলে, যাও নির্ঝরিণী সমীপে। সহস্র বক্তৃতা শ্রবণে যাহা না হইবে, হিমাচলের গাম্ভীর্য্য দর্শনে হৃদয়ের সে কুটিলতা সে ক্ষুদ্রতা অপসারিত হইবে। মহাসমুদ্রে গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জনে বৈরাগ্যের ভাব আপনা হইতেই জাগিয়া উঠিবে। বারিধির উদ্দাম নৃত্যে ঈশ্বরের ভীম ও কান্ত ভাবের পরিচয় মিলিবে। নির্ঝরিণীর কলকল নিনাদে অন্তরের উদ্দাম ভাব সকল আপনা হইতেই উপশান্ত হইবে, আত্মা সহজেই ঈশ্বরের অভিমুখীন হইবে। এই পবিত্র শান্তিনিকেতনে আসিলে অন্তরে কেন এক ঘোর পরিবর্ত্তনের ভাব সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিব, ঈশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত জাগ্রত জীবন্ত সত্তা যাহা এই বিশাল প্রান্তর ভেদ করিয়া জাগিতেছে, রক্তারুণের প্রাণদ রশ্মি যাহা এই উপাসনামণ্ডপের স্বচ্ছ-পরিধি ভেদ করিয়া তাঁহার অজেয় শক্তি সামর্থ্য ও করুণার পরিচয় দিতেছে। পরক্ষণেই যখন আবার মনে হয়, মহর্ষি-জীবনের কয়েক অধ্যায় এখানে নির্জ্জন-সমাধিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তখন হৃদয় সহজেই স্তব্ধ-পুলকে পরিপূরিত হয়।

আজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন! শুভদিনে শুভক্ষণে এই পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যদি সেই দেবাধিদেব পরমদেবের দর্শন না পাই, এত অনুকূল অবস্থার মধ্যে যদি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার না ঘটে, তবে জানি না আর কোথায় গিয়া সেই জগজ্জননীর পরিচয় পাইব। উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে প্রকৃতির ক্রোড়ে সাধকের স্মৃতিমণ্ডিত সাধনক্ষেত্রে আসিয়া আজ তাঁহার স্বরূপ অন্তরে বাহিরে অনুভব কর। উপাসনার পূর্ব্বে সাধনের বল তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিয়া লও, সিদ্ধি লাভের জন্য তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে কর-যোড়ে দণ্ডায়মান হও, ঋষিমন্ত্রে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া অক্ষয় অনন্ত ফল লাভ কর।

সংকীর্ত্তন।

(খয়রা)

এস ভাই, চল যাই, সবে মিলে শান্তি
নিকেতনে।
মাতি দয়াময় হরি নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
মরণের পরপারে, সে অমর ধামরে
যেখানে অমর বৃন্দ গায় ব্রহ্মনাম রে
(সুমধুর স্বরে,—প্রেমানন্দ ভরে,—
যোগানন্দ ভরে)

যথা নাহি হিংসা দ্বেষ, ভেদাভেদ জ্ঞান রে
পরস্পরে করে প্রেম আলিঙ্গন দান রে
(মিলে প্রাণে প্রাণে)
(খেমটা)
ব্রহ্মানন্দ সুধারস কর পান (ও ভাই)
হেরি চিদানন্দ ঘনরূপ প্রাণারাম।
(হিয়ার মাঝারে)
সব দুখ দূরে যাবে জুড়াইবে প্রাণ।
(নামামৃত পানে রে)
(দোলোন)
দুদিনের তরে এসে, সংসার বিদেশে,
মিছা বাদ বিবাদে আর কাজ নাই।
এক মায়ের ছেলে, আমরা সকলে,
তাঁর প্রেমে গ'লে এক হোয়ে যাই
দয়াময় দয়াময় বল অবিরাম।
(কাটা সন্তাল)
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্ পথের সম্বল রে।
সদা বল বলরে।
বিচারে কি ফল বল রে। বল বল।
জীবন্ হবে সফল রে। বল বল।

রাজনীতি সংগ্রহ।

আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই চার বিদ্যা লোকস্থিতির হেতু। তন্মধ্যে ত্রয়ীই সর্ব্বপ্রধান অপর তিনটী তাহারই বিভাগমাত্র। লোক সকল অর্থপ্রধান সেই জন্য বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি জনসমাজের বিশেষ উপযোগী। শুক্রাচার্য্য বলেন দণ্ডনীতিই একমাত্র বিদ্যা, ইহা হইতেই অন্যান্য বিদ্যার আরম্ভ হইয়া থাকে। আন্বীক্ষিকী আত্মবিজ্ঞান, ত্রয়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম, বার্ত্তা অর্থ ও অনর্থ এবং দণ্ডনীতি নয় ও অনয় শিক্ষা দেয়। আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও বার্ত্তা এই তিনটী অবশ্যই সৎ বিদ্যা কিন্তু দণ্ডনীতির ব্যতিক্রম ঘটিলে ইহারা তাদৃশ ফলোপধায়ক হয় না। যখন রাজা এই দণ্ডনীতিকে সম্যক্ রক্ষা করেন তখনই অবশিষ্ট বিদ্যা, সকলের নিকট সুপ্রসন্ন হন। সমস্ত বর্ণ ও বর্ণাশ্রম এই সমস্ত বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত, রাজা তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও রক্ষাহেতু বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অংশভাগী হইয়া থাকেন। কোন্‌টী সুখ কোন্‌টী দুঃখ ইহা সম্যক্ বিচার করে এই জন্য আন্বীক্ষিকী। ইহা দ্বারা তত্ত্ব আলোচনা করিলে হর্ষ শোক অতিক্রম করা যায়। ঋক্ যজু ও সাম এই তিনের নাম ত্রয়ী। ইহার সম্যক্ আলোচনায় উভয় লোকেই সুখ লাভ হইয়া থাকে। বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ সমস্তই এই ত্রয়ী। পাশুপাল্য, কৃষি ও পণ্য বার্ত্তার অধিকারভুক্ত। যিনি ইহার অনুসরণ করেন তাঁহার জীবিকা অব্যাঘাতে চলে। দমন কিনা দণ্ড, তাহার নয়ন এই অর্থে দণ্ডনীতি নাম হইয়াছে। রাজা ইহার যথাযথ প্রয়োগ করিয়া অবশিষ্ট বিদ্যাকে রক্ষা করিবেন। এই সমস্ত বিদ্যাই লোকোপকারিণী, ইহার রক্ষকই একমাত্র রাজা।

অধ্যয়ন দানাদি ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। তন্মধ্যে পঠন পাঠন, বিশুদ্ধপ্রতিগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মণের বৃত্তি। প্রাণিরক্ষণ রাজার বৃত্তি। কৃষি, পাশুপাল্য ও পণ্য বৈশ্যের বৃত্তি। এবং শূদ্রের কারুকার্য্যাদিই বিশুদ্ধ বৃত্তি। গুরুকুলে বাস, স্বাধ্যায়, ব্রতধারণ ও ভিক্ষাটন ব্রহ্মচারির ধর্ম্ম। স্বকর্ম্ম দ্বারা জীবিকাসংস্থান, আতিথ্য সৎকার, দীনে দয়া ইত্যাদি গৃহস্থের ধর্ম্ম। ভূশয্যা, অজিনধারণ, বন্য ফলমূলে বৃত্তি, প্রতিগ্রহ নিবৃত্তি, ত্রিকালীন স্নান, ব্রতাচরণ ও আতিথ্য ইত্যাদি বনীর ধর্ম্ম। কর্ম্মত্যাগ, ভিক্ষাটন, তরুতলবাস, পরিগ্রহত্যাগ, অহিংসা, সমদর্শিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধারণা, ধ্যান, ভাবশুদ্ধি ইত্যাদি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।

কিন্তু অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্ম সর্ব্বাশ্রম-সাধারণ, তদভাবে লোকস্থিতি ভঙ্গ হইয়া যায়। রাজা এই সমস্ত ধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক। তিনি না থাকিলে ধর্ম্মলোপ ও জনসমাজ ছারখার হইয়া যায়। এই জন্যই তাঁহার হস্তে দণ্ড। এই দণ্ড তীব্র হইলে লোকের ক্লেশের কারণ হয় এবং মৃদু হইলে সকলে বিপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যথাযথ রূপে দণ্ড প্রয়োগ রাজার সর্ব্বাংশে আবশ্যক। ইহা দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম লোকমধ্যে সুরক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অসম্যক প্রয়োগ, অন্যের কথা কি, নিরীহ অরণ্যবাসীদিগেরও ভয়ের কারণ হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল সকলের কোপ ও রাজার রাজ্যলোপ। দেখ, সবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে দণ্ড ব্যতীত কে এই বিনিপাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। ক্রোধ লোভাদি বলপূর্ব্বক এই জগতকে নরকে নিক্ষিপ্ত করিতেছে দণ্ডই ইহার পরিত্রাতা। সকলেই দণ্ডের নিকট অবনত, শুচি লোক দুর্লভ। অতএব রাজা দণ্ড দ্বারা প্রজাদিগকে সুশাসনে রাখিবেন।

সূনৃত বাক্য, দয়া, দান, শরণাগত দীনের পরিত্রাণ ও সাধুসঙ্গ এই সমস্ত সৎপুরুষের লক্ষণ। বলবৎ হৃদগত দুঃখে অভিভূত হইয়া অনন্য সাধারণ করুণায় দীনকে উদ্ধার করিবে। তাঁহাদের অপেক্ষা সাধু আর কেহই নাই যাঁহারা দুঃখার্ণবনিমগ্ন দীনকে উদ্ধার করেন। অতএব রাজা ধর্ম্মপথে অটল থাকিয়া দয়া সহকারে অনাথ দীনদিগের অশ্রুমার্জ্জন করিবেন। সকলের পক্ষেই অনৃশংসতা পরম ধর্ম্ম, রাজা ইহার দ্বারা দীন ব্যক্তিকে পালন করিবেন। আত্মসুখ উদ্দেশে দীনকে পীড়ন করা, তাঁহার কিছুতেই উচিত নহে। কারণ ঐরূপ ব্যক্তি পীড্যমান হইয়া মন্যু দ্বারা রাজাকে দগ্ধ করিয়া থাকে। কোন্ ব্যক্তি সৎকুলপ্রসূত হইয়া সুখলেশ লোভে অবিচারে কোন দুঃস্থ অল্পপ্রাণকে পীড়ন করিতে পারে। কোন্ ব্যক্তিই বা এই আধিব্যাধিগ্রস্ত শরীরের জন্য—যাহা আজ বা কালই হউক নিশ্চয় বিনাশ পাইবে সেই তুচ্ছ শরীরের জন্য অধর্ম্ম করিতে পারে। বিষয় বাতাহত মেঘের ন্যায় অস্থির, জানি না, তাহা কিরূপে প্রকৃত সাধু ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করিবে। দেহীর জীবন জলান্তর্গত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় চঞ্চল ইহা জানিয়া শশ্বৎ শুভানুষ্ঠানে রত থাকিবে। পার্থিব সুখ মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ইহা বুঝিয়া সততই ধর্ম্ম আচরণ করিবে। শারদীয় নির্ম্মল শশধর বা ফুল্লসরোজশোভিত সরোবরও তাদৃশ নহে যেমন সজ্জনের কার্য্য মনকে আনন্দিত করিয়া থাকে।

প্রেম। নীরবতা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সাধকগণ বলেন যে, আত্মার অন্তরতম প্রকোষ্ঠে, "হিরণ্ময় পরে কোষে,"—পরমাত্মার "দরবার খাশেতে,"—যথায় পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার সর্ব্বোত্তম প্রেমযোগ ও প্রেমালাপ হয়, তথায় বাক্য প্রবেশ করিতে পারে না; তথা হইতে, "বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ১ কিন্তু সেই নীরবতার মধ্য দিয়াই কেমন সুস্পষ্টরূপে প্রেমালাপ হয়!

নীরবতায় ধ্বনি ডুবিয়া যায়। নানক বলিয়াছেন যে, এই শব্দহীন অধ্যাত্ম রাজ্যে "অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী" রব শ্রবণ করা যায়। সাধকগণ কহিয়াছেন যে,

(১) শ্রুতি।

পরমাত্মার শব্দহীন বাক্য বংশীধ্বনি অপেক্ষাও সুমধুর। প্রেমিক জেলালুদ্দিন্ রুমী গাহিয়াছেন,—"শুনিতেছ বংশী কি খেদ উক্তি করিতেছে? সে বিরহ বিচ্ছেদের জন্য বিলাপ করিতেছে।" ভগবানের এই অনাহত রবাব্‌যন্ত্রের ধ্বনি, বংশীরব বা 'আওয়াজ্' শুনিবার জন্যই যোগিগণের শ্রবণ-বিবর পিপাসিত,—তাহার প্রতিধ্বনিতে আমাদের ঘুমন্ত হৃদয়বীণা ঝঙ্কারিত হইয়া নাচিয়া উঠে! অন্য কোলাহলে শ্রবণ পূর্ণ থাকিলে, উহা অনুভব করা যায় না।

এই নীরব রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া "অতুল জ্যোতির জ্যোতি" ১ সমীপে মানব-আত্মা স্তব্ধভাবে অবস্থান করে। সে নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিত হইয়া মানব-আত্মা সংসারকে বলেন,—"তোমার বিদায় লইলাম। আমি জ্যোতিতে আমাকে হারাইলাম।" ২ সে বড় পবিত্র দেশ। উহা অক্ষয়-আনন্দধাম। সে দেশে নীরবতা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজিতা। বাক্য সে পবিত্র রাজ্যের বাহিরে অবস্থান করে। বহির্জ্জগতের পরিচারিকা বাণী অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিতে পারে না।

স্বার্থগত আকর্ষণ, "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা," ৩ ও প্রেম বিভিন্ন বস্তু। মোহ মানবকে কেবল নীচ ও জঘন্য করে। ৪ প্রকৃত প্রেম মানবকে উন্নত করে, মুক্তি প্রদান করে।

স্বার্থ-রঞ্জিত প্রেম হৃদয়ের এক কলুষিত অবস্থা। রূপজ মোহ অতি নিকৃষ্ট বস্তু। উহা ইন্দ্রিয়-লালসার সহায়, নামান্তর, অস্থায়ী। উহা স্বর্গীয় প্রেমের পার্থিব নকল। উহা মূল দলিলের জাল্। উহা কৃত্রিম হেম, কৃত্রিম হীরক। মানব কাঞ্চনমূল্যে এই কাচ, এই কল্পিত বস্তু ক্রয় করে। হীরক ক্রয় করিবার ক্ষমতা সকলের না থাকায়, নকল হীরা বা কাচেতে মানুষ মনের সাধ মিটাইতে চাহে।

আত্ম-সুখ-লালসা, এবং প্রেম পৃথক বস্তু। "শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম।" ১ প্রেম "জম্বু জাম্বুনদ হেম" ১ নির্ম্মল; "নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম।" ১ কাম কাহাকে কহে? না,—"কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।" ১

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।

* * * *

অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥" ১

প্রেম কাম-গন্ধ-হীন,—"তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ।" ১ "পর সুখ' তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত কেবল।" যেখানে প্রেম, সেখানে "নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।" ১

জ্ঞান মনুষ্যকে মহত্ত্ব প্রদান করে। প্রেম,—আত্মোৎসর্গ তাহাকে দেবত্বে ভূষিত ও দৈববলে বলীয়ান্ করে।

জ্ঞানমার্গে যেরূপ বিশেষ হইতে সাধারণে উপনীত হইতে হয়, প্রেমপথেও সেইরূপ বিশেষকে না ধরিলে সাধারণে উপনীত হওয়া যায় না।

প্রথমে, বস্তু-বিশেষের প্রতি প্রেম অর্পিত না হইলে, উদার সার্ব্বজনীন প্রেম জন্মে না। প্রেম নিরালম্ব ভাবে শূন্যকে ধরিয়া থাকিতে পারে না। শূন্য যাহার আধার, সে প্রেম কাল্পনিক,—আকাশ-

(১) শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২ "Farewell! We lose ourselves in light" —Tennyson. In Memorian.
(৩) কবিরাজ গোস্বামী।
৪ "Wanton love corrupteth and embaseth it (mankind)."—Bacon.

(১) কবিরাজ গোস্বামী।

কুসুমবৎ অলীক,—স্বপ্নলব্ধরাজ্যবৎ অসত্য। ইংরাজ কবি বলেন,—"প্রেমের ন্যায়, বন্ধুতাও একজনের প্রতি ধাবিত না হইলে নাম মাত্র হয়।" ১

শূন্যকে আশ্রয় করিলে, প্রেমবৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন হয় না। এই কারণেই কবি প্রথমতঃ একটী বস্তুকে সম্পূর্ণ হৃদয় দান করিতে উপদেশ দিয়াছেন,—"প্রথমে একজন জীবন্ত ব্যক্তিকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর।" ২

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৬৪৸৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৩৫।৶০
সমষ্টি	...	৮০০।/০
ব্যয়	...	২৫৭৷৶৬
স্থিত	...	৫৪৩।৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৪৩।৬

৫৪৩।৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৯০৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২০৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৪৲
পুস্তকালয়	...	২০৴০
যন্ত্রালয়	...	৩৮৵০
গচ্ছিত	...	।৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		২।০
সমষ্টি		২৬৪৸৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬৬।৵৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৮।/০
পুস্তকালয়	...	।৯
যন্ত্রালয়	...	৭১৸৶০
সমষ্টি		২৫৭৷৶৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ত্রিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক
ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

---

১ "Friendship, like love, is but a name,
Unless to one you stint the flame."
—John Gay. The hare with many friends.

২ "First learn to love one living man."
—Wordsworth. A poet's Epitaph.

৭১০ সংখ্যা

১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ, ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ১ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং
পঞ্চদশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩।
৭১০ সংখ্যা
১৮২৪ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ত্রিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

প্রাতঃকালে সমাজগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইলে সকলে বন্দনা গান আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করিলে সঙ্গীত হইতে লাগিল।

ললিত—সুরফাঁক্তা।

পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ।
হের পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ।
গগন মগন নন্দন আলোক উল্লাসে,
লোকে লোকে উঠে প্রাণ তরঙ্গ
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে
কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান;
জাগ জাগ চল মঙ্গল পথে,
যাত্রীদলে মিলি লহ বিশ্বের সঙ্গ।

পরে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

রজনীর অবসানে প্রভাকর সূর্য্যের অভ্যুদয় হইলে যেমন সকল সংসারের নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং অচেতন প্রাণিবর্গ চৈতন্য লাভ করিয়া, রূপহীন পদার্থপুঞ্জ রূপ লাভ করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরেরই মহিমাকে বিঘোষিত করিতে থাকে, সেই রূপ ব্রাহ্ম-শতাব্দীর সীমন্ত উজ্জ্বল করিয়া মাঘের একাদশ দিবসের অরুণ-কিরণ উদিত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়-স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয়, মঙ্গলময় পরমাত্মার উপাসনার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া কৃতজ্ঞতা-ধারা হৃদয় প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। অদ্য আমাদের জীবনের সেই বিশেষ দিন—অদ্য আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য, বিশেষ রূপে তাঁহার উপাসনা করা। প্রাত্যহিক উপাসনা, সাপ্তাহিক উপাসনা এবং মাসিক উপাসনা, এই ত্রিবিধ উপাসনা ভক্তজীবনের বিশেষ অনুষ্ঠান হইলেও অদ্যকার ভাব আরো উচ্চ। অদ্য আত্মার জ্বলন্ত বিশ্বাসাগ্নির দ্বারা গগন স্পর্শ করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার ভয়, ভ্রান্তি, মোহ, অদ্যকার ব্রহ্মযজ্ঞে আহুতি দিয়া নিজের ধর্ম্মগত জীবনকে পরিশুদ্ধ করিতে হইবে—

"যং ক্রন্দসী অবসাতস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে"

ব্রহ্ম নির্ম্মিত দ্যুলোক এবং ভূলোক অচল গৌরবে অবস্থান করিতেছে বলিয়া যে দীপ্ত প্রভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, সেই স্তিমিতনেত্রে সমাধিযোগে সমস্ত মনঃপ্রাণ তাঁহার পূজায় অর্পণ করিতে হইবে। হৃদয়ের পবিত্রতার দ্বারা সূর্য্য চন্দ্রমার পুঞ্জীভূত কিরণরাশিকেও সমাচ্ছন্ন করিতে হইবে। প্রীতি ভক্তি মনের বৃত্তি হইলেও আজ তাহা মনের বৃত্তি নহে, আজ তাহা মর্ত্ত্যের পদ্ম চম্পক এবং স্বর্গের পারিজাতের শোভা সৌন্দর্য্যে রঞ্জিত হইয়া আত্মার মস্তক মুকুট হইতে পরমাত্মার পরম পবিত্র সন্নিধানে ফুটিয়া পড়িবে। দেব, তপস্বী, এবং গৃহাশ্রমীর হৃদয় আজ এক তানে নিবদ্ধ! দেবগণ আজ আর স্বর্গে নাই, আজ তাঁহারা মর্ত্ত্যে আসিয়া তাঁহাদের ও আমাদের সেই চির-আরাধ্য দেবদেবের বন্দনার জন্য আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। প্রাচীন কাল অদ্য বর্ত্তমান কালের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সেই আরণ্যক ঋষিদিগকে এই নগরমধ্যে ব্রহ্মমন্দিরে আনয়ন করিয়া "জয় ব্রহ্ম জয়" গানে উদ্যত করিয়াছে। অদ্যকার প্রভাতের এই নবতর মহিমা—মঙ্গলময় ভাব। আজ মহর্ষিগণের কি আনন্দ, তাঁহারা যে ব্রহ্মনামে পৃথিবী পূর্ণ করিবার জন্য নির্ব্বেদকেই জীবনের সর্ব্বস্ববোধে অরণ্যে কালাতিপাত করিয়াছিলেন আজ তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে, যে হেতু আজ পৃথিবীতে ব্রহ্মোৎসব। হিমালয়ের শিখর কন্দর তখন জাগিয়াছিল ব্রহ্মনামে, সমুদ্র-বাহী পঞ্চনদের তটভূমি তখন জাগিয়াছিল বেদমন্ত্রে, আজ গৃহীর গৃহাশ্রম ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীতে জাগ্রত, জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তখন আরণ্যক বেদোপনিষদ ছিল সত্যের আকরভূমি, অদ্য তাহার পরম সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্ণ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া বিলম্বিত রহিয়াছে। দেখিতেছি, অদ্য বিশ্বাসীর মুখশ্রী ব্রহ্মবর্চ্চে উজ্জ্বল, আত্মার অভ্যন্তর কেমন আশ্চর্য্য অন্তশ্চক্ষুতে উন্মেষিত, অনুরাগের দীপ্তি কেমন বিধূমক। এখন আমরা প্রতি জনে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে, পরমাত্মা অসীম আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াও তিনি আমাদের আত্মার নিগূঢ় অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। অদ্য ভুলিয়া যাও সব সংসারের কথা, সব শোকের বারতা, সব দুঃখের কাহিনী, সব ক্ষতি এবং লাভের গণনা। যদি পাইয়াছি সেই স্বর্গের সংবাদ, যদি বুঝিয়াছি সেই স্বর্গের রাজা আমাদের জীবন রাজ্যেরও রাজা, যদি জানিয়াছি যে তিনি আমাদের বন্ধু, জনয়িতা ও বিধাতা, যদি বুঝিয়াছি যে মৃত্যুর পরে শরীর এখানে পড়িয়া থাকিবে, শোকের উচ্ছ্বাস নির্ব্বাণ হইবে, দুঃখের বার্ত্তা নীরব হইবে, কিন্তু জীবাত্মা সেই ইহ-পরকালের সহায় পরমাত্মার সহিত নিত্যকাল পবিত্র পরানন্দ ভোগ করিবে; তবে এস আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের বিমল জ্যোতিতে অন্তরের ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দ-রস পান করিয়া কৃতার্থ হই। জগতের সকল অভাব যাঁহাতে যাইয়া পূর্ণ হয়, সকল অভিমান কোলাহল যাঁহাতে যাইয়া নীরব হয়, সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদাভেদ যাঁহাতে যাইয়া এক হয়, সকল আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তি যাঁহাতে যাইয়া শান্ত হয়, সেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম আমাদের উপাস্য দেবতা। তিনি আমাদের অন্তর্বাহ্য পূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই শুভ উৎসবের প্রভাতে, হে ভ্রাতৃগণ! আইস, আমরা আমাদের অনন্ত জীবনের

পথের সম্বল সংগ্রহ করি, সেই তোমাদের ও আমাদের আরাধ্য পরমেশ্বরে চিত্ত সমাধান করিয়া কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনাদি সমাপ্ত হইলে এই সমস্ত সঙ্গীত হইল।

রামকেলি—একতালা।

স্বপন যদি ভাঙ্গিলে রজনী প্রভাতে
পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখ মোরে তব কাজে
নবীন কর এ জীবনে হে।
খুলি মোর গৃহদ্বার
ডাক তোমারি ভবনে হে।

আসাবরি—ঝাঁপতাল।

মনোমোহন গহন যামিনী শেষে
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি দিলে শুভ প্রাতে সুপ্ত এ আঁখি
শুভ আলোক লাগায়ে।
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল,
আঁধার গেল মিলায়ে;
শান্তিসরসী মাঝে চিত্তকমল
ফুটিল আনন্দ বায়ে।

ললিত বিভাস—একতালা।

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু
বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি তবু আনন্দ
তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

সর্ফর্দা—আড়া।

দুঃখরাতে হে নাথ কে ডাকিলে
জাগি হেরিনু তব প্রেম মুখ ছবি।
হেরিনু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে,
জাগে তব নয়নে, প্রাতে শুভ্র রবি।
শুনিনু বনে উপবনে আনন্দ গাথা
আশা হৃদয়ে বহি নিত্য গাহে কবি।

ভৈরবী—সুর[illegible]

আনন্দ তুমি স্বামী, [illegible] তুমি,
তুমি হে মহা সুন্দর, [illegible]নাথ।
শোকে দুখে তোমারি [illegible]
জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ।
চিতমন অর্পিণু তব পদপ্রান্তে
শুভ্র শান্তি শতদল পুণ্য মধু পানে,
চাহি আছে সেবক তব সুদৃষ্টিপাতে
কবে হবে এ দুখ-রাত প্রভাত।

ভৈরবী—একতালা।

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায়
গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন,
ভক্তিবিহীন তান।
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে,
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান।

সিন্ধু ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে
তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া করে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে,
ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!
যদি কোন দিন তোমার আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে
ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু।
যদি কোন দিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার
ফিরিয়া যেয়োনা প্রভু!

ভৈরবী - ঠুংরি।

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ
সাথে যদি দাও ভকতি।
যত দিতে চাও, কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে;
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জাল জঞ্জাল গুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে
মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র করে
তোমার চরণ ধূলিতে,
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসার তলে
তোমারে দিয়োনা ভুলিতে।

যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ, ঘুরিব
যাই যেন তব চরণে।
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে
সকল শ্রান্তি হরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন
কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
প্রাণ পাই যেন মরণে,
সন্ধ্যাবেলায় লভিগো কুলায়
নিখিলশরণ-চরণে।

প্রাতের সভাভঙ্গ হইল। রাত্রিতে শ্রীমন্মহর্ষি দেবের গৃহপ্রাঙ্গণ আলোকমালায় উজ্জ্বল ও লোকে পরিপূর্ণ হইলে বেদগান হইতে লাগিল। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় সকলকে এইরূপ নিবেদন করিলেন।

এই পারিবারিক ব্রহ্মোৎসবে দর্শক ও সাধকরূপে সকলে যে সমাগত হইয়াছেন, আপনারা আমাদের অকৃত্রিম প্রীতি-কৃতজ্ঞতার সাদর উপহার গ্রহণ করুন। যিনি এই গৃহের অধিদেবতা, যাঁহার রত্নবেদী এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার বন্দন গাথা, এই শুভ অবসরে, মন্ত্রে গীতে সকলকে শুনাইতে পাইব, এই আশাতেই আমরা ধন্য হইতেছি। ভারতীয় হিন্দুসমাজ নানা ধর্ম্মে—শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইলেও বেদের নামে সকলেরই মস্তক অবনত। শত সহস্র মতবৈচিত্র্যে ইহার বিশাল কায়া খণ্ড বিখণ্ড হইলেও, যদি কোন সঞ্জীবন ঔষধে শান্তি ও একত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে

পারে, তবে তাহা বৈদিক সত্যে। বিচ্ছিন্ন ভারতে যদি এখনও কোন সাধারণ—সাম্য-ভূমি থাকে, যেখানে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্যে সকলে মিলিত হইতে পারেন, তবে তাহা আরণ্যক ঋষিগণ-প্রদর্শিত ধর্ম্মমার্গে। বিভিন্নপন্থী মানব-সমাজ অসঙ্কোচে মিলিত হইয়া যদি কোন পূত-মন্ত্রে সমস্বরে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারে, তবে তাহা ইহারই অনুরূপ ক্ষেত্রে, তাঁহাদেরই সেই সিদ্ধ-মন্ত্রে। সত্যের নিকষে পরীক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে, এ দেশীয় সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, যাহা উপনিষদের প্রতিপত্রে অঙ্কিত, তাহা দেশবিদেশস্থ অন্যান্য সর্ব্বধর্ম্মের আদর্শের উপরে ধবলগিরির সমুন্নত শিখরের ন্যায় চিরকাল মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। সেই জন্যই আমরা সকলকে উদ্বোধিত করিয়া বলিতেছি, কেবল বেদের নামে নহে, নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীনত্বের নামেও নহে, কিন্তু সত্যের নামে সকলে মিলিত হও। মিলনের এমন সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র, জ্ঞানের অবিরোধী এমন উন্নততম সাধন-প্রণালী, মস্তকের উপরে ঈশ্বরের অমোঘ প্রসাদ-বারি, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিব। জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুনয়ে—সময়ের আহ্বানে সকলে জাগ্রত হও। এক অবিরোধী ধর্ম্ম, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা একই ঈশ্বরের পূজার্চ্চনা ভিন্ন ভাগ্যলক্ষ্মী কিছুতেই প্রসন্ন হইবেন না। দেশের প্রকৃত কল্যাণ যদি লক্ষ্য হয়, বৈদিক ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত কর, সার্ব্বভৌমিক মহাসত্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর, জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সখ্যবন্ধন কর, নীতিকে অঙ্গের ভূষণ কর, সকলে একমনা হইয়া তোমাদের ও আমাদের সেই পুরাতন পরব্রহ্মের আরাধনা কর, সামাজিক সর্ব্ববিধ সংস্কারের মধ্যে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত উৎসাহের সহিত কার্য্যসাধনে তৎপর হও: জয়দাতা বিধাতা অবশ্যই জয়যুক্ত করিবেন। আজিকার দিনে নবাভিষিক্ত সম্রাটের মস্তকে ঈশ্বরের শুভ দেবাশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হউক, প্রজার মঙ্গল হউক; যিনি ব্রাহ্মসমাজের কাণ্ডারী থাকিয়া এখনও আমাদের মধ্যে বিরাজমান, তাঁহার জীবন আরও সুদীর্ঘ হউক, সকলের অন্তরে সুমতি বিতরিত হউক, "স দেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" এই বেদমন্ত্রে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের এই মাত্র ভিক্ষা।

পরে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব বেদিগ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

আমাদের আজ প্রধান উৎসবের দিন। পৃথিবীর দিকে তাকাইলে আমাদের দেশে উৎসবের দিন অনেক কাল হইল অস্তমিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের চতুর্দ্দিকে মহাপ্রতাপান্বিত মহামহোৎসব যতই উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হয় ততই আমাদের মর্ম্মের অভ্যন্তরে বিষাদের অন্ধকার ঘনীভূত হইতে থাকে। এই পার্থিব মহামহোৎসবে আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবার দিন আর নাই। রাজ্যের মহোৎসবে মণিমাণিক্যের চাকচিক্যে এক্ষণে আমাদের দেশের আপাদমস্তকে মোহের বন্ধন এবং অধীনতার শৃঙ্খল এরূপ দৃঢ় আঁটিয়া যাইতে থাকে যে, তাহার মর্ম্ম নিপীড়নে আমাদের আনন্দের উৎস একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশের অন্ধীভূত চক্ষু এক্ষণে অশ্রুজলেরই উৎস। আমাদের দেশের অন্তঃসার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল—উৎসবে উৎসবে তাহাও যায় যায় হইয়াছে। আমা-

দের দেশের পরিম্লান মুখমণ্ডলে পূর্ব্বতন আনন্দজ্যোতির স্মৃতিচিহ্ন যাহা এ কাল পর্য্যন্ত তাহাকে অন্ধকারের গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া আসিয়াছে তাহাও নিভনিভ হইয়াছে। কিন্তু আজিকের এ উৎসব সে উৎসব নহে। আজিকের এ উৎসব অমৃত আনন্দের উৎস। আজিকের এ উৎসব পৃথিবী হইতে আসিতেছে না। আমাদের দেশের এ দুর্গতি যে চিরদিন থাকিবে না—আজিকের এ উৎসবে তাহারই পূর্ব্বাভাস স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক্ আনন্দধারায় প্লাবিত করিতেছে। আজিকের এ উৎসবে গ্রহতারা-সমাকীর্ণ অসীম আকাশ হইতে কল্যাণ বর্ষিত হইতেছে। সত্যের অটল গাম্ভীর্য্য এ উৎসবের ভিত্তিমূলে বলাধান করিতেছে। মঙ্গলের সুধাসিঞ্চন এ উৎসবে জীবন সঞ্চার করিতেছে। প্রেমের অপার্থিব সৌন্দর্য্য এ উৎসবে সঙ্গীত জাগাইয়া তুলিতেছে। এ উৎসবের মুখজ্যোতি পৃথিবীর এমন কোনো নশ্বর এবং সীমাবদ্ধ পদার্থ হইতে আসিতেছে না যে, কিয়ৎকালের জন্য সংকীর্ণ দেশে বদ্ধ থাকিয়া কালক্রমে নিস্তেজ হইয়া অবসান প্রাপ্ত হইবে। এ উৎসব সমস্ত বিশ্বভুবন জুড়িয়া আদিম পুরাকাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত নিরন্তর নব নব রাগে উদ্ঘোষিত হইতেছে। যিনি নিখিল বিশ্বভুবনের জনকজননী; কি রাজরাজেশ্বর—কি দীন দরিদ্র—সকলেরই প্রতি যাঁহার কৃপাদৃষ্টি সমান; যাহার আনন্দের কণা-মাত্রে নির্জীব প্রস্তর পাষাণ সজীব হইয়া উঠে, চেতনাবান্ জীব জ্ঞানবান্ হইয়া উঠে, জ্ঞানবান্ মনুষ্য দেবতাগণের সহবাসের উপযুক্ত হইয়া উঠে, আজিকের এ উৎসব সেই করুণাময় প্রেমময় সর্ব্বশক্তিমান্ ত্রিভুবনপরিপালক দেবাধিদেব পরম দেবতার পূজার মহোৎসব। আমরা আজ সমস্ত ভুবনের মহান্ আত্মা এবং আমাদের অন্তরের অন্তরাত্মা পরমাত্মার পূজার জন্য সবান্ধবে সম্মিলিত হইয়া—সেই সর্ব্বমঙ্গলালয় সর্ব্বব্যাপী মহান্ দেবতাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। যিনি নির্জীব প্রস্তর পাষাণ হইতে সচেতন প্রাণী জাগাইয়া তোলেন তাঁহাকে আজ আমরা ডাকিতেছি তিনি আমাদের অন্তঃকরণে সুনির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতি উদ্দীপিত করুন; যিনি সুশীতল মলয়-সমীরণে বন-কাননে বসন্ত জাগাইয়া তোলেন তাঁহাকে আমরা ডাকিতেছি তিনি আমাদের অন্তঃকরণে সুধাময় প্রীতিভক্তি জাগাইয়া তুলুন; যিনি পুণ্য-সলিলা ভগীরথী প্রবাহিত করিয়া পৃথিবীকে মঙ্গলে অভিষিক্ত করেন তাঁহাকে আমরা ডাকিতেছি তিনি আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের চিরন্তন সহায় এবং সুহৃৎ। অদ্য এই সান্ধ্য উপাসনার প্রারম্ভে আমরা তোমার কল্যাণ আশীর্ব্বাদ এবং অভয়বাণী প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমাদের সকলের প্রতি সুমঙ্গল প্রসাদবারি এবং শান্তি-সুধা বর্ষণ কর।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।

অমারজনীর বিশ্বব্যাপী যে অন্ধকার তাহা যে কিছুতে দূর হইতে পারে এ কথা মনে আনাই কঠিন, অথচ যেমনি সূর্য্য উদয় হয় অমনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত আকাশের নিবিড় কালিমা নিমেষমাত্রেই ক্ষালিত হইয়া যায় তাহার জন্য কোন সন্ধান করিতে হয় না কোন উদ্যোগ করিতে হয় না। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদিগকে যে প্রভাত প্রেরণ করেন তাহা এত বৃহৎ অথচ এমন সহজ! ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল বড়-বড় দান

দিয়াছেন, তাহা এমনি করিয়াই দিয়াছেন। আমরা মাতাকে, পিতাকে, আলোককে, বায়ুকে, প্রাণকে, বুদ্ধিকে, জগতের সৌন্দর্য্যকে একান্ত সহজেই পাইয়াছি। তাহাদিগকে যদি আমাদের উপার্জ্জন করিয়া লইতে হইত, তবে কোন কালে পাইতাম না। ঈশ্বরের দান যেমন সহজ, তেমনি অজস্র।

গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জ্বালিতে হয়, তবে তাহার জন্য আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়—সেটুকুর জন্য কতলোকের উপর আমার নির্ভর! কোথায় সর্ষপ-বপন হইতেছে, কোথায় তৈল-নিষ্কাশন চলিতেছে, কোথায় তাহার ক্রয়বিক্রয়—তাহার পরে দীপসজ্জারই বা কত উদ্যোগ—এত জটিলতায় যে আলোটুকু পাওয়া যায়, তাহা কত অল্প! তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারো উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না,—তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না, কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র, তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান,—তাহা নিত্য, তাহা ভূমা, তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আমাদের অন্তর-বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল। আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্যোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্ত জীবনের সম্বল ধর্ম্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরা নিজে যাহা রচনা করিতে যাই, তাহা জটিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনযাত্রা জটিল। এই জটিলতা আপন বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা অনেক সময় আমাদের মূঢ় চিত্তকে অভিভূত করিয়া দেয়। যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত ঘোরালো আমাদের অজ্ঞবুদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে। যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কলকারখানা আয়োজন-উপকরণ বহুলবিস্তৃত, তাহা আমাদের দুর্ব্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী ধীশক্তিমান্, যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্ব্বত্রসুগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনি হোক্, জটিলতাই দুর্ব্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা,—পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

ধর্ম্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে, তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনাজাল দ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোন বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ

স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা, সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?

উপনিষদের এই ব্রহ্ম আমাদের অগম্য, এই কথা নির্ব্বিচারে উচ্চারণ করিয়া ঋষিদের অমর বাণীগুলিকে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারের বাহিরে নির্ব্বাসিত করিয়া না রাখি। আকাশ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আমরা আকাশকে দুর্গম বলিতে পারি না। বস্তুত সেই কারণেই তাহা সুগম। যাহা ধারণাযোগ্য, যাহা স্পর্শগম্য, তাহাই আমাদিগকে বাধা দেয়। আমাদের স্বহস্তরচিত ক্ষুদ্র প্রাচীর দুর্গম, কিন্তু অনন্ত আকাশ দুর্গম নহে। প্রাচীরকে লঙ্ঘন করিতে হয়, কিন্তু আকাশকে লঙ্ঘন করিবার কোন অর্থই নাই। প্রভাতের অরুণালোক স্বর্ণমুষ্টির ন্যায় সঞ্চয়যোগ্য নহে, সেই কারণেই কি অরুণালোককে দুর্লভ বলিতে হইবে? বস্তুত একমুষ্টি স্বর্ণই কি দুর্লভ নহে, আর আকাশপূর্ণ প্রভাতকিরণ কি কাহাকেও ক্রয় করিয়া আনিতে হয়? প্রভাতের আলোককে মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার কল্পনাই মনে আসিতে পারে না—তাহা দুর্ম্মূল্য নহে, তাহা অমূল্য।

উপনিষদের ব্রহ্ম সেইরূপ। তিনি অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্র—তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন। মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণধারণ করিতেছি—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—

এই আনন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীবসকল উপভোগ করিতেছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—

সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে—সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে—সেই সর্ব্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না—হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ-উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয়-উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

ভারতবর্ষে এই হৃদয় উন্মীলনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল! তাহা একনিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়—তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি! ব্যাহৃতিশব্দের অর্থ—চারিদিক্ হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব-

জগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়—মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি কোন বিশেষ-প্রদেশবাসী নহি—আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোক-লোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য্য, তিনি অন্ততঃ প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন—আর্য্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্যজ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করেন?—

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি। এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহা-কেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি—বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্ত্তে এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কি সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?—

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্য্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দ্বারা। সেই-রূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন—যে শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি।

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি, ইহা যেমন উদার, তেমনি সরল। ইহা সর্ব্বপ্রকার-কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়া-ইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগৎকে এবং এই বুদ্ধিকে তাঁহার অশ্রান্ত শক্তি দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা স্মরণ করিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠতা গভীরভাবে, সমগ্রভাবে, একান্তভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তি-বিশেষগত প্রকৃতির কোনো সঙ্কীর্ণতা নাই।

আমাদের এই ব্রহ্মের ধ্যান যেরূপ সরল অথচ বিরাট্, আমাদের উপনিষদের প্রার্থনাটিও ঠিক সেইরূপ।

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো-র্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে

লইয়া যাও, হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও, রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাঁহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা কর।

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়।—বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। পাপের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ছিল না সে কথা ঠিক নহে কিন্তু পাপের পরিত্রাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার জটিল কষ্টকল্পনা ছিল না। আমরা পাপনাশের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই বিশেষরূপে আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে, এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। মাতাকে যদি কেবলি উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাজে অনবধান হইয়ো না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না—কিন্তু যদি বলি তুমি ছেলেকে ভালবাস, তবে দ্বিতীয় কোন কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল হইয়া আসে। ফলত সেই ভালবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি যদি বলি, অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক, তবে পাপসম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক্ হইতে যদি দেখি, তবে জটিলতার অন্ত নাই—তাহা ছেদন করিয়া দাহন করিয়া, নির্ম্মূল করিয়া কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না—সেদিক্ হইতে দেখিতে গেলে ধর্ম্মকে বিরাট্ বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়—কিন্তু আনন্দময়ের দিক্ হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ কুহেলিকার মত অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিয়াছে।

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও। আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব—আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ, পাপ, নিরানন্দ, কেবল এইজন্যই। সত্যের, জ্যোতির, অমৃতের ঐশ্বর্য্য যিনি কিছু পাইয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের সমস্ত অভাবের একেবারে মূলোচ্ছেদ করিয়া দেয়। যে সকল ব্যাঘাতে তাঁহার প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নানা দুঃখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দেয়! সেইজন্যই আমাদের মন অসত্য, অন্ধকার ও মৃত্যু আবরণ হইতে রক্ষা চাহে। যখন সে বলে আমার দুঃখ দূর কর, তখন সে শেষ পর্য্যন্ত না বুঝিলেও এই কথাই বলে—যখন সে বলে আমার দৈন্যমোচন কর, তখন সে যথার্থ কি চাহিতেছে, তাহা না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর, তখনো এই কথা! সে না বুঝিয়াও বলে—

আবিরাবীর্ম্ম এধি।

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও!

আমাদের ধ্যানের মন্ত্র আমাদিগকে

মন্দিরে লইয়া যায় না, কোন মূর্ত্তি আনিয়া দেয় না, একেবারে ধ্যানের মূলে লইয়া যায়, সর্ব্বত্রই যে শক্তির নিরন্তর বিকাশ আমাদের ধী এবং বিশ্বের মধ্যেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে বলে। সেইরূপ আমাদের প্রার্থনার মন্ত্রও ধন চাহে না, অন্ন চাহে না, বলবুদ্ধি চাহে না, সকল সম্পদের মূলদেশে আপনাকে উপস্থিত করে, যে সত্যে যে আলোকে যে অমৃতে আমরা পরিবেষ্টিত তাহাকেই সচেতনভাবে উপলব্ধি করিবার সমস্ত বাধা দূর করিতে চাহে, স্বপ্রকাশের প্রকাশ প্রার্থনা করে, রুদ্রদেবের প্রসন্নমুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী। ভারতবর্ষ বলে—

সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন। সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন, সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে—তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্ম্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। সমস্ত সুখের মূল সেইখানেই। উপকরণসঞ্চয়ের আদি-অন্ত নাই, বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া যায়, সমস্ত ভস্ম হইয়া ক্ষুধিত শিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যায়, তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণভাব ধারণ করে। সুখকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মৃগয়ার মৃগের মত নিষ্ঠুরবেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারীর উদ্দাম অশ্ব তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

এইরূপ উন্মত্তভাবে যখন আমরা ছুটিতে থাকি, তখন আমাদের আগ্রহের অসহ্যবেগে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমাদের চারিদিকে পদে পদে যে সকল অযাচিত আনন্দ প্রভূত প্রাচুর্য্যের সহিত অহরহ প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহাদিগকে অনায়াসেই আমরা লঙ্ঘন করিয়া, দলন করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাই। জগতের অক্ষয় আনন্দের ভাণ্ডারকে আমরা কেবল ছুটিতে ছুটিতেই দেখিতে পাই না। এইজন্যই ভারতবর্ষ বলিতেছেন—

সংযতো ভবেৎ,

প্রবৃত্তিবেগ সংযত কর—চাঞ্চল্য দূর হইলেই সন্তোষের স্তব্ধতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে। গতিবেগের প্রমত্ততাবশতই আমরা সংসারের যে-সকল স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্য্যকে, প্রতিদিনের শতশত মঙ্গলভাবের আদানপ্রদানকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সংযত হইয়া স্থির হইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের ভিতরকার সমস্ত ঐশ্বর্য্য অতি সহজেই অবারিত হইয়া যায়।

যাহা নাই, তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না—ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ কথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে-বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়,—কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা—আমরা যে

অমৃতলোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের প্রার্থনা—চিত্তসরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে; জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া,—যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া। আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই উপদেশ ভুলিয়াছি, তাহার অকলঙ্ক সরলতম বিরাট্তম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শতধাবিভক্ত খর্ব্বতা-খণ্ডতার দুর্গম গহনমধ্যে মায়ামৃগীর অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছি!

হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামি বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল কর। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্ম্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের মধ্যে বিরোধের মধ্যে সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবিবর্জ্জিত তোমারি পথ—আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্য্যোগের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্ব্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘরশব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়-গর্জ্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্ম্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ এই ঝঞ্ঝাবর্ত্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক-মৃত পত্ররাশির ন্যায় তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

> অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি!

অধর্ম্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্য্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্ব্বে-পশ্চিমে গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন ধর্ম্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের ঊর্দ্ধে নির্ব্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ

দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল—এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জ্জনের মধ্যে মা ভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—

একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না—ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী হইতে নানা দুঃখ ও অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্য্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্ম্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

পূরবী—একতালা।

ঘাটে বসে আছি আনমনা
যেতেছে বহিয়া সুসময়,
সে বাতাসে তরী ভাসাব না
যাহা তোমা পানে নাহি বয়।
দিন যায় ওগো দিন যায়,
দিনমণি যায় অস্তে,
নিশার তিমিরে দশদিক ঘিরে,
জাগিয়া উঠিছে শত ভয়।

ঘরের ঠিকানা হল না গো
মন করে তবু যাই যাই,
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো
সে দিকের পথ চিনি নাই।
এত দিন তরী বাহিলাম
যে সুদূর পথ বাহিয়া
শত বার তরী ডুবু ডুবু করি
সে পথে ভরসা নাহি পাই।

তীর সাথে হের শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান,
রসি খুলে দেবে কবে মোরে
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।
কবে অকূলের খোলা হাওয়া
দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘন ঘোর রবে
মহাসাগরের কলগান।

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া।
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ তরে,
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয় পরে
চরণ হইতে তব পদধূলি তুলিয়া।

যত আশ্রয় ভেঙে ভেঙে যায় স্বামী
এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত লাগিয়া;
যে অনল তাপ যখনি সহিব আমি
এক নাম বুকে বার বার দেয় দাগিয়া।
যবে দুখদিনে শোক তাপ আসে প্রাণে
তোমারি আদেশ বহিয়া যেন সে আনে,
পরুষ বচন যতই আঘাত হানে
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।

ছায়ানট—একতালা।

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়,
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে
প্রাণ করে হায় হায়।
নদীতট সম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়।
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে

তবে নাহি ক্ষয় সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু
হারায় না কভু অণু পরমাণু
আমারি ক্ষুদ্র হারাধন গুলি
রবে না কি তব পায়॥

তিলক কামোদ—সুরফাঁক্তা।

শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে
নাথ চিত্ত মাঝে,
সুখে দুখে সব কাজে
নির্জ্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখ নাথ তোমার প্রেমচন্দ্র
অনিমেষ মম লোচনে
গভীর তিমির মাঝে।

সুরট—চৌতাল।

এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু
তব শুভ আশীর্ব্বাদ,
তোমার অভয়,
তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা।
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম আলো
সবার ঊর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে,
রাখ তারে অরণ্যে তোমারি পথে।
বক্ষে বাঁধি দাও তার
বর্ম্ম তব নির্বিদার
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয়
নিষ্ঠা তবুও রয়
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে।

সুরট মল্লার—তাল একাদশী।

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
নিত্য কল্যাণ কাজে হে।
ফিরিব আহ্বান মানিয়া
তোমারি রাজ্যের মাঝে হে।
মজিয়া অনুখন লালসে
রবনা পড়িয়া আলসে
হয়েছে জর্জ্জর জীবন
ব্যর্থ দিবসের লাজে হে।

আমারে রহে যেন না ঘিরি
সতত বহুতর সংশয়ে
বিবিধ পথে যেন না ফিরি
বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে
না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয় গৌরবে
তোমারি ভৃত্যের সাজে হে।

আড়ানা—একতালা।

মন্দিরে মম কে আসিলে হে
সকল গগন অমৃতমগন
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে।
সকল দুয়ার আপনি খুলিল
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে।

বাহার—সুরফাঁক্তা।

বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত সুমধুর
গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম,
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝরঝর নির্ঝর তব পায়ে।
বিসরিব সব সুখ দুখ চিন্তা অতৃপ্ত বাসনা
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে
অনুখন আনন্দ বায়ে।

কাফি—সুরফাঁক্তা।

শূন্য হাতে ফিরিহে নাথ পথে পথে,
ফিরিহে দ্বারে দ্বারে,
চির ভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে।
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই তাই হারাই ভাসি অশ্রু ধারে।
সকল যাত্রি চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমির যামিনী ভাঙিয়া গেল মেলা।

কত পথ আছে বাকি, যাব চলি ভিক্ষা রাখি,
কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে!

সাহানা—নবতাল।

নিবিড় ঘন আঁধারে
জ্বলিছে ধ্রুব তারা।
মন রে মোর পাথারে
হোস্‌নে দিশে হারা।
বিষাদে হয়ে ম্রিয়মান,
বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি তোল প্রাণ,
টুটিয়া মোহকারা।
রাখিয়ো বল জীবনে,
রাখিয়ো চির আশা,
শোভন এই ভুবনে
রাখিয়ো ভালবাসা।
সংসারের সুখে দুখে
চলিয়া যেয়ো হাসি মুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে
তাঁহারি সুধাধারা।

শঙ্করা—চৌতাল।

আমারে কর জীবন দান—
প্রেরণ কর অন্তরে তব আহ্বান।
আসিছে কত যায় কত
পাই শত হারাই শত,
তোমারি পায়ে রাখ অচল মোর প্রাণ।
দাও মোরে মঙ্গল ব্রত,
স্বার্থ কর দূরে প্রহত
থামায়ে বিফল সন্ধান
জাগাও চিত্তে সত্যজ্ঞান।
লাভে ক্ষতিতে সুখে শোকে
অন্ধকারে দিবা-আলোকে
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান।

বেহাগ—কাওয়ালি।

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি
নিশি দিন কাঁদি তাই।
অন্তর গ্লানি সংসার ভার
পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার
রাখিবারে যদি পাই।

পরজ—রূপকড়া।

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
আর কোলাহল নাই।
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর
ধ্বনি শুনিবারে পাই।
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে,
নিবিড় আঁধার ঘনাল বাহিরে,
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে
জ্বলিতেছে একঠাঁই।
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী
খেলা হল সমাধান,
চপল চঞ্চল লহরীলীলা
পারাবারে অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয়মাঝে
শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপ কান্তি নিরখি অন্তরে
মুদিতলোচনে চাই।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল,
শান্ত হ'রে ওরে দীন!
হের চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে
সর্ব্ব চরাচর লীন।

শুনরে নিখিল-হৃদয়-নিস্যন্দিত
শূন্যতলে উথলে জয় সঙ্গীত,
হের বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গিত,
নন্দিত নিত্য নবীন।
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন
নাহি দুঃখ সুখ তাপ;
নির্ম্মল নিষ্কল নির্ভয় অক্ষয়
নাহি জরাজ্বর পাপ।
চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন,
প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন,
সান্ত্বন অন্তবিহীন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩১২।৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৪৩। ৬
সমষ্টি	...	৮৫৫॥৵৬
ব্যয়	...	৩০৩॥৵৩
স্থিত	...	৫৫২ ৻৩

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত ৫২৻৩

৫৫২৻৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ .... ১৯৭৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত
২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর
৫৲

১৯৭৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৮৸০
পুস্তকালয়	...	৵০
যন্ত্রালয়	...	৯৪॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		২৲
সমষ্টি		৩১২।৵০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২০।৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৮ ৻৬
পুস্তকালয়	...	৶০
যন্ত্রালয়	...	৬৫ ৻৯
সমষ্টি		৩০৩॥৵৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

পঞ্চদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩।

৭১৬ সংখ্যা　　　　১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। [illegible] চৈত্র রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল।৶০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

পঞ্চদশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩।

৭১৬ সংখ্যা ১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ষষ্ঠপ্রপাঠকে

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

হরিঃ ওঁ। শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তংহ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সৌম্যাঽস্মৎ কুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি। ১।

'শ্বেতকেতুঃ ইতি' নামতঃ 'হ' ইত্যৈতিহার্থং। 'আরুণেয়ঃ' অরুণস্য পৌত্রঃ 'আস' বভূব। 'তং' পুত্রং 'হ' 'পিতা' আরুণিঃ তস্যোপনয়নকালাত্যয়ং পশ্যন্ 'উবাচ' হে 'শ্বেতকেতো' গুরুং কুলস্য নো গত্বা 'বস' 'ব্রহ্মচর্য্যং' 'ন বৈ' এতদ্যুক্তং যদস্মৎকুলীনঃ হে 'সৌম্য' 'অননূচ্য' অনধীত্য 'ব্রহ্মবন্ধুঃ ইব ভবতি ইতি' ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ ইতি। ১।

আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতা বলিলেন, হে শ্বেতকেতু! আচার্য্যকুলে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাদের বংশে অধ্যয়ন হীন হইয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় থাকা উচিত নহে। ১।

সহদ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনাঽনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তংহ পিতোবাচ। ২।

'সঃহ শ্বেতকেতুঃ' 'দ্বাদশবর্ষঃ' সন্ 'উপেত্য' আচার্য্যং যাবৎ 'চতুর্বিংশতিবর্ষঃ' বভূব, তাবৎ 'সর্ব্বান্ বেদান্' 'অধীত্য' 'মহামনাঃ' মহদ্গাম্ভীরং মনো যস্য স মমাত্মানং অন্যৈর্মন্যমানং মনো যস্য সোঽয়ং মহামনাঃ 'অনূচানমানী' অনূচানমাত্মানং মন্যত এবং-শীলো যঃ সঃ অনূচানমানী 'স্তব্ধঃ' অপ্রণতস্বভাবঃ 'এয়ায়' গৃহং। 'তং' এবম্ভূতং দৃষ্ট্বা 'পিতা' 'উবাচ'। ২।

সেই শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়সে গুরুগৃহে গিয়া চতুর্বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সমগ্র বেদ অধ্যয়নানন্তর আপনাকে মহামনা ও বেদবচনপটু মনে করিয়া অপ্রণত স্বভাবে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতা বলিলেন। ২।

শ্বেতকেতো যন্নু সৌম্যেদং মহামনাঽনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। ৩।

হে 'শ্বেতকেতো' 'যৎ নু ইদং' 'সৌম্য' 'মহামনাঃ' 'অনূচানমানী' 'স্তব্ধঃ' 'অসি' 'উত' 'তং' আচার্য্যং 'আদেশং' আদিশ্যতইত্যাদেশঃ। যেন পরংব্রহ্মাদিশ্যতে ঽসাবাদেশঃ 'অপ্রাক্ষ্যঃ' পৃষ্টবানসি। তমাদেশং বিশিনষ্টি 'যেন' আদেশেন শ্রুতেন 'অশ্রুতং' অপ্যন্যৎ 'শ্রুতং' 'ভবতি' 'অমতং' অতর্কিতং 'মতং' তর্কিতং 'অবিজ্ঞাতং' অনিশ্চিতং 'বিজ্ঞাতং' নিশ্চিতং ভবতি 'ইতি'। ৩।

হে সৌম্য শ্বেতকেতু, যেহেতুক এই যে তুমি মহাগম্ভীর বেদজ্ঞানাভিমানী এবং অপ্রণত-স্বভাব হইয়া রহিয়াছ, কিন্তু তুমি কি আচার্য্যকে সেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা দ্বারা অশ্রুত পদার্থ শ্রুত হয়, অসম্ভাবিত সম্ভাবিত হয় এবং অনিশ্চিত বস্তুর নিশ্চয় হয়? ৩।

কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি। যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং। ৪।

'কথং নু' কেন প্রকারেণ হে 'ভগবঃ' 'সঃ আদেশঃ' 'ভবতি ইতি'। যথা স আদেশো ভবতি তচ্ছৃণু হে সৌম্য। 'যথা' লোকে 'একেন' 'মৃৎপিণ্ডেন' রুচককুম্ভাদিকারণভূতেন বিজ্ঞাতেন 'সর্ব্বং' অন্যদ্বিকারজাতং 'মৃণ্ময়ং' মৃদ্বিকারজাতং 'বিজ্ঞাতং' 'স্যাৎ' 'বাচারম্ভণং' বাগারম্ভণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ। কোঽসৌ 'বিকারঃ' 'নামধেয়ং' নামৈব নামধেয়ং। বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং বিকারো নাম বস্ত্বস্তি পরমার্থতঃ 'মৃত্তিকা' 'ইতি' 'এব' মৃত্তিকৈব 'সত্যং' বস্ত্বস্তি। ৪।

হে ভগবন্! সে তত্ত্ব কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন। হে সৌম্য, যেমন এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানদ্বারা মৃণ্ময় সকল বস্তুরই জ্ঞান হয় কিন্তু বাক্যাবলম্বনপ্রযুক্ত নামটাই তাহার বিকার পরন্তু মৃত্তিকাই সত্য। ৪।

যথা সৌম্যেকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যং। ৫।

'যথা' 'সৌম্য' 'একেন' 'লোহমণিনা' সুবর্ণপিণ্ডেন 'সর্ব্বং' 'লোহময়ং' অন্যদ্বিকারজাতং কটকমুকুটকেয়ূরাদি 'বিজ্ঞাতং স্যাৎ' 'বাচারম্ভণং' 'বিকারঃ নামধেয়ং' 'লোহং ইতি এব সত্যং' সমানং। ৫।

হে সৌম্য, যেমন এক সুবর্ণপিণ্ডের জ্ঞান দ্বারা সুবর্ণময় সকল বস্তুরই জ্ঞান হয়, কিন্তু বাক্যাবলম্বন প্রযুক্ত নামটাই তাহার বিকার পরন্তু সুবর্ণই সত্য। ৫।

যথা সৌম্যেকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কার্ষ্ণায়সমিত্যেব সত্যং এবং সৌম্য স আদেশো ভবতীতি। ৬।

'যথা' 'সৌম্য' 'একেন' 'নখনিকৃন্তনেন' উপলক্ষিতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেনেত্যর্থঃ 'সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং' কৃষ্ণায়সো বিকারজাতং 'বিজ্ঞাতং' 'স্যাৎ' 'বাচারম্ভণং' 'বিকারঃ নামধেয়ং' 'কৃষ্ণায়সং ইতি এব' 'সত্যং'। 'এবং' হে 'সৌম্য' 'সঃ আদেশঃ' যো ময়োক্তঃ 'ভবতি ইতি'। ৬।

হে সৌম্য, যেমন এক লৌহপিণ্ডের জ্ঞান দ্বারা লৌহময় সকল বস্তুরই জ্ঞান হয়, কিন্তু বাক্যাবলম্বন প্রযুক্ত নামটাই তাহার বিকার, পরন্তু লৌহই সত্য। হে সৌম্য, সে তত্ত্ব এইরূপ। ৬।

ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেবমেতদ্ব্রবীত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ। ৭। ১।

ইত্যুক্তবতি পিতর্য্যাহেতরঃ 'ন বৈ নূনং' 'ভগবন্তঃ' পূজাবন্তো গুরবো মম যে 'তে' 'এতৎ' ভগবদুক্ত বস্তু ন 'অবেদিষুঃ' ন বিজ্ঞাতবন্তো নূনং। 'যৎ' যদি 'হি' 'এতৎ' 'অবেদিষ্যন্' বিদিতবন্তঃ এতদ্বস্তু 'কথং' 'মে' 'ন' 'অবক্ষ্যন্' উক্তবন্তঃ 'ইতি'। 'ভগবান্ তু এব' 'মে' মহ্যম্ 'তৎ' বস্তু যেন সর্ব্বজ্ঞত্বং জ্ঞাতেন মে স্যাৎ 'তৎ' 'ব্রবীতু' কথয়তু 'ইতি' পিতা 'হ উবাচ' 'তথা' 'সৌম্য' 'ইতি'। ৭। ১।

শ্বেতকেতু বলিলেন—

সেই ভগবান্ আচার্য্যেরা এ তত্ত্ব জানিতেন না, যদি জানিতেন তবে আমাকে না বলিবেন কেন? মহাশয়ই আমাকে এই তত্ত্ব বলুন। তথাস্তু সৌম্য! বলিয়া, আরুণি বলিতে লাগিলেন। ৭। ১।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত। ১।

'সৎ' সদিত্যাস্তিত্বমাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং সর্ব্বগতং একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানং যদবগম্যতে সর্ব্ববেদান্তেভ্যঃ। 'এব' শব্দোঽবধারণার্থঃ। হে 'সৌম্য' 'ইদমগ্রে' অস্যাগ্রে জগতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ 'আসীৎ' 'একংএব' তস্য একস্য সহকারিকারণং দ্বিতীয়ং অনাদিবস্ত্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে 'অদ্বিতীয়ম্' নাস্য দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং বিদ্যতে। 'তৎ হ' তত্র এতস্মিন্ প্রাগুৎপত্তের্বস্তুনিরূপণে 'একে' বৈনাশিকাঃ 'আহুঃ' 'অসৎ' অভাবমাত্রং 'এব' 'ইদমগ্রে' প্রাগুৎপত্তেঃ 'আসীৎ' 'একং এব অদ্বিতীয়ং' 'তস্মাৎ' 'অসতঃ' সর্ব্বাভাবরূপাৎ 'সৎ' বিদ্যমানরূপং 'জায়েত' সমুৎপন্নং। ১।

হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ মাত্রই ছিলেন। এই সৃষ্টির উৎপত্তিতত্ত্ব বিষয়ে কেহ কেহ বলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় অভাব মাত্রই ছিল, তাহা হইতেই এই সৎ পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ১।

কুতস্তু খলু সৌম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। ২।

'কুতঃ তু' প্রমাণাৎ 'খলু' হে 'সৌম্য' 'এবং স্যাৎ' 'ইতি' 'হ' 'উবাচ' 'কথং' 'অসতঃ সজ্জায়েত' 'ইতি' এবং কুতো ভবেৎ। এবমসদ্বাদিপক্ষমুন্মথ্যোপসংহরতি 'সৎ তু এব' হে 'সৌম্য' 'ইদমগ্রে' 'আসীৎ' 'একং এব অদ্বিতীয়ং' ইতি স্বপক্ষসিদ্ধিঃ। ২।

বলিলেন, হে সৌম্য! কি প্রকারে এইরূপ হইবেক? কি প্রকারে অসৎ হইতে সতের সম্ভাবনা? হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিলেন। ২।

তদৈক্ষ্যত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। তত্তেজোঽসৃজত। তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্যত্র কচ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে। ৩।

'তৎ' সৎ 'ঐক্ষত' ঈক্ষাং দর্শনং কৃতবান্ 'বহু' প্রভূতং 'স্যাং' ভবেয়ং 'প্রজায়েয়' প্রকর্ষেণোৎপদ্যেয় 'ইতি'। 'তৎ' সৎ 'তেজঃ অসৃজত' তেজঃ সৃষ্টবান্। 'তৎ' সৎ 'তেজঃ ঐক্ষত' তেজোরূপসংস্থিতং সদৈক্ষত 'বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি' পূর্ব্ববৎ 'তৎ অপঃ অসৃজত'। 'যস্মাত্তেজঃকার্য্যভূতা আপঃ 'তস্মাৎ' যত্র' দেশে কালে বা 'কচ' 'শোচতি' সন্তপ্যতে 'স্বেদতে' প্রস্বিদ্যতে 'বা' 'পুরুষঃ' 'তেজসঃ এব' 'তৎ আপঃ' 'অধিজায়ন্তে'। ৩।

সেই সৎ ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু প্রজার সৃষ্টি করি। তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজের অন্তর্যামী সৎ ইচ্ছা করিলেন আমি বহু প্রজার সৃষ্টি করি। তিনি অপের সৃষ্টি করিলেন। এই জন্য যদি কখন কোথায় কোন পুরুষ সন্তপ্ত হয় বা ঘর্ম্মাক্ত হয় তেজ হইতেই স্বেদ-রূপ জল বহির্গত হয়। ৩।

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি। তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্যত্র কচ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে। ৪। ২।

"'তা আপঃ ঐক্ষন্ত' পূর্ব্ববদেব অপসংস্থিতং সদৈক্ষতেত্যর্থঃ 'বহ্ব্যঃ' প্রভূতাঃ 'স্যাম' ভবেম 'প্রজায়েমহি ইতি' উৎপদ্যেমহীতি। 'তা' 'অন্নং' পৃথিবীলক্ষণং। পার্থিবং হ্যন্নং, যস্মাদপকার্য্যমন্নং 'তস্মাৎ যত্র ক চ' 'বর্ষতি' 'তৎ এব' তত্রৈব 'ভূয়িষ্ঠং' বহুতরং 'অন্নং ভবতি'। 'অদ্ভ্য এব তৎ অন্নাদ্যং' 'অধিজায়তে'। ৪।

সেই অপের অন্তর্যামী সৎ ইচ্ছা করিলেন আমি বহু প্রজার সৃষ্টি করি। তিনি অন্নের সৃষ্টি করিলেন। সেইজন্য যেখানে যে কেহ বর্ষণ করে সেই স্থানেই বহু অন্ন উৎপন্ন হয়। অপ হইতেই অন্নের উৎপত্তি হয়। ৪।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি। ১।

'তেষাং' জীবাবিষ্টানাং 'খলু এষাং' পক্ষ্যাদীনাং প্রত্যক্ষনির্দ্দেশান্নতু তেজঃপ্রভৃতীনাং 'ভূতানাং' পশুপক্ষিস্থাবরাদীনাং 'ত্রীণি এব' নাতিরিক্তানি 'বীজানি' কারণানি 'ভবন্তি'। কানি তানীত্যুচ্যন্তে। 'আণ্ডজং' অণ্ডাজ্জাতঃ অণ্ডজমেবাণ্ডজং পক্ষ্যাদি। পক্ষিসর্পাদিভ্যো হি পক্ষিসর্পাদয়ো জায়মানা দৃশ্যন্তে। তেন পক্ষী পক্ষিণাং বীজং সর্পঃ সর্পাণাং বীজং ইত্যর্থঃ। তথা 'জীবজং'

জীবাজ্জাতং জরায়ুজমিত্যেতৎপুরুষপশ্বাদি। 'উদ্ভিজ্জং ইতি' উদ্ভিৎস্থাবরং ততোজাতং। স্বেদজসংশোকজয়োঃ স্বাণ্ডজোদ্ভিজ্জয়োরেবযথাসম্ভবমন্তর্ভাবঃ। ১।

জীবনাবিষ্ট ভূত সকলের তিনটি কারণ—আণ্ডজ, জীবজ এবং উদ্ভিজ্জ। ১।

সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি। ২।

'সা ইয়ং দেবতা' প্রকৃতা সদাখ্যা 'ঐক্ষত' ঈক্ষাং কৃতবতী 'হন্ত' ইদানীং 'অহং' 'ইমাঃ' যথোক্তাস্তেজ আদ্যাঃ 'তিস্রঃ দেবতা' 'অনেন জীবেন আত্মনা' প্রাণধারণকর্ত্রাত্মনা 'অনুপ্রবিশ্য' লব্ধবিশেষবিজ্ঞানাসতী 'নামরূপে' নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে 'ব্যাকরবাণি ইতি' বিস্পষ্টমকরবাণি। অসৌ নামায়মিদং রূপমিতি ব্যাকুর্য্যামিত্যর্থঃ। ২।

সেই সদাখ্যা দেবতা ইচ্ছা করিলেন, এখন আমি এই তেজাদি তিন দেবতা ও ভোক্তা জীবের সম্মিলন সাধনানন্তর নামরূপ প্রকাশ করি। ২।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ। ৩।

'তাসাং' তিসৃণাং দেবতানাং 'ত্রিবৃতং' 'ত্রিবৃতং' 'একৈকাং' 'করবাণি ইতি' ঈক্ষিত্বা 'সা' 'ইয়ং' 'দেবতা' 'ইমাঃতিস্রঃ দেবতা' 'অনেন' 'এব' 'জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য' 'নামরূপে' 'ব্যাকরোৎ'। ৩।

সেই তিন দেবতার এক এককে ত্রিগুণান্বিত করি, এই ইচ্ছা করিয়া সেই সৎ এই তিন দেবতা ও ভোক্তা জীবের সম্মিলন সাধন পূর্ব্বক নামরূপ ব্যক্ত করিলেন। ৩।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্যথা নু খলু সৌম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি। ৪। ৩

'তাসাং' দেবতানাং গুণপ্রধানভাবেন 'ত্রিবৃতং' 'ত্রিবৃতং' 'একৈকাং' 'অকরোৎ' প্রথমমেকৈকাং দেবতাং দ্বিধা। দ্বিধা বিভজ্য পুনরেকৈকং ভাগং দ্বিধা দ্বিধা কৃত্বা তদিতরভাগয়োর্নিঃক্ষিপ্য ত্রিবৃৎকরণং বিবক্ষিতং। 'যথা' 'নু খলু' 'সৌম্য' 'ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ' 'ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ' 'একৈকা ভবতি' 'তৎ মে বিজানীহি ইতি'। ৪। ৩।

সেইদেবতাদিগের এক এককে ত্রিগুণান্বিত করিলেন। হে সৌম্য! এই তিন দেবতার এক এক দেবতা যে প্রকারে ত্রিগুণান্বিত হয়েন তাহা আমার নিকটে বিদিত হও। ৪। ৩।

তাৎপর্য্য—

তেজ, জল, অন্ন এই তিন ভূতকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্দ্ধকে পুনর্ব্বার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বায় অর্দ্ধ ব্যতীত অন্য দুই অর্দ্ধে এক এক খণ্ড যোজিত করার নাম ত্রিবৃৎকরা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং। ১।

তদেতদাহ 'যৎ' 'অগ্নেঃ' ত্রিবৃৎকৃতস্য 'রোহিতং' 'রূপং' প্রসিদ্ধং লোকে 'তেজসঃ' 'তৎ' অত্রিবৃৎকৃতস্য তেজসঃ 'রূপং' ইতি বিদ্ধি। তথাচ 'যৎ শুক্লং' রূপং 'তৎ অপাং' অত্রিবৃৎকৃতানাং 'যৎ কৃষ্ণং' তস্যৈবাগ্নে রূপং 'তৎ' 'অন্নস্য' পৃথিব্যা অত্রিবৃৎকৃতায়াইতি বিদ্ধি। তত্রৈবং সতি রূপত্রয়ব্যতিরেকেনাগ্নিরিতি যন্মন্যসে ত্বং তস্য 'অপাগাৎ' অপগতং 'অগ্নেঃ' 'অগ্নিত্বং'। নৈবং বুদ্ধিঃ শব্দমাত্রমেব হ্যগ্নির্যত আহ 'বাচারম্ভণং' অগ্নির্নাম 'বিকারঃ, নামধেয়ং' নামমাত্রমিত্যর্থঃ অতোঽগ্নিবুদ্ধির্মৃষৈব। তর্হি কিং তত্র সত্যং 'ত্রীণি রূপাণি ইতি এব' 'সত্যং' নাণুমাত্রমপি রূপত্রয়ব্যতিরেকেন সত্যমস্তীত্যবধারণার্থঃ। ১।

অগ্নির যাহা লোহিত রূপ তাহা তেজেরই রূপ। অগ্নির যাহা শ্বেতরূপ তাহা অপের রূপ। অগ্নির যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের রূপ। অতএব বাক্যাবলম্বন নামধেয়

বিকার মাত্র যে অগ্নির অগ্নিত্ব তাহা অপগত হইল। তিন রূপই সত্য রহিল। ১।

যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যস্যাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং. বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং। ২।

তথা 'যৎ' 'আদিত্যস্য রোহিতং রূপং' 'তেজসঃ তৎ রূপং' 'যৎ শুক্লং তৎ অপাং' 'যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য' 'অপাগাৎ' অপগতং 'আদিত্যস্য আদিত্যত্বং' 'বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং' 'ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যং'। ২।

আদিত্যের যাহা লোহিত রূপ তাহা তেজেরই রূপ। আদিত্যের যাহা শুক্ল রূপ তাহা অপের রূপ। আদিত্যের যাহা কৃষ্ণ রূপ তাহা অন্নের রূপ। অতএব বাক্যাবলম্বন নামধেয় বিকার মাত্র যে আদিত্যের আদিত্যত্ব তাহা অপগত হইল। তিন রূপই সত্য রহিল। ২।

যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণাত্যেব সত্যং। ৩।

তথা 'যৎ চন্দ্রমসঃ রোহিতং রূপং' 'তেজসঃ তৎ রূপং' 'যৎ শুক্লং তৎ অপাং' 'যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য' 'অপাগাৎ' 'চন্দ্রাৎ চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং' 'ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যং'। ৩।

চন্দ্রমার যাহা লোহিত রূপ তাহা তেজের রূপ। চন্দ্রমার যাহা শুক্ল রূপ তাহা অপের রূপ। চন্দ্রমার যাহা কৃষ্ণ রূপ তাহা অন্নের রূপ। অতএব বাক্যাবলম্বন নামধেয় বিকার মাত্র যে চন্দ্রের চন্দ্রত্ব তাহা অপগত হইল। তিন রূপই সত্য রহিল। ৩।

---

* এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ।

১। ভাল হইতে চাও তো আগে আপনাকে মন্দ বলিয়া বিশ্বাস কর।

২। যাহারা প্রকৃত উপায়ে, তত্ত্বজ্ঞানে যথারীতি প্রবেশ করিতে চাহে, অন্ততঃ তাহাদের জানা উচিত যে, নিজের দুর্ব্বলতা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভে নিজের অক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করাই তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ।

৩। পৃথিবীতে যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হই, তখন জ্যামিতির সমকৌণিক ত্রিভুজ, সঙ্গীতের কোমল, অতি কোমল স্বর—এ সকল বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোন সহজ স্বাভাবিক ধারণা থাকে না, পরন্তু বিদ্যার ধারাবাহিক শিক্ষার ফলেই আমরা পরে ঐ সব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি। আর দেখ, যাহারা ঐ সকল বিষয় কিছুই জানে না, তাহারা জানে বলিয়া মনেও করে না। কিন্তু ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—এমন কে আছে যে এই সকল বিষয়ের স্বাভাবিক সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ না

* এপিক্‌টেটস্ প্রথম শতাব্দির আরম্ভে, "ফ্রিজিয়া"-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "ষ্টোয়িক"-সম্প্রদায়-ভুক্ত রোমক তত্ত্বজ্ঞানী। ইনি প্রথমে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। ইহাঁর প্রভু ইহাঁর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। কথিত আছে, একদিন প্রভু আমোদ করিয়া ইহাঁর পায়ে মোচড় দিতে লাগিলেন। এপিক্‌টেটস্ বলিলেন:- "ওরূপ মোচড় দিতে-দিতে আমার পা ভাঙ্গিয়া যাইবে।" তাঁহার প্রভু তথাপি নিরস্ত হইলেন না, তাঁহার পা ভাঙিয়া গেল। এপিক্‌টেটস্ অবিচলিত প্রশান্ত ভাবে শুধু এই বাক্যটি বলিলেন: "তখনই তো আমি বলিয়াছিলাম, ওরূপ করিলে আমার পা ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

৯৪ খৃষ্টাব্দে রোমক-সম্রাট ডোমিশিয়ান্ একটা আইন জারি করিয়া রোম হইতে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে এপিক্‌টিটস্ স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিকোপোলিস্ নগরে বাস স্থাপন করেন। সেইখানে তাঁহার বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত শিষ্যমণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তিনি মুখে যে সব উপদেশ দিতেন "আরিয়ান" নামক তাঁহার এক উপযুক্ত শিষ্য, তাহা পরে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তাহারই সারমর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

করে? এইরূপ, আমরা সকলেই ঐ-সকল শব্দ ব্যবহার করি, এবং প্রত্যেক বিশেষ-বিশেষ বিষয়ের সহিত, ঐ স্বাভাবিক সংস্কারগুলি যাহাতে খাপ্ খায়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। "অমুক লোক ভাল কাজ করিয়াছে," "ঠিক্ করিয়াছে," "ঠিক্ করে নাই," "অমুক লোক সৎ" "অমুক লোক অসৎ"—আমাদের মধ্যে কে আছে যে এই সকল কথা ব্যবহার না করে? এমন কে আছে যে এই সকল কথা ব্যবহার করিবার জন্য জ্যামিতি কিম্বা সঙ্গীতের ন্যায় শিক্ষার অপেক্ষা রাখে? তাহার কারণ এই যে, আমরা ঐ সকল বিষয়ে যেন পূর্ব্ব-হইতেই শিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করি; এবং গোড়ায় ঐ সকল সংস্কার লাভ করিয়া, আমরা পরে উহাতে আমাদের কতকগুলি নিজের মতামত যোগ করিয়া দেই।

যদি কাহাকে বলা যায়, তোমার এই কাজটি করা ভাল হয় নাই সে হয় তো বলিবে "কেন, ভাল মন্দ কাহাকে বলে আমি কি তাহা জানি না?—এ সম্বন্ধে আমার কি ধারণা নাই?"

—"হাঁ, তোমার ধারণা আছে সত্য।"

—"আর, ঐ ধারণা আমি কি প্রত্যেক পৃথক্-পৃথক্ বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া থাকি না?"

—"হাঁ, তুমি প্রয়োগ করিয়া থাক।"

—"আমি কি তবে ঠিক্-মতো প্রয়োগ করি না?"

এইখানেই আসল প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এবং এইখানেই নিজের কল্পিত মতামত প্রবেশ করিবার অবসর পায়। যে-সকল বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত তাহা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, ভ্রান্ত প্রয়োগের দ্বারা আমরা বাদবিসম্বাদের বিষয়ে অবতরণ করি। "তোমরা মনে করিতেছ, তোমাদের স্বাভাবিক সংস্কারগুলি, প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে তোমরা ঠিক্-মতো প্রয়োগ করিয়া থাক; আচ্ছা, তোমাদের এইরূপ বিশ্বাসের হেতু কি?"

—"কারণ, আমার মনে হইতেছে, ইহা ঠিক্।"

—"কিন্তু আর একজনের যে অন্যরূপ মনে হইতে পারে, তাহার কি করিলে? সেও কি তাহার প্রয়োগটি ঠিক্ বলিয়া মনে করিতেছে না?"

—"হাঁ, সে ঠিক্ বলিয়াই মনে করিতেছে।"

—"আচ্ছা তবে, যে-সব বিষয়ে তোমাদের মত পরস্পর-বিরোধী, সেই সব বিষয়ে তোমরা উভয়েই কি, তোমাদের সংস্কারগুলি ঠিক্-মতো প্রয়োগ করিয়াছ?"

—"না, তাহা হইতে পারে না।"

—"তবে, তুমি এমন কিছু কি দেখাইতে পার যাহা তোমার "মনে হওয়া"-অপেক্ষা আরও কিছু বেশি?" একজন পাগলও তো বলে, সে যাহা মনে করিতেছে তাহাই ঠিক্। তাহার পক্ষেও কি এই "মনে হওয়া"র যুক্তিটি যথেষ্ট?"

—"না যথেষ্ট নহে।"

—"এখন কথা হইতেছে, যাহা "মনে-হওয়া"রও উপরে—সেটি কি?"

৪। এখন তবে দেখ, তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ কোথায়। কি করিয়া মনুষ্যগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করে, কোথা হইতে এই পরস্পর-বিরোধিতা উৎপন্ন হয়, মত-মাত্রই বিশ্বাস-যোগ্য কি না, এই সমস্ত সম্যক্‌রূপে দর্শন করাই দর্শনশাস্ত্রের আরম্ভ। যাহা মনে হইতেছে তাহা ঠিক্ কি না, এবং আমরা যেমন তুলাদণ্ডের দ্বারা ওজন ঠিক্ করি, ওলন-সূতার দ্বারা সোজা-বাঁকা স্থির করি, সেইরূপ এই স্বাভাবিক

সংস্কারের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না, তাহারই অনুসন্ধান করা তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। যাহা আমার মনে হয়, তাহাই কি ঠিক্? কিন্তু তাহা হইলে যে-সকল বিষয় পরস্পর-বিরোধী তাহারা সকলই কেমন করিয়া ঠিক্ হইতে পারে?

—"যাহা মনে হয়, তাহাই ঠিক্, এ কথা আমি বলিতেছি না। ঠিক্ বলিয়া যাহা আমার বিশ্বাস হয়, তাহাই ঠিক্।"

"তোমার ঠিক্ বলিয়া যাহা মনে হইতেছে, ঠিক্ তাহার উল্টা বিশ্বাস অন্যের মনে হইতে পারে। অতএব, "মনে হওয়া" আর "বাস্তবিক হওয়া" সকলের পক্ষে সমান কথা নহে। দেখ, ওজন কিম্বা মাপের সময় আমরা "মনে হওয়া"র উপর নির্ভর করি না—তাহাতে সন্তুষ্ট হই না। পরন্তু উভয় স্থলেই, আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ করি। তবে কি শুধু তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়েই "মনে হওয়া"-ছাড়া আর কোন নিয়ম নাই? আর, একি কখন সম্ভব, যাহা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহার কোন প্রমাণ নাই—আবিষ্কারেরও কোন উপায় নাই। অবশ্যই তাহার একটা কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে—প্রমাণ আছে। সেই নিয়ম কি, বাহির করিতে চেষ্টা কর। তাহা বাহির করিতে পারিলে সকল-প্রকার পাগ্‌লামি ঘুচিয়া যাইবে। তাহা হইলে "মনে-হওয়া"র ভ্রান্তি-প্রবণ মান-দণ্ডে আর আমরা বস্তু-সমূহের পরিমাপ করিব না।

৫। আমরা এখন কোন্ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছি?—সুখের? আচ্ছা, উহাকে তবে সেই নিয়মের হাতে সমর্পণ কর—সেই তৌলদণ্ডে তাহাকে স্থাপন কর।

—"আচ্ছা, শ্রেয় এমন একটি জিনিস কি না, যাহার উপর নির্ভর করা আমাদের কর্ত্তব্য?"

—"নিশ্চয়ই শ্রেয়ের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য।"

—"আর শ্রেয়কে বিশ্বাস করা উচিত কি না?"

—"হাঁ, বিশ্বাস করা উচিত।"

—"আচ্ছা, যাহা অস্থায়ী তাহার উপর আমরা নির্ভর করিতে পারি কি না"?

—"না, পারি না।"

—"আচ্ছা, সুখের কি কোন স্থায়িত্ব আছে?"

—"না, স্থায়িত্ব নাই।"

আচ্ছা তবে সুখকে অর্থাৎ প্রেয়কে শ্রেয়ের স্থান হইতে সরাইয়া ফেলিয়া তৌলদণ্ড হইতে দূরে নিক্ষেপ কর। কিন্তু যদি তোমার চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়, একটি তৌলদণ্ডকে যদি যথেষ্ট মনে না কর, তাহা হইলে আর একটি তৌলদণ্ড গ্রহণ কর।

—"যাহা শ্রেয় তাহাতেই আনন্দ লাভ করা ঠিক্ কি না?"

—"হাঁ, তাহাই ঠিক্।"

—"আর, সুখের সামগ্রীতে আনন্দলাভ করা কি ঠিক্?"

এই সকল বিষয় তৌলদণ্ডে ভাল করিয়া ওজন করিয়া তবে উত্তর দিও।

নিয়মটি যদি তোমার হস্তগত হয়, তাহা হইলে এই সকল বিষয়ের বিচার করা—পরিমাপ করা তোমার পক্ষে সহজ হইবে।

এই নিয়ম-সকল পরীক্ষা করা,—স্থাপন করাই তত্ত্ববিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং এই নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হইলে, তাহা জীবনে ব্যবহার করাই তত্ত্বজ্ঞানী সাধু জনের কাজ।

—

রাজনীতি সংগ্রহ।

বুদ্ধিমান লোক সূর্য্যকরসন্তপ্ত নিতান্ত ক্লেশকর আশ্রয়শূন্য সুবিস্তীর্ণ মরুভূমির ন্যায় দুর্জনসঙ্গ ত্যাগ করিবে। দুর্জন অন্তরে প্রবেশ করিয়া অগ্নি যেমন শুষ্ক বৃক্ষকে সেইরূপ সুশীল সাধুকে অকস্মাৎ দগ্ধ করিয়া থাকে। যাহার নিশ্বাসে অগ্নি উদ্গীরিত হয় বরং সেই সর্পের সঙ্গ ভাল কিন্তু দুর্জনের সঙ্গ কিছুতেই স্পৃহনীয় নহে। লোকে সরল মনে যে হস্তে পিণ্ড দেয় দুর্বৃত্ত লোক মার্জ্জারের ন্যায় সেই হস্তই দংশন করিয়া থাকে। দুষ্ট ব্যক্তির মুখ বিষাক্ত সর্পের মুখ অপেক্ষাও ভীষণ। সে সময়ে সময়ে যে তীব্র বাক্‌বিষ উদ্গার করে উহার শান্তি করা মন্ত্রেরও অসাধ্য। পূজনীয় স্বজনের নিকট যেমন কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতে হয় হিতার্থী লোক দুর্জনের নিকট তদপেক্ষাও অধিকতর কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। নিত্য সম্মানপ্রদ বাক্যে সকলকে আহ্লাদিত করিবে, কঠোর ও ক্রূরভাষী ব্যক্তি দাতা হইলেও সকলের উদ্বেগের কারণ হয়। দুর্নীতিপরায়ণ লোকের তীব্র ও উদ্বেগকর কথা গুলি নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের ন্যায় বস্তুতই অন্যের মর্ম্মচ্ছেদন করিয়া থাকে। সুতরাং মেধাবী ব্যক্তি ঐরূপ দুর্বাক্য কদাচ মুখাগ্রে আনিবেন না। শত্রু বা মিত্রই হউক সর্ব্বদা সকলকেই প্রিয় কথা বলিবে। প্রিয় কথা মধুর কেকারবের ন্যায় কাহার না প্রিয়? বাঙ্‌মাধুরী পণ্ডিতের অলঙ্কার। হংস কোকিল ও ময়ূরের স্বরও তাদৃশ মনোহারী হয় না যেমন পণ্ডিতের বাঙ্‌মাধুর্য্য অন্যের মনোহরণ করিয়া থাকে। গুণানুরাগী দয়াবান ও শ্রদ্ধালু হইয়া প্রিয় বাক্যে ধর্ম্মার্থ দান করিবে। যাহারা সর্ব্বদা প্রিয় কথার সহিত অপরের সৎকার করিয়া থাকে সেই সমস্ত শ্রীমান লোক নরদেহধারী দেবতা। আত্মবৎ ভাবে মিত্রকে, সদ্ভাবে বান্ধবগণকে, প্রীতি দ্বারা স্ত্রী ও ভৃত্যবর্গকে ও উদারতায় অপর সকলকে বশীভূত করিবে। অন্যের কার্য্যে প্রশংসা, স্বধর্ম্মরক্ষা, দীনে দয়া, প্রাণ দিয়াও প্রকৃত মিত্রের উপকার, গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ, শক্ত্যনুসারে দান, সহিষ্ণুতা ও মিষ্ট বাক্য মহাত্মাদিগের স্বভাব। যাঁহারা এই রূপ সাধুপথ অবলম্বন করিয়া চলেন তাঁহাদের শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে।

রাজ্যের সাত অঙ্গ। ইহার একটী অঙ্গেরও বৈকল্য ঘটিলে রাজ্য সম্যক্ চলিতে পারে না। যিনি ইহার সম্পূর্ণতা ইচ্ছা করেন তিনি সর্ব্বদা ইহাকে পরীক্ষা করিবেন। প্রথমেই তো আপনাকে গুণবৎ করা চাই। নিজে গুণী না হইলে এই পরীক্ষা কার্য্য চলিতে পারে না। আত্মসংস্কারের উপরই রাজভাব সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত। যে সম্পদ দুর্লভ কৃতাত্মা না হইলে তাহার স্থায়িতা নাই। কুল শীল সত্ত্ব দাক্ষিণ্য ক্ষিপ্রকারিতা সত্য বৃদ্ধসেবা দূরদৃষ্টি উৎসাহ সূক্ষ্মদর্শিত্ব ধার্ম্মিকতা বিনয় ইত্যাদি সদ্‌গুণ যাঁর আছে সেই রাজাই লোকের অভিগম্য। যত্ন সহকারে এই সমস্ত সদ্‌গুণ লাভের চেষ্টা আবশ্যক। ইহাই আত্মসংস্কার। যে রাজা আত্মহিতার্থী তিনি সদ্বংশীয় সরল লোকসংগ্রাহী শুদ্ধস্বভাব অমাত্যাদি পরিবার রক্ষা করিবেন। রাজা দুষ্ট হইলেও পরিবার-গুণেই ভোগ্য হন। যিনি ক্রূর-পরিবার তিনি সসর্প বৃক্ষের ন্যায় দূর হইতেই ত্যাজ্য। দুষ্টপ্রকৃতি মন্ত্রী সাধু সজ্জনের পথরোধ করিয়া নিজেই রাজাকে ভক্ষণ করে অতএব অগ্রে পরীক্ষা করিয়া সমন্ত্রী রাখিবে। ঐশ্বর্য্যের ফলই সৎপ্রতিপালন, ইহার অভাবে ঐশ্বর্য্য

বৃথা। অসৎই অসতের সম্পদ ভোগ করে, কিম্পাক বৃক্ষের ফল কেবল কাকেই খায়, অন্যে নহে। যে রাজা বাগ্মী বলবান নিপুণ অভিযোগসহিষ্ণু প্রতিকারপর ও সন্ধিবিগ্রহতত্ত্বজ্ঞ, যিনি পরছিদ্র উপেক্ষা করেন না, যাঁহার মন্ত্রণা অতিগূঢ়, যিনি দেশকালজ্ঞ সৎপাত্রবিচারে সুনিপুণ, যাঁহাতে ক্রোধ লোভ ভয় দ্রোহ ও চপলতা নাই, পরোপতাপ খলতা মাৎসর্য্য ঈর্ষা ও অসত্য স্থান পায় না, যিনি গুণানুরাগী মধুর-দর্শন, যিনি বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং হাঁসিয়া কথা কহেন সেই রাজাই লোকপ্রিয়। এই সমস্ত গুণই রাজার আত্ম-সম্পদ। সকলে পিতার ন্যায় ঐ রাজার উপর নির্ভর করিয়া সুখী হয়।

সার সত্যের আলোচনা।

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের মধ্যে একাত্মভাবের সূচনা।

বুদ্ধি, মন এবং প্রাণের মধ্যে একাত্মভাব কিরূপ, তাহা দেখিতে হইলে, বুদ্ধির নিজাধিকারের অভ্যন্তরেই মন এবং প্রাণ কিরূপ এক-যোগে কার্য্য করে, তাহার প্রতি প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধি বড়, মন মেজো, এবং প্রাণ ছোটো। যিনি যখন বড় হ'ন, তিনি ছোটো এবং মেজো'র ধাপ মাড়াইয়া বড়'র ধাপে উত্তীর্ণ হ'ন। বুদ্ধি—প্রাণ এবং মনের ধাপ মাড়াইয়া নিজাধিকারে সমুত্থান করিয়াছে; কাজেই মন এবং প্রাণের মধ্যে সত্ত্ব যাহা কিছু আছে, সবই বুদ্ধির মধ্যে একাধারে সম্ভুক্ত থাকিবারই কথা। বুদ্ধির নিজাধিকারে মন এবং প্রাণ কি ভাবে সম্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে হইলে, বুদ্ধির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করা আবশ্যক—সর্ব্বপ্রথমে তাহাই করা যা'ক্।

বুদ্ধির অঙ্গ-নির্ব্বাচন।

কি পশু, কি পক্ষী, কি মনুষ্য—নূতন নূতন অভাব-বোধ সকলকেই নূতন নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। একটা বন-মানুষ—যে ইতিপূর্ব্বে কোনো জন্মে জলে নাবে নাই, তাহাকে যদি একদল শিকারী ঘেরাও করে, তাহা হইলে—পলাইবার আর কোনো পথ না থাকিলে—সম্মুখস্থিত নদীতে ঝম্প-প্রদান করিয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হওয়া তাহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে। বন-মানুষের এইরূপ যতপ্রকার বুদ্ধির কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই শুদ্ধ-কেবল অভাব-বোধের উত্তেজনায় উপস্থিত-মতে ঘটিয়া থাকে। বন-মানুষ কেন—ওরূপ সঙ্কটে পড়িলে জাত্-মানুষও অভাব-বোধের উত্তেজনায় ঐরূপে নদী পার হয়। কিন্তু মনুষ্য তাহাতেই ক্ষান্ত থাকে না। মনুষ্যের মনে যখন "নদী পার হওয়া আবশ্যক" এইরূপ একটি অভাব বোধ উপস্থিত হয়, তখন সে—আর কোনো জন্তু নদীতে সন্তরণ করে কি না, তাহা চিন্তা করে; তাহার পরে হংস কিরূপে সন্তরণ করে, মৎস্য কিরূপে সন্তরণ করে, নৌমীন Nautilus কিরূপে সন্তরণ করে, তাহা অনুসন্ধান করে; তাহার পরে, হংসের মুখ্য অবয়বের আদর্শ-অনুসারে একটা কাষ্ঠের বাহন নির্ম্মাণ করে; হংসের পদদ্বয়ের আদর্শ-অনুসারে তাহার দুইটা দাঁড় নির্ম্মাণ করে; মৎস্যের ল্যাজার আদর্শ-অনুসারে তাহার হাইল নির্ম্মাণ করে, নৌমীনের আদর্শ-অনুসারে তাহার পাইল্ নির্ম্মাণ করে; এইরূপ একটি বাহন নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দ্যায়—নৌকা।

মনে কর, কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য আমার একটা পাত্রের প্রয়োজন হই-

যাছে ; অথবা যাহা একই কথা—আমার মনে ঐরূপ একটা পাত্রের অভাব-বোধ হইয়াছে। প্রথমত সে পাত্রের উদর স্ফীত হওয়া চাই—কেন না, তাহা হইলে তাহার অভ্যন্তরে যথেষ্ট-পরিমাণ জল ধরিবে; দ্বিতীয়ত তাহার কণ্ঠ উদর-অপেক্ষা সরু ও হ্রস্ব হওয়া চাই এবং মুখরন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্ব বাহিরের দিকে বিকুঞ্চিত হওয়া চাই—কেন না, তাহা হইলে তাহার কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইবার সুবিধা হইবে। তৃতীয়ত তাহার উদর এবং কণ্ঠের মধ্যে পরিমাণের সৌসম্য থাকা চাই, এক কথায়—তাহা মানান্-সই হওয়া চাই ; কেন না, তাহা বেমানান্ হইলে আমার মন খুঁৎখুঁৎ করিবে এবং সেই কারণে তাহাকে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইবে। মৃত্তিকার উপাদানে আমি এইরূপ একটা পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম দিলাম—ঘট। তাহার পরে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, মৃত্তিকার উপাদানেই যে, ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই ;—যে-কোনো কঠিন উপাদানে ঐরূপ একটা পাত্র নির্ম্মিত হউক্ না কেন, তাহাতেই আমার কাজ চলিতে পারে। অতএব মৃত্তিকার উপাদান ঘটের মুখ্য অঙ্গ নহে। ঘটের মুখ্য অঙ্গ কি ? না, জল-ধারণ-ক্ষম কাঠিন্য—স্ফীত উদর, হ্রস্ব কণ্ঠ, বিকুঞ্চিত মুখরন্ধ্র, এবং সমস্তের আয়তনের পরিমাণ-সৌসম্য ; এই-গুলি ঘটের মুখ্য অঙ্গ। এইরূপে, ঘটের মধ্য হইতে তাহার মুখ্য অবয়বগুলি বিবিক্ত করিয়া লওয়াকে বিবেচনা কহে।

মনে কর, যেন আমিই ঘটের প্রথম উদ্ভাবন-কর্ত্তা এবং লোক-মধ্যে তাহার ব্যবহার-প্রচারের আমিই আদি-গুরু। আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঘট উদ্ভাবন করিয়াছি, এই-জন্য ঘট দেখিলেই একটি যুক্তি আমার মনে অতীব সুস্পষ্ট আকারে প্রতিভাত হয় : সে যুক্তি এই :—

যে-হেতু ইহা জল-ধারণ-ক্ষম কঠিন, স্ফীতোদর, হ্রস্ব-কণ্ঠ, বিকুঞ্চিত-মুখরন্ধ্র এবং আদ্যোপান্ত মানান্-সই, অতএব ইহা ঘট। যেহেতু এবং অতএবের মধ্যে এই যে যোগ, ইহার নাম যুক্তি। যুক্তি-শব্দের অর্থ যে এক-প্রকার যোজনা-ক্রিয়া, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। কিসের সহিত কিসের যোজনা ? যেহেতুর সহিত অতএবের যোজনা ; অথবা যাহা একই কথা—প্রমেয়ের সহিত প্রমাণের যোজনা। প্রমাণ-শব্দের যে অর্থ কি—তাহাও তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। প্রমাণ কি ? না, সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ের মান-কার্য্য কিনা মাপন-কার্য্য। "হস্ত প্রসারণ করা" বলিলে বুঝায়—হস্তকে সম্মুখ-দিকে সারণ করা কিনা সরানো বা বাড়ানো। "প্রতাপ-স্ফূর্ত্তি" বলিলে বুঝায়—সম্মুখ-দিকে তাপের বা প্রভাবের স্ফূর্ত্তি। তেমনি "প্রমাণ" বলিলে বুঝায়—সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ের মান-ক্রিয়া বা মাপন-ক্রিয়া। তাল-প্রমাণ তরঙ্গ বলিলে বুঝায় যে, তরঙ্গ এত উচ্চে উঠিতেছে যে, তাহা তাল-গাছ দিয়া মাপিয়া দেখিবার বস্তু। কোনো বস্তুকে মাপিয়া দেখিতে হইলে তাহার গাত্রে মানদণ্ড যোজনা করিতে হয়। যদি বলি যে, এই বস্ত্রখানি এত-হাত লম্বা, তবে তাহার প্রমাণ দেখাইতে হইলে, সেই বস্ত্রখানির দৈর্ঘ্য-অংশ বিস্তারিত করিয়া তাহাতে হস্ত-যোজনা করা আবশ্যক হয়। তেমনি "এটা ঘট," ইহার প্রমাণ দেখাইতে হইলে, ঘটের গাত্রে ঘটত্বের যোজনা করিতে হয়;—ঘটত্বের যোজনা কিরূপ ? না, ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকটি ভাবকে ঘটের মুখ্য অবয়ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি—সেইগুলির একত্র সমাবেশ। বলিতেছি "এটা ঘট"—

আচ্ছা। দেখা যা'ক্ তোমার কথা কতদূর সত্য ;—উহার উদর চৌকোণা বাক্সোর মতো—অতএব উহা ঘট নহে ; উহার কণ্ঠ কুঁজার মতো দীর্ঘ—অতএব উহা ঘট নহে। পক্ষান্তরে এ-বস্তুটার উদর স্ফীত, কণ্ঠ হ্রস্ব, মুখরন্ধ্র বিকুঞ্চিত, অতএব, এই বস্তুটাই ঘট। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বস্ত্রের দৈর্ঘ্য-অংশে হস্তযোজনা করিয়া আমরা যেমন বলি যে, বস্ত্রখানি এক-হাত লম্বা ; তেমনি ঘটের গাত্রে ঘটত্বের ভাব যোজনা করিয়া যখন আমরা দেখি যে, ঐ বস্তুটির সহিত ঐ ভাবটির ঠিক্ মিল রহিয়াছে, তখন আমরা বলি যে, এটা ঘটই বটে। বস্ত্রের ব্যালায়—বস্ত্র প্রমেয়, মানদণ্ড প্রমাণ ; ঘটের ব্যালায় ঘট প্রমেয়, ঘটত্ব প্রমাণ। বস্ত্রে মানদণ্ডের যোজনা এবং ঘটে ঘটত্বের যোজনা—দুইই প্রমাণ-শব্দের বাচ্য ; এবং বিশেষত শেষোক্ত-প্রকার যোজনা—অর্থাৎ ঘটে ঘটত্বের যোজনা—যুক্তি-শব্দের বাচ্য।

মনে কর, আমি একটা ঘটের দোকান খুলিয়া, তাহাতে কাংস্য-ঘট, রৌপ্য-ঘট, মৃদ্ঘট প্রভৃতি নানাপ্রকার ঘট সাজাইয়া রাখিলাম। অচিরে আমার সেই দোকানে ক্রেতাগণের গমনাগমন হইতে লাগিল। একজন ক্রেতা আমার দোকানে আসিয়া বারবার কাংস্য-ঘট ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার দোকানে কাংস্য-ঘট যত ছিল, সব যখন উঠিয়া গিয়াছে, তখন সে ব্যক্তি পুনরায় আমার দোকানে ঘট ক্রয় করিতে আসিল। আমি তাহাকে একটা মৃত্তিকার ঘট দেখাইলাম ; তাহা দেখিবামাত্র সে বলিল যে, এটা ঘটই বটে। এ যাহা সে বলিল—কিসের জোরে বলিল ? আমিই যখন ঘটের নূতন স্রষ্টিকার, আর, ইতিপূর্ব্বে কোনো ক্রেতার নিকটে আমি যখন মৃদ্ঘটের কথা-পর্য্যন্ত উত্থাপন করি নাই, তখন উপস্থিত ক্রেতা ইতিপূর্ব্বে মৃদ্ঘট চক্ষে দেখে নাই, ইহা নিঃসংশয় ; অথচ আমি তাহার সম্মুখে একটা মৃদ্ঘট উপস্থিত করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ সে বলিল, "এটা ঘটই বটে।" এ যাহা সে বলিল, কিসের জোরে বলিল ? কিসের জোরে বলিল, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ক্রেতাটি আমার দোকানে আসিয়া অনেকবার অনেকগুলি কাংস্য-ঘট ক্রয় করাতে, ঘট যে কিরূপ বস্তু, সে-সম্বন্ধে তাহার মনোমধ্যে একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; মৃদ্ঘট দেখিবামাত্র সেই-তাহার-মনের-সংস্কারটি উপস্থিত মৃদ্ঘটে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিল। তাহার ভিতরের সংস্কারটি ভিতর হইতে বাহিরে বিচরণ করিল—মনের মধ্য হইতে ঘটে বিচরণ করিল, আর অমনি সে বলিয়া উঠিল—"এটা ঘট।" ভাবের এইরূপ বিচরণ-ক্রিয়ার নাম বিচার ; ইংরাজিতে যাহাকে বলে—Judgment। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সেই যে ঘটের ভাব, যাহা ক্রেতার নিজেরই মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহা যে কি, তাহা সে জানে না ; কেন না, সে-ভাবটি তাহার মনের মধ্যে এখনো বিবেচনা দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। সে যখন বলিতেছে যে, "এটা ঘট," তখন তাহার সেই বিচার-কার্য্যেতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, ঘটের ভাব তাহার মনোমধ্যে আছে। তাহা যে তাহার মনোমধ্যে আছে—এটা তাহার কাজে প্রকাশ পাইতেছে ; কিন্তু তাহা যে কি তাহা তাহার জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে না। সে ব্যক্তি অভ্যস্ত সংস্কারের বলে ঠিক্‌ই বিচার করিয়াছিল যে, এটা ঘট ; কিন্তু হইলে হইবে কি—তাহা একটা সংস্কার বই নহে। পরদিন তাহার একজন বন্ধু তাহাকে বলিল—"ওটা দেখ্‌ছি হাঁড়ি!"

ইহা শুনিয়া তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হওয়াতে, সে আমার দোকানে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি আমাকে একটা হাঁড়ি দিয়াছ?" আমি তাহাকে বলিলাম যে, হাঁড়ির কণ্ঠ এরূপ কম-চওড়া হয় না, এবং হাঁড়ির মুখরন্ধ্র এরূপ বিকুঞ্চিত হয় না। তখন তাহার চক্ষু ফুটিল। প্রথমে তাহার মনে সহজেই এইরূপ একটা বিচার উপস্থিত হইয়াছিল যে, "এটা ঘট ;" কিন্তু সে বিচার অন্ধ-সংস্কার-মূলক। এবারে তাহার মনে সেই বিচারই দৃঢ়তা-প্রাপ্ত হইল—কিন্তু এবারকার বিচার পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধ সংস্কার নহে ; এবারকার বিচার বিবেচনাত্মক এবং যুক্তি-সম্ভাবিত। এবারে সে—ঘটত্ব কিসে হয় তাহা বিবেচনা-দ্বারা নিষ্কাসন করিয়া এবং সেই ঘটত্বকে ঘটের সহিত যোজনা করিয়া যুক্তি-পূর্ব্বক বিচার করিল যে, এটা ঘট।

এখানে একটি অতি নিগূঢ় রহস্য আছে; সেটা একে তো বুদ্ধিতে আয়ত্ত করা কঠিন—তাহাতে আবার মনে বুঝিলেও, মুখে কিংবা লেখনীতে বাহির করা কঠিন। কিন্তু তাহা কঠিন বলিয়া তাহাকে সরাইয়া রাখা উচিত হয় না। আমের শাঁস সরস বলিয়া তাহার আঁটিও যে সরস হইবে, এরূপ মনে করা অন্যায়। এইটি এখানে বিবেচনা করা উচিত যে, ভূমিতে আমের আঁটি নিক্ষেপ করিলেই আম-গাছ গজাইয়া ওঠে ; তাহার পরিবর্ত্তে আমের রস সিঞ্চন করিলে কোনো ফলই দর্শে না। বিষয়টা এই :—

অগ্নির দুই অঙ্গ—আলোক এবং উত্তাপ। যে অগ্নির উত্তাপই সর্ব্বস্ব, অথবা আলোকই সর্ব্বস্ব, সে অগ্নি অঙ্গহীন। যে অগ্নির উত্তাপ আছে—আলোক নাই, সে অগ্নি পরিস্ফুট অগ্নি নহে ; তেমনি আবার, যে অগ্নির আলোক আছে—উত্তাপ নাই, সে অগ্নি কাজের অগ্নি নহে। অগ্নির যেমন দুই অঙ্গ—উত্তাপ এবং আলোক ; বুদ্ধির তেমনি দুই অঙ্গ—বিচার এবং বিবেচনা। বুদ্ধির বিচার-স্ফূর্ত্তি বা বিচরণ-স্ফূর্ত্তি তাহার শক্তিপ্রধান অঙ্গ এবং বিবেচনা তাহার জ্ঞানপ্রধান অঙ্গ। যে বুদ্ধির বিবেচনা অপেক্ষা বিচার-স্ফূর্ত্তি বেশী প্রবল—সে বুদ্ধি উপস্থিত বুদ্ধি। যে বুদ্ধি বিচারে অপটু, কিন্তু বিবেচনায় সুনিপুণ, সে বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। না উপস্থিত বুদ্ধি—না বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি—অথচ দুইই একাধারে, এইরূপ তৃতীয় আর-এক-প্রকার বুদ্ধি আছে ; তাহার নাম প্রতিভা। উপস্থিত বুদ্ধি বিচার-প্রধান ; বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিবেচনা-প্রধান ; প্রতিভা যুক্তি-প্রধান। যুক্তি-শব্দে এখানে বুঝিতে হইবে জ্যান্ত যুক্তি ;—মৃত শাব্দিক যুক্তি বা পুঁথিগত যুক্তি বুঝিলে চলিবে না। একজন প্রতিভাশালী সুবিজ্ঞ চিকিৎসক যেরূপ যুক্তিতে রোগীর রোগ-নির্ণয় করেন, তাহা স্বতন্ত্র ; এবং একজন বিবিধ ইংরাজি-সংস্কৃত উপাধি-মালায় বিভূষিত আনাড়ি চিকিৎসক যেরূপ যুক্তিতে রোগ নির্ণয় করেন, তাহা স্বতন্ত্র। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যেরূপ যুক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহ সাজাইতেন তাহা স্বতন্ত্র, এবং তাঁহার বিপক্ষ দলের সেনাপতি যে রূপ যুক্তিতে ব্যূহ সাজাইতেন তাহা স্বতন্ত্র। পুঁথিগত যুক্তি যুক্তির একপ্রকার ভাণ—তা বই তাহা প্রকৃত যুক্তি নহে।

বিচারই বুদ্ধির শক্তি-অঙ্গ। বিচার-প্রধান বুদ্ধি স্বীয় শক্তি-প্রভাবে উপস্থিত-মতে কার্য্যোদ্ধার করে বলিয়া তাহার নাম আমরা দিই—উপস্থিত বুদ্ধি। বিচার যেমন বুদ্ধির শক্তি-অঙ্গ—বিবেচনা তেমনি বুদ্ধির জ্ঞানাঙ্গ। বিচার বুদ্ধির হাত-পা—বিবেচনা

বুদ্ধির চক্ষু। যে বুদ্ধিতে উপস্থিত বিচার এবং বৈজ্ঞানিক বিবেচনা, দুইই যুক্তি-সূত্রে গ্রথিত—তাহাই যুক্তি-প্রধান বুদ্ধি। যুক্তি-প্রধান বুদ্ধিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বুদ্ধি এবং তাহা-রই আর-এক নাম প্রতিভা। বিচার দক্ষিণ হস্তে কার্য্য করে; বিবেচনা বাম হস্তে কার্য্য করে; যুক্তি এক হস্তে দুই হস্তেরই কার্য্য করে। এ যাহা আমি রূপকচ্ছলে হেঁয়ালিচ্ছন্দে বলিলাম—ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, তাহা হইলেই তা-হার প্রকৃত তাৎপর্য্য সকলেরই বোধগম্য হইবে। একটি শিশুকে আমরা বলি অবোধ শিশু; কেন না, তাহার বুদ্ধি এখনো পরিস্ফুট হয় নাই। তাহার বুদ্ধি-আগুনের উত্তাপ আছে, কিন্তু আলোক নাই। সেই অবোধ শিশুও বুদ্ধি-চালনা করিয়া মাতৃভাষা আয়ত্ত করে—শুদ্ধ-কেবল স্বাভাবিকী বিচারশক্তির প্রভাবে। একজন ইংরাজ বিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্‌লা-ভাষা শিক্ষা করিলেও, সে, বাঙ্‌লা-ভাষা রীতিমত আয়ত্ত করিতে পারে না; কিন্তু একটি বাঙালীর ছেলে সাত বৎসরের মধ্যেই বাঙ্‌লা-ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফ্যালে—এটা সক-লেরই দ্যাখা কথা। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, স্বাভাবিক বিচার-স্ফূর্ত্তির শক্তি বেশী—যদিচ তাহার দৃষ্টি কম। তাহার পরে, যে মাতৃভাষা বালক পিত্রালয়ে শিখিয়াছে, তাহাই বিদ্যালয়ে নূতন করিয়া শেখে। বিদ্যালয়ে বালকের বিবেচনা মার্জ্জিত হয়—দৃষ্টি মার্জ্জিত হয়। তাহা যখন হয়—তখন বালক তাহার পূর্ব্ব-শিক্ষিত মাতৃভাষা হইতে ভাষার মুখ্য অঙ্গগুলি বিবিক্ত করিতে শেখে;—কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, বিভক্তি, প্রত্যয়, প্রভৃতি ভাষায় পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাগ-ভাগ করিয়া দেখিতে শেখে। তখন সে বুঝিতে পারে—ভাষা পদার্থটা কি। কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিলেও—একখানি পত্র লিখিতে তাহার বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। তাহার যেমন বিবেচনা কতকটা ব্যাপ্তিলাভ করি-য়াছে—তাহার বিচার-শক্তিও সেই নবোন্মো-ষিত বিবেচনার সহিত যোগে যুক্ত হইয়া তেমনি পাকিয়া ওঠা চাই—কিন্তু তাহা এখনো হয় নাই। পিত্রালয়ে বালক স্বাভা-বিকী বিচার-শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল; বিদ্যালয়ে মার্জ্জিত বিবেচনা-দৃষ্টি উপার্জ্জন করিল। তাহার পরে সে যখন বিদ্যালয় হইতে কর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিল, তখন সে যুক্তি-দ্বারা স্বাভাবিক বিচার এবং শিক্ষিত বিবেচনা, দুয়ের যোগ-বন্ধন করিয়া সাধু-ভাষায় চিঠিপত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিল। যুক্তি-দ্বারা বিচার এবং বিবেচনার মধ্যে এই যে যোগবন্ধন, ইহার ভিতরের কথাটি ইতিপূর্ব্বে আমি জ্ঞাপন করিয়াছি;—তাহা আর কিছু না—যেহেতু'র সহিত অতএবের যোগবন্ধন। যেহেতু এ পত্রখানি বিষয়-কর্ম্ম-ঘটিত—অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল ভাষায়; যেহেতু এ পত্রখানি বাড়ি'র লোকের নিকট হইতে আসিয়াছে, অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে ঘরাও ভাষায়। যেহেতু এ পত্রখানি বিজ্ঞান-সংক্রান্ত, অতএব ইহার উত্তর দিতে হইবে পণ্ডিতি ভাষায়। উপযুক্ত ভাষা দ্বারা সুনিপুণরূপে কাজ চালাইতে হইলে—শুদ্ধ-কেবল অন্তঃপুরের অশিক্ষিত বিচার-স্ফূর্ত্তি দ্বারাও তাহা সম্ভাবনীয় নহে, আর, শুধু-কেবল পুঁথিগত বৈয়াকরণিক শুদ্ধাশুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারাও তাহা সম্ভাবনীয় নহে। কাজের সময়, অশিক্ষিত 'বিচার' এবং শিক্ষিত বিবেচনা, দুয়ের মধ্যে পদে পদে যোগ-বন্ধন করা—অতএব এবং যেহেতুর মধ্যে পদে পদে যোগ-বন্ধন

করা—নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কাজের লোক হইতে হইলে, বালক হইলেও চলিবে না, ভট্টাচার্য্য হইলেও চলিবে না। নিজের বুদ্ধি-অনুসারে পদে পদে যেহেতু'র সঙ্গে অতএবের যোগ-বন্ধন করিতে না পারিলে, কাজের মতো কোনো কাজ কাহারো কর্তৃক সম্ভাবনীয় নহে।

বালক যখন পিত্রালয় হইতে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির জ্ঞানোপার্জ্জন-পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়, তখন সে নূতন ব্রতী নব নব বিদ্যার আলোকে অন্ধ হইয়া অন্তঃপুরের অশিক্ষিত সহজ জ্ঞানকে আগাগোড়া কুসংস্কার বলিয়া মনে মনে ঠিক্ দিয়া রাখে, এবং সমস্তেরই প্রতিবাদ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেই বালক যখন আর-কিছু-কাল পরে কর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষিত বিদ্যাকে পরীক্ষানলে গলাইয়া তাহাকে কাজে খাটায়, তখন সে অন্তঃপুর মহলের অকৃত্রিম সহজজ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে। তখন সে বুঝিতে পারে যে, অন্তঃপুর-সদনের এবং কৃষক-পল্লীর নৈসর্গিক সহজজ্ঞানের মূল্য এক হিসাবে যেমন পণ্ডিতের মার্জ্জিত জ্ঞান অপেক্ষা অনেক কম, আর-এক হিসাবে তেমনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। যাঁহারা আজীবন চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ পড়িয়া প্রৌঢ় বয়সে অসামান্য বৈয়াকরণিক হইয়া উঠেন, আর, সেই ব্যাকরণ-জ্ঞানকে মহাজ্ঞান মনে করিয়া সভামধ্যে বুক ফুলাইয়া বেড়া'ন, তাঁহারা একেবারেই কাজের বা'র হইয়া যা'ন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা শিক্ষিত ব্যাকরণ-জ্ঞানকে ব্যবহার্য্য-ভাষার গায়ে মাখাইয়া সেই ভাষাকে কাজের ভাষা করিয়া দাঁড় করা'ন, আর, সেই ফলপ্রসবিনী ভাষার ব্যবহারে ক্রমে যখন তাঁহাদের হাত পাকিয়া ওঠে, তখন তাঁহাদের ভাষা ফিরেফির্তি আবার বালকের ভাষার ন্যায় স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের আকার ধারণ করে। অন্তঃপুর-সদনের এবং কৃষক-পল্লীর ভাষা সকল-সময়ে ব্যাকরণ-সঙ্গত না হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বক্তার মনের ভাব এরূপ অকৃত্রিম সহজ-শোভন ভাবে উদ্বেলিত হয় যে, কবির নিকটে তাহার মূল্য আঁটাসাঁটা পোষাক-পরাণো কৃত্রিম ভাষা অপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক। প্রথম ধাপের অশিক্ষিত ভাষাতে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের ভাবই—ফোয়ারার ভাবই—প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয় ধাপের বিদ্যাবাগীশী ভাষাতে বন্ধনের ভাব—নিয়মের ভাব—ব্যবস্থার ভাব—প্রধানত দেখিতে পাওয়া যায়; তৃতীয় ধাপের পরিপক্ক ভাষাতে, উচ্ছ্বাসের ভাব এবং বন্ধনের ভাব, দুইই একাধারে স্ফূর্ত্তি পায়; আর, সেই-কারণ-বশত তৃতীয় ধাপের ভাষাতে নীচের দুই ধাপের ভাষার দুই প্রকার গুণ দ্বিগুণ হইয়া উঠে, এবং দুই-প্রকার দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। প্রথম ধাপের ভাষার গুণ অকৃত্রিম স্ফূর্ত্তি—দ্বিতীয় ধাপের ভাষার গুণ সুব্যবস্থা। তৃতীয় ধাপের ভাষায় দুয়ের ঐ দুই গুণ একত্রে জমাট্ বাঁধিয়া যায়; আর সেই সঙ্গে দুয়ের দুই দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। প্রথম ধাপের ভাষার দোষ হ'চ্চে—অব্যবস্থিত স্ফূর্ত্তি; সে দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়; দ্বিতীয় ধাপের ভাষার দোষ হ'চ্চে—কৃত্রিম নিয়মের বাঁধাবাঁধি; তাহাও প্রক্ষালিত হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্তটির মধ্যে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, প্রথম ধাপের ভাষাজ্ঞান বিচার-প্রধান উপস্থিত বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়; দ্বিতীয় ধাপের ভাষাজ্ঞান বিবেচনা-প্রধান বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়;

তৃতীয় ধাপের ভাষাজ্ঞান যুক্তিপ্রধান ব্যুৎপন্ন বুদ্ধির যোগে সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, স্বাভাবিক বিচার-স্ফূর্ত্তি বুদ্ধির শক্তি-প্রধান অঙ্গ ; বিবেচনার নিয়ম-বন্ধন বুদ্ধির দৃষ্টি-প্রধান অঙ্গ; এবং দুয়ের একত্র সমাবেশ-জনিত প্রয়োগ-নৈপুণ্য বুদ্ধির যুক্তি-প্রধান পূর্ণাবয়ব।

যতদূর সহজ প্রণালীতে বুদ্ধির অঙ্গ-নির্ব্বাচন করা সম্ভবে—উপরে তাহা আমি সাধ্যমতে করিলাম। ভাষার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম কেন ? না, যেহেতু ভাষা বুদ্ধিরই সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি। তার সাক্ষী—জ্ঞান-গর্ভ ভাষা শ্রবণ করানোর নামই বুদ্ধি-দান করা ; আর, জ্ঞানগর্ভ ভাষা শ্রবণ করার নামই বুদ্ধি-গ্রহণ করা। ভাষাকে ছাড়িয়া বুদ্ধিকে নাগাল পাওয়াও কঠিন—আর, ভাষা-বায়ুর সাহায্য ব্যতিরেকে বুদ্ধির আগুন ধরানোও কঠিন। এইজন্য বুদ্ধির ব্যাপার বুঝিবার এবং বুঝাইবার পক্ষে ভাষার দৃষ্টান্ত খুব কাজে লাগে। Logic-শব্দ Logos-শব্দ হইতে হইয়াছে। Logos-শব্দের অর্থ Reason এবং Language দুইই একাধারে।

এতক্ষণের আলোচনায়, বুদ্ধির তিনটি মুখ্য অবয়বের সন্ধান পাওয়া গেল ; সে তিনটি অবয়ব হ'চ্চে—বিচার, বিবেচনা এবং যুক্তি। বিচার কি ? না, বিচরণ ; মনের ভাব হইতে লক্ষ্য-বস্তুতে বিচরণ—অথবা মনের ভাবকে লক্ষ্য-বস্তুতে চারাইয়া দেওয়া। তাহা আর কিছু না—"এটা ঘট" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঘটত্বের ভাবকে সাক্ষাৎ-পরিদৃশ্যমান ঘটে প্রতিফলিত দেখা। বিবেচনা কি ? না, দৃশ্যমান ঘট হইতে ঘটের ভাবকে বিবিক্ত করিয়া (অর্থাৎ বিমুক্ত করিয়া) দেখা। যুক্তি কি ? না, ঘটত্বের ভাব দিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটকে মাপিয়া দেখা। যুক্তিতে বিবেচনা এবং বিচার, দুইই একযোগে স্ফূর্ত্তি পায় ; আর, এক-যোগে স্ফূর্ত্তি পায় বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে যুক্তি। একজন পাকা জহরী প্রথমত "ভাল হীরা" কাহাকে বলে তাহা জানে—এইরূপ জানা বিবেচনার কার্য্য ; দ্বিতীয়ত হীরা দেখিলেই বলিতে পারে যে, এটা অমুক মূল্যের হীরা ; এইরূপ বলিতে পারা বিচার-শক্তির কার্য্য। তৃতীয়ত কিরূপ ক্রেতাকে কিরূপ হীরা গছাইতে হইবে—ইহা ঠিক্ করা যুক্তির কার্য্য। যুক্তিতে বিবেচনা এবং বিচার, যেহেতু এবং অতএব, দুইই একযোগে কার্য্য করে।

বুদ্ধির অঙ্গ-নির্ব্বাচন মাত্র করিয়াই এ-যাত্রা ক্ষান্ত হইতেছি ; বুদ্ধির ভিতরে মন এবং প্রাণ কি-ভাবে সম্ভুক্ত রহিয়াছে, তাহা বারান্তরের আলোচনার জন্য হাতে রাখা হইল।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৫৩৭।৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৫২ ৻৩
সমষ্টি	...	১০৮৯।৬
ব্যয়	...	৪৮৩৶৯
স্থিত	...	৬০৫।৵৯

জমা।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ১০৫।৵৯

৬০৫।৵৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৭২ ৵৯

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০০৲

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

২৲

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু

৫৲

শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল প্রামাণিক

২৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩৵৯

৩৭২৵৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৩।৴৬
পুস্তকালয়	...	৩৭৮/০
যন্ত্রালয়	...	৬২॥০
গচ্ছিত	...	১।৴০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		১০ ৵০
সমষ্টি		৫৩৭ ।৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৩৯৬৮/৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৮ ৴৬
পুস্তকালয়	...	৫।৵৬
যন্ত্রালয়	...	৫৩॥০
সমষ্টি		৪৮৩৮/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র সোমবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ মঙ্গলবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
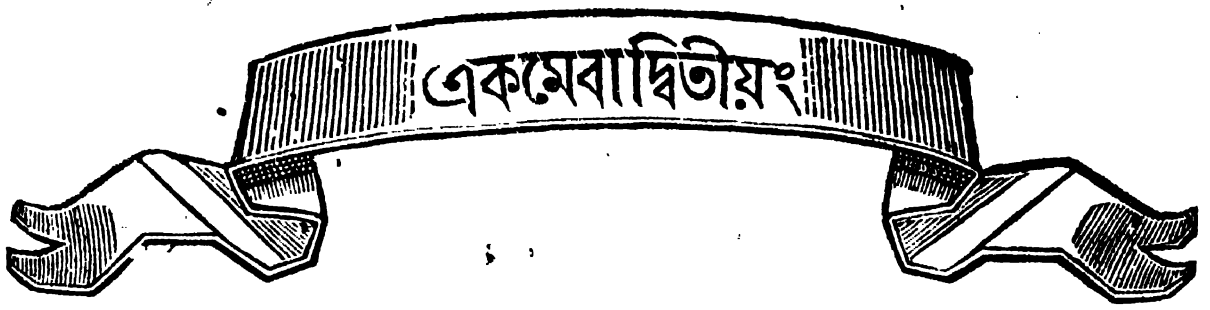
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

পঞ্চদশকল্প।

চতুর্থ ভাগ।

১৮২৪ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ১ চৈত্র রবিবার।

মূল্য ৪৲চারি টাকা মাত্র।